যুবনায়ক
স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে

শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পি-৬১৫, ব্লক - 'ও', নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩
ফোন: ২৪০০ ১৫৩৪, ৯৮৩০৬ ২৮২২৪

প্রকাশনায়
প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা
সম্পাদিকা, শ্রী সারদা আশ্রম,
নিউ আলিপুর, কলকাতা

বিন্যাস
তিলক শেঠ

মুদ্রণ
অশোক প্রিন্টার্স, কলকাতা ৬

সম্পাদনায়
সংঘমিত্রা ঘোষ

প্রকাশ কাল
১৭ জানুয়ারি ২০১৪

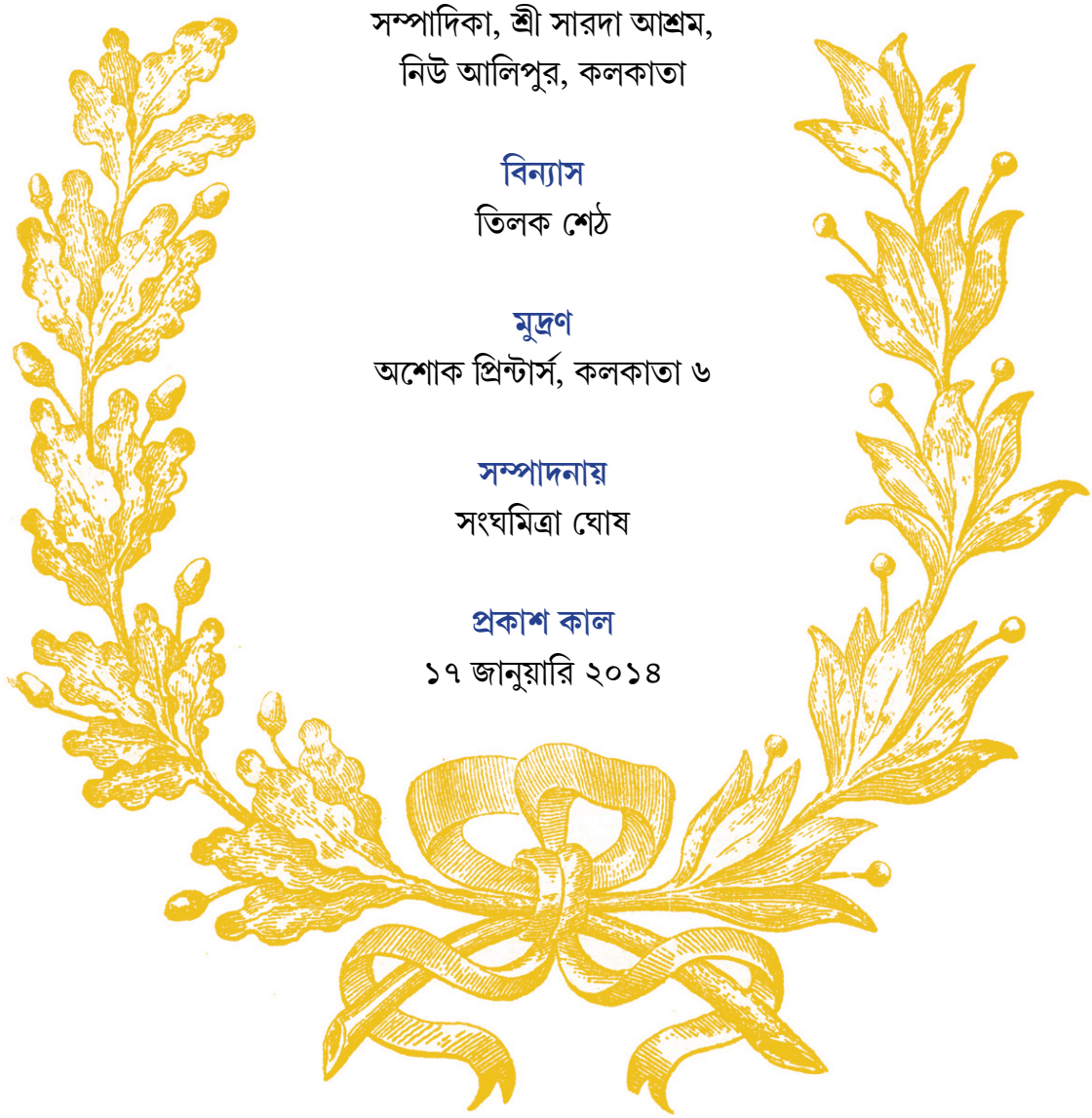

প্রকাশিত রচনাগুলির মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়বদ্ধ নন

সূচিপত্র

আশীর্বাণী

স্বামীজীর সার্ধশত বৎসর সমাপ্তি উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি ১১

'আপনি করিলে আপনার পূজা...' স্বামী প্রভানন্দ ১৮

অতীতের ঊষা পার্থসারথী বসু ২১

দুইটি পত্র ৩৮

মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির স্বামী সুপর্ণানন্দ ৪০

স্মরণীয়া সুধীরা দেবী চিত্র বসু ৪৪

The Ideal for the Young Swami Sunirmalananda ৪৭

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতীয় নারীজাগরণের পূর্ণরূপ স্বামী বলভদ্রানন্দ ৬২

ইন্দিরা গুহ'র স্মৃতিচারণা ৭৩

Upanishads' Appeal to the Youth of Today Swami Paramarthananda ৭৭

ভারতের উন্নতি— ধর্মে আঘাত না করে প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা ৮৭

কবি ও সন্ন্যাসীর শিক্ষাভাবনা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ৯৬

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে যুক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা স্বামী ঋতানন্দ ১০০

The Leader Swami Ishatmananda ১০৯

ঠাকুরের 'নরেন' ১১৪

মনীষীদের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী ১১৮

A healthy work attitude Swami Atmajnananda ১২৭

জীবন— একটা একটানা উপাসনা ব্রহ্মচারিণী সুতপা দেবী ১৩১

দরিদ্রদেবো ভব স্বামী গিরীশাত্মানন্দ ১৩৭

খেলাধূলায় স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ঋতানন্দ ১৪৫

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে স্বামীজীর প্রভাব চিত্রা বসু ১৫০

সংশয় থেকে বিশ্বাস ঃ নরেন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রঃ গার্গী দেবী ১৫৮

শ্রী সারদা আশ্রম— এপ্রিল ২০১২ থেকে ২০১৩ মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণী ১৯৬

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

স্মৃতির খেয়ায় আশাপূর্ণা দেবী ৫১

শিক্ষার্থীর গৃহ ও বিদ্যালয় গৌরিরাণী সোম ৫৯

অধিকন্তু ন দোষায় প্রব্রাজিকা নির্বাসনাপ্রাণা (প্রাক্তন ছাত্রী) ৮২

শ্রীশ্রীসারদা মন্দির দ্বারে জ্যোতির্ময়ী সরকার ৮৫

Mira Debi- How I Met Her Subhadra Haksar ৯৪

শুভ সূচনা রেবা দেবী (প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা) ১০৫

বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের প্রথম দিনে শিক্ষিকাগণের নিকট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা সন্ন্যাসিনীমীরা দেবী প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষিকাগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিরস্মরণীয় পথ নির্দেশ ১২২

আশ্রম মাতা স্বর্গীয়া মীরা দেবীর (মাসীমা) আশ্রমিকা গৌরী দেবীকে লেখা একটি অপ্রকাশিত পত্র ১২৩
অতীতের স্মৃতিপথে ড. রমা চৌধুরী ১৩৪

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা
মানুষ চাই স্বামী ঈশাত্মানন্দ ৫৫
অমূল্য স্মৃতি গৌরী দেবী ১৪২

'Completer works of Swami Vivekananda' থেকে গৃহীত
The Divine Call ৫৩
Letters of Swami Vivekananda ৯০

'বাণী ও রচনা' থেকে গৃহীত
শিকাগো বক্তৃতা ৪২
কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা ৬৭
জাফনায় বক্তৃতা— বেদান্ত ১২৪
গীতাতত্ত্ব ১৩৯
কলিকাতায় অভিনন্দনের উত্তর ১৫৩
স্বামী-শিষ্য-সংবাদ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ১৬২

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনাদর্শ: ত্যাগ ও সেবা পৌলমী মাইতি ১৮৭
মানব মিত্র স্বামী বিবেকানন্দ শরৎপ্রিয়া কর ১৮৯
ছাত্রসখা নরেন্দ্রনাথ সঞ্চারী দীর্ঘাংগী ১৯১
স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম মৌনী পাত্র ১৯২
ছাত্রসখা নরেন্দ্রনাথ মাধবপ্রিয়া করন ১৯৪

ফটো অ্যালবাম ১৬৫
স্মৃতির পাতা থেকে ৩১

আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণপত্র ১৭৯
Inter School Competition 2013 : List of Prize-Winners ১৮০
Inter School Competition 2013 : স্বামীজীর বাণী— অষ্টম ও নবম শ্রেণীর জন্য ১৮৩
Inter School Competition 2013 : স্বামীজীর বাণী— তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ১৮৪
Drawing Competetion ১৮৫

PHONES PBX : (033)
2654-1144 2654-5700
2654-1180 2654-5701
2654-5391 2654-5702
2654-9581 2654-5703
2654-9681 2654-8494
FAX : 033-2654-4071
E-Mail : president@rkmpresident.org
office@rkmpresident.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

২৯ নভেম্বর, ২০১৩

শুভেচ্ছা বাণী

স্বামীজী বলেছেনঃ 'মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।' 'ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন — এসব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। ... সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে।' স্বামীজী আরও বলতেন "Educate Educate, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশততমবর্ষের পূর্তি উৎসব আগামী ১৭, ১৮, ১৯ জানুয়ারী ২০১৪ শ্রীসারদা আশ্রম তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে উক্ত অনুষ্ঠান এবং স্মরণিকার সাফল্য প্রার্থনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার শুভ আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

(স্বামী আত্মস্থানন্দ)
সংঘাধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা
সম্পাদিকা
শ্রীসারদা আশ্রম
কলকাতা

Phone PBX :
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : rkmhq@belurmath.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

২২.১১.২০১৩

শ্রী সারদা আশ্রম, নিউ আলিপুর, কোলকাতা আগামী ১৭, থেকে, ১৯ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের জন্মসার্ধশতবর্ষের পূর্তি উৎসব করবে এবংএই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবে জেনে আনন্দিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে আধুনিক জগতে নারীর আদর্শ হলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁর কথায় "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার, যদিও বাইরে সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে, সে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তা শুধু ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্ঠাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর কৃপায় উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক এবং তাঁদের জীবনী ও প্রেরণাপ্রদ বাণীর আলোকে স্মরণিকার লেখাগুলি সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক, এই প্রার্থনা।

স্বামী প্রভানন্দ

(স্বামী প্রভানন্দ)
সহাধ্যক্ষ

প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা
সম্পাদিকা,
শ্রী সারদা আশ্রম
নিউ আলিপুর, কোলকাতা - ৫৩

The Cossipore Udyanbati

Phone : 557-3605
RAMAKRISHNA MATH, COSSIPORE
90, Cossipore Road, Calcutta-700 002

Ref. No.....

Date 01.12.2013

আশীর্বাণী

শ্রীসারদা আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী ১৭ই জানুয়ারী থেকে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেনে আনন্দিত হলাম। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে যার উদ্দেশ্য স্বামীজীর জীবন ও বাণী ও তাঁর আদর্শ প্রচার করা।

স্বামীজী লিখছেন - বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন:

১। সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস
২। হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব
৩। যারা সৎ হতে কিংবা সৎ কাজ করতে সচেষ্ট, তাদের সহায়তা।

স্বামীজীর উক্ত চিন্তা সকলের মধ্যে বিস্তার লাভ করুক তাহলে আমাদের জাতি, দেশ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে।

স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা জানাই - শ্রীসারদা আশ্রমের স্বামীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হোক এবং স্মরণিকা প্রকাশ সার্থক হোক।

বাগীশানন্দ

(স্বামী বাগীশানন্দ)

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt. Howrah
Pin : 711202
17 June, 1981

"In our country women are very ignorant, open their eyes"—these words of the Holy Mother were taken up as the ideal by Mira Devi, Vani Devi and their colleagues who built up this unique institution, Sree Sarada Ashrama Balika Vidyalaya, which has now completed twenty-five years. I say unique, for the girls are brought up here in an atmosphere of national culture and ideals of Indian womanhood, which is lacking in many of the institutions in our country.

May the Holy Mother be ever gracious to Sree Sarada Ashrama Balika Vidyalaya and to all those connected with it is my earnest prayer to Her.

I wish all success to their Silver Jubilee celebrations as well as to the Souvenir.

Swami Vireswarananda

President
Ramakrishna Math and Mission

Phone : 35-2928

RAMAKRISHNA YOGODYAN MATH
7 YOGODYAN LANE, KANKURGACHHI
CALCUTTA 700 054, INDIA

Ref.

Date 10/10/82

শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হবে জেনে সুখী হলাম।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বালিকা বিদ্যালয়টি স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ ভাবে সেবা করে আসছে। কয়েকটি ত্যাগময় জীবনের অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা এই শিক্ষা প্রতিস্থানটি পুষ্টি লাভ করেছে। যতদিন এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অক্ষুন্ন থাকবে ততদিন প্রতিষ্ঠানটি দিনে দিনে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহন করবে, সন্দেহ নাই।

আমি শ্রী শ্রীমা সারদা দেবীর পবিত্র নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টানটির সর্বাঙ্গীন কল্যান কামনা করি। ইতি

স্বামী ভূতেশানন্দ
সহ সভাপতি
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

EDUCATION MINISTER
Government of West Bengal

Calcutta, the 27th July 1959.

Sree Sarada Ashram.

On the invitation of the authorities of Sree Sarada Ashram at New Alipore I had the pleasure to preside over the meeting held on the 8th February 1959 in connection with the celebration of the birth day of the Holy Mother. There is a great need of girls' schools in our State conducted on perfectly national lines and having for their object not only intellectual and physical but also moral and spiritual developments of the students. But as moral and spiritual developments can be secured not merely by instruction but more by example; institutions run by teachers who are inspired by high ideals and have devoted themselves to the service of hnmanity can only ensure such developments in the students. This school perpetually presenting the great example of the Holy Mother before the students and served by teachers who are themselves dedicated souls, dedicated to serve God and men, has therefore a great promise which, let us hope, with Sree Ramakrishna's blessings will be fulfilled.

It is good news that the school has recently been upgraded into a high school with an enrolment of more than 200 students in the secondary classes.

(RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI.)

Report of the revered Rai Harendra Nath Chaudhuri, the then Education Minister, Government of West Bengal, who kindly presided over the meeting held on 8th February, 1959 in connection with the celebration of the annual birth day of the 'Holy Mother' and the Inauguration ceremony of the School Building.

স্বামীজীর সার্দ্ধশত বৎসর সমাপ্তি উৎসবে
'শ্রদ্ধাঞ্জলি'

বিশ্বজোড়া একটি নাম— 'বিবেকানন্দ'। সদা জাগ্রত বিবেকের জীবন্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। সদা সর্বদা সত্যের চূড়ায় অবস্থিত বিবেকানন্দ সমগ্র মানব জাতিকে সত্য বস্তু লাভের পথ দেখিয়েছেন আজীবন।

মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী বীরেশ্বর শিবের কৃপায় পুত্রলাভ করেছিলেন বলে তিনিই সর্ব প্রথম পুত্রের নাম রেখেছিলেন— 'বীরেশ্বর'। সার্থক এই নাম। তিনি বীরের ঈশ্বর, কাপুরুষের নয়। তাঁর চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, তর্কে-বিতর্কে-সমালোচনায়, ধর্মীয় আচরণে সর্বত্রই তাঁর বীরত্বের ভাব দর্শন করে সমগ্র জগৎবাসী হয়েছে বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

পিতৃ প্রদত্ত নাম— 'নরেন্দ্রনাথ'। তিনি মানুষের দেবতা, স্বর্গের দেবতা নন। 'নরেন্দ্রনাথ' এই নামেই সর্বত্র পরিচিত, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত। স্বর্গের দেবতা ভক্তের ফুল বেলপাতা চন্দন দিয়ে পূজা, নানা উপাচারে ভোগ নিবেদনের পর কাতর প্রার্থনায় যদি তুষ্ট হন, তবেই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন; আর মানুষের দেবতা 'নরেন্দ্রনাথ' এই নিয়মের উল্টো দিকে হাঁটেন। তিনি গভীর ঘুমে নিদ্রিত মানব জাতিকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ঠেলে তুলে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে তার পর হন 'মহানন্দে মগ্ন যোগীবর'।

তৎকালীন সিমলা পল্লীর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত ধনী বিশ্বনাথ দত্তের প্রথম পুত্র হওয়ার সর্ব বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন শৈশব কাল থেকেই।

তাঁর অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির বলেই তিনি বিদ্যার্জন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ ও বিচার বিশ্লেষণ অনেকটাই আয়ত্ব করেছিলেন ছাত্রাবস্থাতেই।

জীবন যৌবনের প্রারম্ভেই— ঈশ্বর আছেন, না নেই— এই প্রশ্ন তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করে তুলেছিল সর্বক্ষণ। কোথাও এই প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে অন্তরের টানেই একদিন পৌঁছে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে। এই মন্দিরের পুরোহিত গেঁয়ো বামুন তখন হয়েছেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব'। তাঁর পদতলে এসে পেয়ে গেলেন তাঁর সব প্রশ্নের সদুত্তর। এর পর অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তিম লগনে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনে হয়ে গেল নরেন্দ্রনাথের সব তর্কের অবসান। ঠাকুরের পদতলে লুণ্ঠিত নরেন্দ্রনাথের অন্তর থেকে বেরিয়ে এল— 'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।'

তার পর বহু ঘটনা প্রবাহ পার হয়ে বরানগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশ ধরে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পদব্রজে কপর্দক শূন্য অবস্থায় ভ্রমণকালে কখনও রাজপ্রাসাদে, কখনও দীন দরিদ্র নিম্নশ্রেণী— জেলে-মালা-মুচি-মেথর-ভাঙ্গীর ঝুপড়িতে দিন কাটিয়ে তাদের দুর্দশার চিত্র নিজের চিত্তপটে এঁকে নিয়ে কন্যাকুমারিকার শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিন দিন তিন রাত ডুবে থাকলেন গভীর ধ্যানে। ধ্যানভঙ্গের পর তাঁর প্রথম চিন্তা এল— সমগ্র ভারতবর্ষের দীনদরিদ্রের দুঃখমোচন কি উপায়ে করবেন। এই ভেবে যখন তাঁর বুক চক্ষের দর বিগলিত ধারায় ভেসে যাচ্ছে তখন এই শিলাসনে বসেই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন ঠাকুরের ইঙ্গিত— তারপর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ মাথায় করে সাগর পাড়ে পাড়ি দিয়ে তিনি পদার্পন করলেন আমেরিকার মাটিতে

তার পর—

এক-পূণ্য প্রভাত বেলায় বাজিয়া উঠিল
চিকাগো শঙ্খের ভেরী
জগতের ধর্মের মেলায়।
আঁধার টুটিল, সেখানেও দেখি তুমি,
হে ভাবুক! হে বীর সন্ন্যাসী—
উজ্জ্বল নয়ন।
বলিতেছ— ভারতের অমৃতের বার্তা লয়ে আসি
লও বিশ্বজন।
হে মানুষ আনন্দের অন্তরেতে সন্তান মহান্
ব্যাপ্ত করি ব্যোম— ওঠ, জাগো,
অন্তরেতে চেয়ে দেখ— শোন মহাগান—

সোঽহম্... সোঽহম্।

বেদান্তের আলোকে পাশ্চাত্য মনীষীদের হৃদয় জয় করে পাশ্চাত্য ভূমিতে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বিজয় পতাকা

প্রোথিত করে ভারতে ফিরে এসে গিরিগুহায় ধ্যানমগ্ন না হয়ে বনের বেদান্তকে সমাজের কল্যাণে টেনে এনে গঠন করলেন—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। বেলুড়ে তাঁর ক্রয় করা জমিতে নির্মিত হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিজস্ব ভবন।

এখানে স্বামীজীর নির্দেশে হলো এক অভিনব কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত—'শিবজ্ঞানে জীবে পূজা!' স্বামীজীর নির্দেশ— দরিদ্র ভারতবাসীকে আগে দিতে হবে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও স্বাস্থ্য রক্ষার সবকিছু সরঞ্জাম। তার পর শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও স্বামীজী শিক্ষাকেই জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সঠিক শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভা পূর্ণ দৃষ্টি সমাজের সব দিকেই সমভাবে ঘুরে বেড়াত। ভারতবর্ষে নারীজাতির দূরবস্থা স্বামীজীকে বিশেষ ব্যথিত করে তুলেছিল। এখানেও স্বামীজী নারী জাতির অশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন। স্বামীজীর প্রশ্ন ছিল—পুরাকালে নারী যদি পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সর্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকেন তাহলে এ যুগের নারী প্রকৃত শিক্ষালাভ করলে পুরুষের সমকক্ষ হবে না কেন? স্বামীজীর প্রসারিত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল একপক্ষ পাখীর যেমন উরান সম্ভব নয়, তেমনি সমাজে নারী ও পুরুষ সম শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে উন্নত সমাজ গঠন করা কখনই বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। স্বামীজী বলেছেন—বর্তমানের নারী সমাজ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করলে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে

স্বামীজী দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—বর্তমানের নারী সমাজ যদি অনবদ্য সীতা চরিত্রকে আদর্শ করে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করে, সর্ব বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে নূতন প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষার আলোকে শিক্ষা দান করে মান হুঁশ করে

গড়ে তুলতে পারে তা হলেই ভারত আবার বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বর্তমান নারীসমাজের জন্য স্বামীজীর পথ নির্দেশকে সামনে রেখে নিউ আলিপুরে গড়ে উঠেছে— 'শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়' ও ছাত্রীভবন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মন্ত্রশিষ্যা সন্ন্যাসিনী মীরা দেবী ও বাণী দেবী মাতৃপূজা ও শিক্ষাদান অভিন্ন এই মন্ত্র নিরন্তর জপ করে বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেছেন এবং এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পূজার মনোভাব নিয়ে মেয়েদের সর্ব বিষয়ে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের এই নির্দেশ শিরোধার্য করে অদ্যাবধি শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

শ্রদ্ধেয়া মীরা দেবী ও বাণী দেবীর পরিকল্পনা ছিল— ঠাকুর-মা ও স্বামীজীর একটি মন্দির ও আশ্রমিকাদের জন্য একটি স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করার। সেজন্য বিদ্যালয় ভবনের জমি ক্রয় করার সময়েই বিদ্যালয় সংলগ্ন এক খণ্ড জমি ক্রয় করে রেখেছিলেন। তাঁরা এই পরিকল্পনাকে রূপদান করে যেতে পারেননি। এই দুই জনের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরেই ঐ জমিতে নির্মিত হয়েছে মন্দির ও আশ্রমিকাদের জন্য ছোট একটি স্থায়ী বাসস্থান।

১৯৭৭ সালে ২৩ শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠের দশম প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মন্দিরের গর্ভগৃহে বেদীর উপর সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্বহস্তে স্থাপন করে অর্ঘ্য দান ও আরতি করার পর কিছুক্ষণ আসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-মা ও স্বামীজীকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মন্দিরে সমাগত সকলেই অন্তরে শান্তি লাভ করেন বলে এই মন্দির শান্তি লাভের স্থান বলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

দীর্ঘ পথ যাত্রায় এই বিদ্যালয় নানা ভাবে উন্নত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ উন্নত মানের শিক্ষালাভের সঙ্গে নানা প্রতিষ্ঠানে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখায় উন্নত মানের বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সমমর্যাদা লাভ করেছে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কার্য্যের সূচনা থেকে দীর্ঘ ৫৭ বছরের পথ পরিক্রমায় প্রথম স্থাপিত হয়েছিল শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ (বাংলা মাধ্যম)। বর্তমানে ইংরাজি মাধ্যম প্রাথমিক বিভাগ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। ২০১২ সালে 'শ্রীসারদা আশ্রম উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়' নামে আর একটি বিভাগ সংযোজিত হয়েছে।

বিদ্যালয় ছাড়াও সমাজের সর্বস্তরের মেয়েদের উন্নত জীবন গঠন করার জন্য রয়েছে নানারূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলেও তাদের পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় দু-এক বছরের মধ্যেই পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে তারা স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের কথা চিন্তা করেই বহু বছর আগে খোলা হয়েছে একটি কোচিং সেন্টার। এই কোচিং সেন্টারে নিযুক্ত শিক্ষিকাদের দ্বারা সাধ্যানুযায়ী কিছু সংখ্যক মেয়েকে ভালো ভাবে পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষার মান উন্নত করার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীসারদা আশ্রম পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র— 'New Alipore Sree Sarada Ashrama Social Welfare Association— A Vocational Training Centre'— এখানে ১৮টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার সুযোগ পায়। অল্প সময়ে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণের সুনাম পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যের সুদূর প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মা-বাবা মেয়েকে সঙ্গে করে এনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দিচ্ছেন। স্থানাভাব ও আশ্রম-কর্মীর অভাবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরও বহু বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না।

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের এই বিভাগগুলি ছাড়াও অন্যত্র আশ্রমের শাখা কেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের উন্নত মানের জীবন গড়ে তোলার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনাকে রূপদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোথাও অনুন্নত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক মেয়েকে শিক্ষার প্রথম ধাপ থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই সব ছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যারা আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও যারা প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শাখাকেন্দ্রগুলিতে গ্রামের সুদূর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের সব রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সব রকম অসুস্থতায় উন্নত মানের চিকিৎসা করার জন্য একাধিক ক্লিনিক খোলা হয়েছে।

স্বামীজীর সার্ধ শত বৎসরের সমাপ্তি উৎসবে শ্রীসারদা আশ্রমের সামান্যতম কর্ম-সম্ভারে সজ্জিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শ্রীশ্রীঠাকুর-মা ও স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে প্রণামান্তে বারংবার জানাই প্রার্থনা— কর্মযজ্ঞের দিব্য জ্যোতিতে আমাদের হৃদয় ভাণ্ডটি কানায় কানায় পূর্ণ করে পবিত্র জ্যোতির মাঝে আমাদের মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিন।

শ্রী সারদা আশ্রমের পক্ষ হইতে স্বামীজীর সার্দ্ধশত বৎসর সমাপ্তি উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখাটি প্রকাশিত হইল

যুবনায়কের সার্ধশতবর্ষে

শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

‘আপনি করিলে আপনার পূজা...’

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবীর অবয়বে স্বয়ং আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হয়েছিলেন; তাঁর সত্তায় মানবী ও দেবী ভাবের সার্থক সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। তাঁর আচরণ-বিচরণে লৌকিক ও অলৌকিক ভাবের সহাবস্থান দেখে তাঁর নিকটজনেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, কখনও বা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন— সেসব কথা ও কাহিনী দুর্বোধ্য বা রহস্যজনক মনে হলেও তাদের সত্যতা অনস্বীকার্য। শ্রীমায়ের জীবনপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুন্দর ফুলের মতো বিচিত্র ঘটনাবলী এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এসব মনোহর ফুল তাঁর মহিমার পরিচায়ক, তাঁর লীলাবিলাসের নিদর্শন। এদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে চমৎকার-দর্শন পুষ্পটি হচ্ছে শ্রীমায়ের নিজের হাতে নিজের পূজানুষ্ঠান। ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর এধরণের লীলাবিলাসের কথা ভাবলেই মনে ভেসে ওঠে একটি গানের কলি: ‘আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান।’ শুধু মাত্র ভাবার্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেও শ্রীমা নিজের পূজা নিজ হাতে করেছিলেন, এমনকি নিজের মহিমার স্তুতি করেছিলেন। তিনি করেছিলেন আমাদের প্রতি তাঁর অহেতুকী অনুকম্পাবশতঃ। পাছে সহজলভ্য শ্রীমাকে চিনতে না পেরে তাঁর সেবা পূজা করার দুর্লভ সুযোগ হারাই সেজন্যই বোধ করি তিনি নানা-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। নিজরে স্বরূপের পরিচয় উদ্ঘাটিত করে তিনি আমাদের শেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে আমাদের তাঁর সঙ্গে আপনজনের মতো সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিভাবে তাঁর শ্রীচরণে শরণাগতি নিতে হবে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এধরণের শিক্ষালাভ করে মানুষ ইহজীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে, সাধক হৃদয়ে ‘আত্মদীপ’ জ্বেলে ব্রহ্মময়ীর মুখদর্শন করবে, তাদের মানুষ জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মানুষ মনে-প্রাণে বুঝতে পারবে ঠাকুরের একটি বাণীর তাৎপর্য। তিনি বলতেন, ‘তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়— আমরা সব দূরের লোক, পরের ছেলে।’

আমরা লক্ষ্য করি, কারোর মধ্যে দৈব শক্তির উদ্ভাস বেশী দেখলে মানুষ তাঁকে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, ভয় করে, আপনজন বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, তাঁর মূর্তি বেদীতে সংস্থাপিত করে তাঁর পূজা করে। স্বয়ং আদ্যাশক্তি

অতীতে মানুষের মাঝে মানুষের সাজে বারংবার অবতীর্ণ হয়েছেন। এবার তিনি শ্রীসারদামণি বপুতে আবির্ভূতা হয়ে অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী তথা লীলাসঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীন অকিঞ্চন পরিবেশে এক সামান্য গ্রামীণ রমণীর সাজে উপস্থিত হয়েছিলেন, এক অত্যাশ্চর্য জীবনযাপন করছিলেন। মানুষ মাত্রই যে তাঁর অতি আপনার, মানুষের কল্যাণের জন্য যে তাঁর গভীর আকুতি তা বুঝাবার জন্য। মানুষ তাঁকে নিজের মা, সত্যিকারের মা বলে বুঝতে পারলে তিনি খুশি হতেন। তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি দেখলে তিনি সন্তুষ্ট হতেন। কৃপাময়ী মায়ের কৃপা করবার আকাঙ্খা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর দিনচর্যায়। এই স্পষ্টতার সঙ্গে মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর শুদ্ধ স্নেহ ও অপরের প্রতি কল্যাণেচ্ছা। মাতৃভাবের পরম বিকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর কৃপাঘন জীবনখানি পরিক্রমা করলে একটি কথা বারংবার মনে হয়। সে কথাটি হচ্ছে: 'মা-নাম শেখাতে সবে, মা হয়ে এসেছে ভবে।'

শ্রীমা সারদাদেবী পূর্ণ বিকশিত মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা। সবাই তাঁর সন্তান, সবাই তাঁর স্নেহ, সেবা ও যত্নের সমান অংশীদার। তাঁর সন্তান-বাৎসল্য কোন শর্তসাপেক্ষ ছিল না, কোন গুণ বিশেষের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষা করত না। তিনি ছিলেন চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী, সহজ ভাবময়ী, আনন্দময়ী। সন্তানমাত্রেই তাঁর সাহচর্যে, সুখ ও তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যেত।

অথচ দৃঢ় চরিত্রের মা সারদা ছিলেন মৃদুতা, ক্ষমা ও সহনশীলতার সম্পদে বিভূষিতা। কিন্তু তিনি এমন সাধাণ জীবন যাপন করতেন যে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারেনি, বরঞ্চ ভুল বুঝেছে, তুচ্ছ— তাচ্ছিল্য করেছে। তাঁর গ্রামবাসীদের কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেছিল, 'সারি বামনি, তার আবার মন্দির!'

ঈশ্বর বা ঈশ্বরী মানুষের সত্যিই অতি আপনার জন একথা মানুষকে বুঝতে তিনি তাঁর চোখ-ধাঁধানো দেব-ঐশ্বর্য সকল গোপন করেছিলেন। তিনি প্রেমময় ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে মান-হুশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে তাঁর আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি করার পথ দেখাতে। এই দুঃসাধ্য ভূমিকা পালন করবার জন্য তিনি বিশ্বজননী হয়েও পার্থিব এক মাতৃমূর্তি ধারণ করেছিলেন, আবার কৃপাপরবশ হয়ে কখনো কখনও তাঁর দৈবসত্ত্বার প্রমাণ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে নিজমুখে বলেছিলেন, আবার কখনও বা অতীতে বিভিন্ন অবতার সঙ্গিনীর ভূমিকায় তাঁর নিজের কীর্তিকলাপ স্মরণ করেছিলেন। মানুষ ঐশ্বর্য ভালবাসে। ঈশ্বরের মধ্যে ঐশ্বর্য দেখতে চায়। এ কারণে তাঁর নিজের স্ব-মহিমার কিছু কিছু আভাস দিয়ে তিনি মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর এ ধরণের আচরণ সকলের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আচরণটি তাঁর হচ্ছে নিজ হাতে নিজের পূজা করা। আশ্চর্য সুন্দর সে সব কাহিনী। তাদের কয়েকটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

শ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমকে বলতেন তাঁর বৈঠকখানা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। অগ্রহায়ণের আরম্ভ। একদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে জয়রামবাটী থেকে শ্রীমা পালকিতে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী লক্ষ্মীদি, রাধারাণী প্রভৃতি যাত্রা করলেন গরুর গাড়িতে। কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌঁছে শ্রীমা স্নান করেন। তারপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের ও নিজের আলোকচিত্র স্থাপন পূর্বক যথাবিধি তাঁদের পূজা করেন। তাঁর নির্দেশে হোম করেন কিশোরী মহারাজা। পূজার পর সকলে মহানন্দে প্রসাদ ধারণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীমা আহারাদি সেরে নিয়ে আটটা নাগাদ গরুর গাড়িতে যাত্রা করেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য সেসময় থেকে কোয়ালপাড়া আশ্রম শ্রী ঠাকুর ও শ্রীমায়ের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর পূর্বেই ঘটেছিল আর একটি ঘটনা। ঘটনার কাল ১৯০৮। তাঁর প্রিয় সন্তান ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কাইজার)-এর অনুরোধে শ্রীমা তাঁর শাঁখারিটোলার ভাড়া বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ললিতমোহন বিলাতের এক সাহেব শিল্পীকে দিয়ে শ্রীমায়ের একটি বড় রঙিন তৈলচিত্র আঁকিয়েছিলেন। মা সেই তৈলচিত্রটিতে তাঁর নিজের পূজা করেন ফুল চন্দন দিয়ে। ললিতমোহনের মহা আনন্দ। ঐ বাড়িতেই শ্রীমা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। ললিতমোহন গর্ব করে বলতেন, 'উদ্বোধন বাড়ি হবার বহু আগে আমার শাঁখারিটোলার ভাড়া বাড়িতে গিয়ে মা তাঁর নিজের 'অয়েল' ছবিটিতে আমার কথায় নিজে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে, আমাকে দীক্ষা দেন। আমাকে, কি বলে, যা তা ভাবিস, তোরা? 'কি বলে' বলা ললিতমোহনের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় তৃতীয়াতে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর গড়ে উঠেছিল মাতৃমন্দির। গর্ভমন্দিরে কালো পাথরে বেদীর উপর স্বামী সারদানন্দ ঐ তৈলচিত্রখানি শ্রীমায়ের বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ চিত্রে শ্রীমায়ের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয় একনাগাড়ে ত্রিশ বছর। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে ঐ তৈলচিত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীমায়ের অতিসুন্দর শ্বেতমর্মর মূর্তি। মূল তৈলচিত্রখানি বর্তমানে বেলুড়মঠের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।

তৃতীয় ঘটনা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের। শ্রীমা স্ত্রী ভক্তদের নিয়ে কাশীতে লক্ষ্মীনিবাসে বাস করছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সেখানকার অদ্বৈতাশ্রমে যেতেন। প্রত্যেকবারই তাঁর শুভ পদার্পণে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হতো। কলকাতায় ফিরে যাবার তিন-চারদিন পূর্বে একদিন সকালে শ্রীমা নিজের একখানি বাঁধানো আলোচত্রি আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে অদ্বৈতাশ্রমে গেলেন। মন্দিরে ঢুকে শ্রীঠাকুরের প্রণাম সেরে নিয়ে তিনি পূর্বদিকের দেওয়ালে যে কুলুঙ্গি ছিল, ঐ কুলুঙ্গিতে আলোচিত্রখানি রেখে দুটি ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তিনি কাপড়ের খুঁটে ফুল বেঁধে এনেছিলেন। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে, আশ্রমাধ্যক্ষ চন্দ্রমাহারাজকে ডেকে বললেন, 'চন্দ্রবাবা এটিতে রোজ দুটি করে ফুল দিও।' দেখে-শুনে সবাই চমৎকৃত। সেদিন থেকে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীমায়ের পূজা প্রবর্তিত হয়।

চতুর্থ ঘটনার কাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীমা রাধুদিকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং বাড়ির উপরতলায় বাস করছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা রাধুদি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না, সে কারণে শ্রীমা এই নিরিবিলি বাড়িটি বেছে নিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই

দোতলায় প্রথম ঘরটি ছিল ঠাকুরঘর। এই ঘরের বেদীতে শ্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের এবং শ্রীস্বামীজীর এক একখানি ছোট ছবি ছিল। ঐ বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীমা প্রতিদিন ঐ তিনমূর্তির পূজা করতে থাকেন। শ্রীমায়ের জীবনের চমৎকার এই ঘটনা উপস্থিত ব্যক্তিদের যেমন, আজকের দিনেও এ ঘটনা শ্রোতাদের তেমনই মুগ্ধ করে। মহামূল্য প্রতিকৃতি তিনখানি আলিপুর শ্রীসারদাশ্রমের মন্দিরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত।

এ ধরনের পটে নিজে নিজেই পূজা করাতেই শ্রীমায়ের মহিমান্বিত কার্যকলাপ সীমিত ছিল না। বিচিত্র ও আনন্দদায়ক একটি ঘটনা স্মরণ করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শ্রীমা যেসময়ে 'উদ্বোধন' বাড়িতে বাস করছিলেন। একদিন ফটো স্টুডিও থেকে শ্রীমায়ের একখানি '১৫x১২' মাপের আলোকচিত্র আনা হয়। কেমন হয়েছে দেখবার জন্য ছবিটি মাকে দেওয়া হয়। আলোকচিত্রখানি মা দু'হাতে ধরে নিজের মাথায় ঠেকান। উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। অপ্রতিভ মা চিত্রখানি সেবকের হাতে ফেরৎ দেন। সেবক জিজ্ঞাসা করেন, 'ছবিখানি কার, মা?' তিনি বালিকার মতো বলেন, 'কেন, আমার?' এ উত্তর শুনে আবার হাসির রোল ওঠে। মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা হাসছ কেন?' সেবকের জবাব, 'তবে আপনি মাথায় ঠেকালেন যে।' অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি মা নিজেও হেসে ওঠেন এবং বলেন 'এরও ভেতর তো ঠাকুর আছেন।'

এসব দেখে শুনে আমাদের বুঝতে হবে যে পার্থিব মায়ের রূপের আড়ালে থেকে স্বয়ং জগন্মাতা আমাদের শিখিয়েছেন তাঁকে অতি আপনার-জন হিসাবে গ্রহণ করতে এবং 'মা ও সন্তানের' বিশুদ্ধ সম্বন্ধটি গড়ে তুলতে। সেইসঙ্গে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি শুধু মর্ত্যের মা নন, তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরী, তিনি আমাদের পূজার্হা, তিনি ধ্যানগম্যা। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমার আপনার, জগতের সকলের মা। একটি জটিল সংসারের মধ্যে বসবাস করেও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উবে যাব টেরও পাবিনি।' ঝটকা দর্শনের মতো তাঁর দৈব ঐশ্বর্য দেখে ভক্তগণ হকচকিয়ে গিয়েছেন। মন শান্ত হতেই তাঁদের ধারণা হয়েছে এসব কিছু মায়ের অহেতুকী কৃপা বৈ ত নয়।

তিনি নিজেকে জগৎ কল্যাণে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কখনও কখনও উদ্বেলিত হৃদয়ে সন্তানদের বলতেন 'বাবা জগতের হিত কর।' এসবকিছু তাঁর মহিমা। তাঁর মহিমা অপার। তাঁর মহিমা বুঝতে হলেও একান্ত প্রয়োজন তাঁর আশীর্বাদ। তাঁর শ্রী চরণে বিনীত প্রার্থনা জানাই, 'সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী তৎপ্রসাদৎ মহেশ্বরি।'

> Doing good to others out of compassion is good, but Seva (Service) of all beings in the spirit of the Lord is better.
>
> — Swami Vivekananda

অতীতের ঊষা

পার্থসারথি বসু

১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর, শীতের এক পড়ন্ত বিকেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চললেও তার গতিপ্রকৃতি এক রকম নির্ধারিতই বলা যায়। যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় ভারতে ইংরেজের সেই আগের জোরও আর নেই। পটভূমি উত্তর কলকাতার এক সংকীর্ণ রাস্তা বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের উনিশ নম্বর বাড়ি। সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে জীর্ণ দোতলা বাড়ি, তিনতলায় শুধু একটি টিনের চালার ঘর। স্যাঁতস্যাঁতে, কলতলায় শ্যাওলা ভর্তি, একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। বাড়ির একতলায় দিনের বেলাতেই ঠিক মতো আলো ঢুকতে পারে না। সেখানেই থাকে মেয়েদের একটি ছোটখাট দল। একসঙ্গে থাকা, খাওয়া, পড়াশুনো। নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় নিজেদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা। এদের মধ্যমণি আশারাণী— শান্ত, কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্ব। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের অতি কাছের ‘দিদিভাই’। দিনটি ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী সারদা দেবীর জন্মদিন। ত্যাগ, সংযম ও সেবার ভিত্তিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা ও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরও নারী কর্মী প্রস্তুত করার জন্য সে দিন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে সহ অনুভূতি সম্পন্ন কয়েকজন বসলেন নিজেদের মধ্যে আহুত এক সভায়। সে দিনের সেই প্রথম সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন আশারাণী মুখোপাধ্যায়, শতদল ঘোষ, তরুলতা মুখোপাধ্যায়, সুধাময়ী সেনগুপ্ত, প্রমীলা বসু, হেমপ্রভা দেবী, রমলা চক্রবর্তী, কল্পনা ঘোষ ও শান্তিরাণী দেবী। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলেন শ্রীমতী শতদল ঘোষ। আনুষ্ঠানিক ভাবে তৈরি হল ‘‘শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী ছাত্রীনিবাস’’। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের জীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িটি সাক্ষী হয়ে রইল সুদূরপ্রসারী এক দীর্ঘ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপের। বোধ হয় এই ভাবধারায় প্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বলনের সব পটভূমিই এমন প্রায়ান্ধকার জরাজীর্ণ বাড়ি, তা সে বরানগরে মুন্সীদের সেই দোতলা পোড়ো বাড়িই হোক অথবা বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ি।

বসিরহাটের খ্রীষ্টান মিশনারি স্কুলের কৃতী ছাত্রী আশারাণীর পিতা প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান দেশসেবক। পেশায় আইনজীবি, কিন্তু কলকাতার আলিপুর ও পরে বসিরহাটে

ওকালতি করা জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী প্রফুল্লবাবু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী হিসাবে বেশি পরিচিত। টাকীতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আশ্রম প্রতিষ্ঠায় প্রফুল্লনাথ ছিলেন অগ্রণী। পনেরো বছর বয়সে আশারাণীর বিয়ে হয় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় পরিবারে কিন্তু কিছু দিন পরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) দর্শনলাভে ধন্য, স্বামীজির স্নেহের 'কালীকেষ্ট' স্বামী বিরজানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত আশারাণীর মনে তখন থেকেই আশ্রমজীবন যাপনের তীব্র ইচ্ছা। ইতিমধ্যে পড়েছেন স্বামীজির আর এক বিখ্যাত গৃহী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবল ভাবে বলেছেন মেয়েদের জন্য স্ত্রী মঠ স্থাপনের কথা— ''মা কে কেন্দ্রস্থানীয়া করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে (বেলুড় মঠে) যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরি হবে ওপারের মেয়েদের মধ্যেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরি হবে।'' এই রকম আশ্রমবাসে থেকে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক কয়েকজন মেয়ের অভিভাবকত্বের জন্য প্রফুল্লনাথকে অনুরোধ করলেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী অভিন্নানন্দ ও স্বামী নিরন্তরানন্দ প্রভৃতি। স্ত্রী হেমপ্রভা ও নিজের দুই মেয়েকে নিয়ে আশ্রমের কাছেই একটি বাড়িতে বাস করতে শুরু করলেন প্রফুল্লনাথ অন্য মেয়েদের সঙ্গে। বাবা, মা ও বোনেদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন আশারাণী। টাকীর সেই বাড়িতে সকাল-সন্ধে ভজন, জপ, ধ্যান ও পড়াশুনোর পাশাপাশি রান্না, গৃহস্থলির কাজকর্ম ছাড়াও খেলাধুলো, বাগান করা, সবই করত মেয়েরা। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা টাকী এলে অধিকাংশই মেয়েদের এই প্রয়াস দেখতে আসতেন অতএব বরাবরই সাধুসঙ্গ ও আশ্রমজীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশের সুযোগ ঘটত।

১৯৪২ সালে আশারাণী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছর মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে সপরিবারে চলে গেলেন গোবরডাঙায়। টাকীর বাড়িতে রয়ে গেলেন বাকিরা। অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে আশারাণীর বেশি দিন গোবরডাঙায় থাকা হয়নি। পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্য এবার পাকাপাকি ভাবে চলে এলেন কলকাতায়। ১৯৪৪ সালে আই এ পরীক্ষায় পাশ করলেন ভালো ভাবেই। ওই বছর পরীক্ষার পর কাশী বেড়াতে গিয়ে পুণ্য সঙ্গ লাভ করলেন স্বামীজির আর এক সেবাব্রতী শিষ্য কেদারবাবার (স্বামী অচলানন্দ) যিনি সাধন ভজনের জীবনে আশারাণীকে প্রভূত উৎসাহ দিলেন। সেখানেই সাক্ষাৎ হল সরলাদেবীর সঙ্গে। শ্রীশ্রীমায়ের শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গলাভে যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, সুধীরাদেবীর হাতে গড়া সরলা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। পরবর্তী কালে তাঁরা দুজন সারদা মঠে নেতৃত্ব দেবেন। সরলাদেবী সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

কাশী থেকে ফিরে শ্যামবাজারে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন আশারাণী। বি এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন উওমেনস্ কলেজে। অন্যান্য মেয়েরাও ধীরে ধীরে টাকী থেকে এসে তাদের দিদিভাইয়ের কাছে থাকতে শুরু করল। সে বছর দুর্গাপূজার আগে ছেড়ে দিতে হল শ্যামবাজারের বাড়ি। কোথায় যাবেন কোনও ঠিক নেই, সঙ্গে আরও মেয়েরা রয়েছে— খোঁজ পাওয়া গেল বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে একটি বাড়ি আছে। সদলবলে এসে উঠলেন সেখানেই। এর পর একটি কিশলয় রোপণ— সারদেশ্বরী ছাত্রীনিবাস— যা থেকে পরবর্তীকালে শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়াবে একটি নয়, দুটি বৃক্ষ।

প্রথম সম্পাদিকা হলেন শ্রীমতি সুধাময়ী সেনগুপ্তা, সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে ছোট্ট পরিসরেই থাকতেন সবাই মিলে। মেয়েদের পড়াশুনো ও আশ্রমজীবন যাপনের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল আশারাণীর। এই প্রস্তুতি যাতে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা আরও বড়ো কাজের সহায়ক হয়ে ওঠে। সঙ্গে পেলেন জেষ্ঠ্যা ভগ্নীসমা তরুলতাকে (পরবর্তীকালে প্রব্রাজিকা শুভাপ্রাণা) যিনি ছিলেন সকলের স্নেহময়ী অভিভাবিকার মতো।

সে সময়ে আশ্রমের মাসিক খরচ ছিল প্রায় ২৫০ টাকার মতো। নবনির্মিত সংগঠনের হিসেব নিয়মিত রাখা ও সেই হিসেব কোনও নামকরা হিসেব পরীক্ষক বা অডিটরকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া শুরু করলেন মেয়েরা একেবারে পেশাদারী ঢঙে। কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় নিয়মিত হিসেব পেশ করার হত। আশ্রমের পরিবেশে থেকে পড়াশুনো করে এক উৎকর্ষ জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক আরও মেয়েরা আসতে শুরু করল ধীরে ধীরে। উৎসুক ছাত্রীদের স্থান সংকুলান বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির পরিসরে ক্রমশ কঠিন হতে লাগল তাই প্রতিষ্ঠান অব্যবহিত পরেই ভাবনা চিন্তা শুরু করতে হল আশ্রমের নিজস্ব জমি ও বাড়ির। কিন্তু তার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে? ঠিক করা হল ১, ২, ৫ ও ১০ টাকার কুপন ছাপিয়ে অর্থভিক্ষা করা হবে। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ছাত্রী নিবাসের নিয়মাবলী তৈরি করলেন আশারাণী ও তরুলতা।

আশ্রম স্থাপনার খবর শুনলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ। প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যা আশারাণীকে। একই সঙ্গে বললেন, ''তোমাদের উদ্দেশ্য তো অন্য, তাহলে ছাত্রীনিবাস নাম রেখেছ কেন?'' ১৯৪৫ এর আগষ্টে আশ্রমের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ''শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম।''

বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দু নারীর কাছে সন্ন্যাস আশ্রমের যে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাতে প্রথম করাঘাত শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুধীরাদেবীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আশ্রমবিভাগ 'মাতৃমন্দির' (শ্রীশ্রী মায়ের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীসারদামন্দির নামে পরিচিত) ও পরে আশারাণীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'শ্রীসারদা আশ্রম' সেই করাঘাতকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে তুলল যদিও স্বামীজীর হাতে গড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সে সময়ে স্ত্রীমঠ গঠন ও তার পরিচালনা সম্পর্কে

যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এক দিকে যেমন আশারাণী ও তরুলতার তত্ত্বাবধানে নতুন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মেয়েরা গড়ে উঠছিল ভবিষ্যতের স্ত্রী মঠের উপযুক্ত হয়ে, অন্য দিকে তেমনই সেই স্ত্রীমঠ নিয়ে বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন আশারাণী— ''কেন এখনও মেয়েদের মঠ হল না মহারাজ?'' একই সঙ্গে পেয়ে চলেছিলেন স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, সূর্য্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ), স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী বিরেশ্বরানন্দের মতো বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা। অনেক পড়াশুনো করে আশারাণী লিখে ফেললেন একটি প্রবন্ধ 'সন্ন্যাসে হিন্দু নারীর অধিকার', ছাপা হল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মাসিক পত্রিকা উদ্বোধনের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। প্রবন্ধটি সে সময়ে বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ওই সময়ে কোনও একটি অধিবেশনে স্বামী বিরজানন্দ বলেছিলেন— ''আমাদের এখন সময় হয়েছে মেয়েদের কথা, স্বামীজীর স্বপ্নের স্ত্রীমঠের কথা ভাবার''। ভাবনার বাস্তব রূপ নিতে অবশ্য আরও আট বছর লেগেছিল। শ্রী সারদা আশ্রমে আশারাণীদের মতোই বাগবাজারে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এবং সুদূর দক্ষিণে কেরলরাজ্যের ত্রিচূরে ত্যাগী মহিলাদের আরও দুটি ধারা স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশ্রমজীবন অতিবাহিত করছিলেন সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে— পরে এই তিন ধারা এসে মিলবে এক বৃহৎ ভাবগঙ্গায় যার নাম সারদা মঠ।

তখন নিবেদিতা বিদ্যালয় ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সরাসরি পরিচালনাধীন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে এক বছরের জন্য দুজন স্বেচ্ছাকর্মী চাইলেন সারদা আশ্রমের কাছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে বিদ্যালয় থেকে চলে গিয়েছেন ভগিনী ক্রিশ্চিন ও সুধীরাদেবীর সহযোগী, অন্তিমকালে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা মীরা দেবী, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকার পদ ছেড়ে সঙ্গে গিয়েছেন কন্যাসমা বাণী দেবী ও আরও কয়েকজন। অনুমান করা যায় তখন সাময়িক কর্মী সংকট। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও সারদা আশ্রমের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগটি বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন সকলে। কর্মী হিসেবে কল্যাণী ও মায়ারাণী আশ্রমের পক্ষ থেকে গেলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। পরে দুজনেই শ্রীসারদা মঠে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৪৬-এর সে এক অস্থির সময়। পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগ আহুত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষ্যে ১৬ই আগস্ট কলকাতার বুকে ঘটে গেল মর্মান্তিক দাঙ্গা যা ইতিহাসের পাতায় 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এরই মধ্যে ডিসেম্বর মাসে আশারাণীরা শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করলেন। পরের বছর আবার বিপরীত দৃশ্য। ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭ মধ্যরাত্রে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল, আসন্ন স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে উন্মাদনা। একটি রেডিও জোগাড় করে ফেললেন আশ্রমের মেয়েরা, তার পর সারাক্ষণ স্বাধীনতার খবরের সম্প্রচার শোনা। সমবেত সকলকে দেশের কথা বলতে বলতে আবেগমথিত হয়ে পড়লেন আশারাণী। এই দেশপ্রেম অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল পিতৃদেব প্রফুল্লনাথের সংস্পর্শে।

খবর পাওয়া গেল বরানগরে গঙ্গার ধারে আশ্রমের উপযোগী জমি ও বাড়ি বিক্রি আছে। বেলুড়ের পূর্বসূরী বরানগর; কাশীপুরে প্রাপ্ত গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে স্বামীজি অন্যান্য গুরুভাইদের একত্র করেছিলেন এই বরানগরে। সেই বরানগরে নিজস্ব জমি বাড়ি হবে— মেয়েরা সকলে প্রচণ্ড উৎসাহিত। টাকার ব্যবস্থা বিশেষ করা যায়নি তখনও, সম্বল শুধু স্বামীজির উৎসাহবর্ধক বাণী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে— ''মানুষই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন-মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।'' ঠিক হল টাকা তোলার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের নাম স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ছাপানো হবে, শুধু তাই নয়, স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য আশ্রমের বাইরের কোনও বিশ্বস্ত ও জনসমক্ষে পরিচিত ব্যক্তিকে এই সংগৃহিত অর্থের তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হবে। প্রস্তাবিত হল নড়াইলের জমিদার বাবু গিরীন্দ্রনাথ রায়ের নাম।

বরানগরের জমি ও বাড়িটির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে হল না কিন্তু ১৯৪৮-এর প্রথম দিকে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোডে (বর্তমান শরৎ বসু রোড) একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি দেখতে গেলেন আশারাণী ও তরুলতা আশ্রমের সভানেত্রী হিমাংশুবালা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ৮০/১/এ বাড়িটি দেখে তাঁদের বেশ পছন্দ হল। বেশ খোলামেলা বাড়ি, সঙ্গে কিছুটা ফাঁকা জমিও আছে। এটর্নি রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে থাকা বাড়িটির মাসিক ভাড়া সে সময়ে ছিল ২২০ টাকা। এ ছাড়া বাড়ির মালিক বাড়ির জন্য আগ্রিম বাবদ ৫০০০ টাকা ও সংলগ্ন বাগানের জন্য ১০০০ টাকা দাবি করে বসলেন। ১৯৪৮ সালে ৬০০০ টাকার অর্থমূল্য আজকের নিরিখে কত ছিল পাঠক নিশ্চয় তা আন্দাজ করতে পারছেন! টাকা জোগাড় করার বেশি সময়ও হাতে নেই কারণ বাড়ি ভাড়া নিতে হলে সে বছর ২১ শে মার্চের মধ্যে অগ্রিম জমা দিতে হবে। সেই বছর জানুয়ারি মাস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী প্রভবানন্দ সারদা আশ্রমকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু বলাই বাহুল্য এ ক্ষেত্রে সে পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কিছুটা হতাশ হলেন আশারাণী। ঠিক হল আশ্রমে আরও কিছু বৈতনিক ছাত্রী নেওয়া গহবে। এমত সময়ে আশ্রমে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এক বিদেশিনী। মাসিক ভাড়া সমেত আশ্রমের সব নিয়ম ও শর্তাবলী স্বীকার করার পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া নেবার অগ্রিম টাকা তিনি আশ্রমকে বিনা সুদে ধার দিতে রাজি হলেন। ফরাসী এই বিদেশিনীর নাম লিজেল রেমঁ। ১৮৯৯ সালে ফ্রান্সে জন্ম লিজেলের। বিয়ে হয়েছিল প্রকাশক জঁ হার্বাটের সঙ্গে কিন্তু ১৯৪৭ নাগাদ বিবাহবিচ্ছেদ। এর পর লিজেল কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন; ইচ্ছে আর এক বিদেশিনীর ভারতবর্ষে আত্মনিবেদনের কাহিনি লিখবেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনী— 'দ্য

ডেডিকেটেড'। লিজেল এসে উঠলেন সারদা আশ্রমে।

ইতিমধ্যে আশ্রমের ক্রমশ প্রসারিত কর্মকাণ্ডের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজন হচ্ছিল এমন একজন সম্পাদিকার যিনি সর্বক্ষণ আশ্রমে উপস্থিত থাকবেন। ১৯৪৭-এর ২৪শে ডিসেম্বর শ্রী সারদা মহিলা আশ্রমের সম্পাদিকার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী।

১৯৪৮-এর মার্চে আশারাণীরা ল্যান্সডাউন রোডের নতুন বাড়িতে এসে উঠলেন। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছাত্রী নিবাসটি অবশ্য সেখানেই রয়ে গেল, দায়িত্ব নিলেন কল্যাণী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী ছাত্রী সহ প্রায় ন'দশ জন ছাত্রী সেখানে থাকত কিন্তু এই ১৯৪৮-এ দেখা গেল সেখানে আর সে রকম সংখ্যায় ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। পর্যাপ্ত সংখ্যায় বৈতনিক ছাত্রী ছাড়া অর্থের সংকুলান হচ্ছে না দেখে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছাত্রীনিবাস বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কল্যাণী অবশিষ্ট আবাসিকদের নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের নতুন আশ্রম বাড়িতে চলে এলেন। নতুন আশ্রমবাড়ি সংলগ্ন একটি বাগান ছিল। আশ্রমের জন্য বাগানটির মাসিক ভাড়া দিতেন জনৈক মার্কিন ভক্ত মিঃ ওভারটুন।

১৯৪৮-এ প্রস্তাব উঠল পুনরায় আশ্রমের নাম পরিবর্তনের। আশারাণী বললেন, প্রথমাবস্থায় আশ্রমের নামের মধ্যে 'মহিলা' কথাটির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অতঃপর সেটি বাদ দিলেও চলে। লিজেল রেমঁ ৭ই এপ্রিলের সেই সভায় সদ্য আশ্রম কার্যকারী সমিতির সদস্যা হয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যের মানুষ, আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে 'মহিলা' শব্দটি আলাদা করে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবহার করলে এক প্রকার সংকীর্ণতা এনে দেয়। সবার মত নিয়ে নতুন নাম হল ''শ্রীসারদা আশ্রম''। তখন থেকে আজ অবধি এই নামই চলে আসছে। তবে তার পর পর কিছু দিন আশ্রমের নামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে 'মহিলাদের জন্য' কথা দুটি লেখা হত।

ল্যান্সডাউন রোডে আশ্রম স্থানান্তরিত হবার ফলে ইতিপূর্বের স্থানাভাবের সমস্যা আর রইল না, আশ্রমিকারা কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার সুযোগ পেলেন। প্রতি বুধবার আশ্রমে মহিলাদের জন্য ধর্মমূলক ও অন্যান্য বিষয়ে সাপ্তাহিক ক্লাশ নেওয়া আরম্ভ হল। সে বছর জুন মাস থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও নারীজাতির শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সাপ্তাহিক ক্লাশের সূচনা করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রী মায়ের শিষ্য শ্রী কুমুদবন্ধু সেন। ভগিনী নিবেদিতার কথা বলতে শুরু করলেন লিজেল। আশ্রমবাড়ির দোতলার ঘরে মনোগ্রাহী ক্লাশ নিতেন আশারাণী। ১৯৪৮ সালে কয়েক দিনের জন্য কাশী থেকে কলকাতায় এসে তিন দিন 'সারদা আশ্রমে' থাকলেন সরলাদেবী। তার মধ্যে এক দিন সাপ্তাহিক ক্লাশে সমবেত ভক্তদের শোনালেন শ্রীশ্রীমায়ের কথা। সাপ্তাহিক ক্লাশ নিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরবর্তীকালে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী পদ্মভূষণ ডাঃ ফুলরেণু গুহ। ক্লাশ নিতে এসেছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সচিব ডঃ কালিদাস নাগ। আশারাণীকে তিনি উৎসাহ দিলেন ভগিনী নিবেদিতার একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনার জন্য। পরবর্তীকালে সারদা মঠে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বহু পরিশ্রম করে সেটি সম্পন্ন করেছিলেন আশারাণী— তখন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

আশ্রমে রেডক্রশ সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র খোলা হল যেখান থেকে বাচ্চাদের জন্য দুধ বিতরণ করা হত। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পর তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সদ্য সদ্য নিয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। লিজেল রেমঁ সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে, তাঁকে জানালেন আশ্রমের কথা। ডাঃ রায় সেই সময়ে উদ্বাস্তু শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আসার বিরাম নেই। জিজ্ঞেস করলেন কিছু আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থী ছাত্রীর ভার আশ্রম নিতে পারবে কি না? আশ্রমিকারার ঠিক করলেন সরকারের পক্ষ থেকে সে রকম কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব এলে তাঁরা বিবেচনা করবেন। বৈতনিক ছাত্রীর জন্য মাসিক ৪৫ টাকা চার্জ ধার্য্য করে কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হল যাতে আরও কিছু ছাত্রী পাওয়া যায়।

বেদান্ত সোসাইটি থেকে স্বামী প্রভবানন্দ আশ্রমের জন্য ৬৫৩০ টাকার অর্থসাহায্য পাঠালেন বেলুড় মঠের মাধ্যমে। শ্রীমতী রেমঁর ঋণ শোধ করে দেওয়া হল। সঠিক সময়ে তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে সরে আসার পর ব্যাঙ্কের শাখা জোড়াসাঁকো থেকে পরিবর্তন করে দক্ষিণে ভবানীপুরে নিয়ে আসা হল। তখন বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও বিদেশি অনুদানের জন্য ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কে আশ্রমের অ্যাকাউন্ট ছিল। টাকা তোলার দায়িত্ব ছিল আশারাণীর ও তরুলতার ওপর। নিয়মিত হিসেব রাখা, তা পরীক্ষা করানো ও কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় তার বিবরণ সকলের সামনে পেশ করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্রমের ভবিষ্যতের জন্য তহবিল তৈরি করার ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক ও সচেষ্ট হতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে অর্থসাহায্য আসতে লাগল। দিল্লি থেকে জনৈকা সারদা সেনন ১১৫৩ টাকা সংগ্রহ করে পাঠালেন। আশ্রমের স্থায়ী তহবিলের জন্য ফিক্সড্ ডিপোজিট করা তখন থেকেই শুরু হল। ১৯৫০-র এপ্রিলে করা প্রথম ফিক্সড্ ডিপোডিটের পরিমাণ ছিল ৭৫০ টাকা।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে থাকাকালীন প্রতি বছর শ্রী শ্রী মায়ের জন্মোৎসব ভক্তিভরে পালন করতেন সকলে। ল্যান্সডাউন রোডস্থ নতুন বাড়িতে উৎসবের কলেবর বৃদ্ধি পেল। ছাত্রী নিবাসে মেয়েদের পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ইত্যাদির কারণে সব সময়ে তিথির নির্দিষ্ট দিনেই উৎসবের আয়োজন করা যেত না। ১৯৪৮-এর জন্মোৎসব পালিত হল পরের বছর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তিন দিন ব্যাপী উৎসবে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, হোম, জীবনী আলোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি প্রবল উৎসাহে সম্পন্ন করলেন আশ্রমিকারা অন্যান্য ভক্ত মহিলাদের সহযোগিতায়। জন্মোৎসবগুলির একটি মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান ছিল প্রতি বছর শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত একটি কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।

মাঝে মাঝে ভক্তদের সাপ্তাহিক ক্লাশ

নেওয়ার পাশাপাশি আশ্রমিকাদের গীতা পড়াতেন আশারাণী। তাঁদের ফরাসী শেখাতেন লিজেল রেমঁ। আশারাণীর থাকত বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার কাজ ও অর্থসংগ্রহের জন্য নিয়মিত ভক্তবাড়ি যাওয়া। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজের পড়াশুনোয় তিনি কোনও ফাঁক রাখেননি। ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাশ করার পর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.টি. পাশ করেছিলেন প্রথম শ্রেণিতে, তার পর ভর্তি হয়েছিলেন এম.এ. পড়ার জন্য। ১৯৪৯-এ কৃতীত্বের সঙ্গেই পাশ করেছিলেন এম.এ. পরীক্ষায়। নিজের অধ্যয়নের পাশাপাশি আশ্রমের অন্যান্য ছাত্রীদের পড়াশুনোর অগ্রগতির উপর ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ নজর।

১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড শুরু হল। মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবে স্থাপিত হল ''শ্রী সারদা আশ্রম টোল''। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের নিয়ে গঠন করা হল টোলের আলাদা কার্যনির্বাহী সমিতি। তার সভানেত্রী হলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরী, সম্পাদিকার দায়িত্বে রইলেন আশারাণী। তরুলতা ছাড়াও সঙ্গে পেলেন বাসনা সেন, গীতা দত্ত, বাসন্তী সেনগুপ্তা, তুহিনীকা চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ও নিষ্ঠাবতী মহিলাদের। টোলের তত্ত্বাবধান, পণ্ডিতের বেতন ও অন্যান্য খরচ আশ্রম থেকে নির্বাহ হতে লাগল। সাত জন ছাত্রী সংস্কৃত ব্যাকরণে 'আদ্য' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সচিবের পদ থেকে সাময়িক অবসর নিলেন স্বামী মাধবানন্দ। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। ১৯৫০-তে আশারাণীর কাছে প্রস্তাব এল সারদা আশ্রমের সদস্যারা যদি নিঃশর্তে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগ দেন তা হলে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে স্ত্রী মঠে আসার সুযোগ হবে। এত দিনের অপেক্ষার অবসান আসন্ন প্রায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছে শ্রীশ্রীমায়ের নামে মঠের। আশারাণী বুঝলেন স্বামীজির স্বপ্ন সফল করতে গেলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। তাই আর দ্বিধা না করে নিজের হাতে গড়া সারদা আশ্রম ছেড়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সারদা আশ্রমে তখন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। আশ্রম তখন স্বচ্ছল এবং পাঠ, প্রবচন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত এক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। আশারাণীর এ হেন সিদ্ধান্তের পর আশ্রম আদৌ থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে এই প্রশ্নই প্রকট হয়ে দেখা দিল। কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বোপরি প্রয়োজন এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ত্যাগী মহিলা কর্মীর। ২৭শে জুলাই (১৯৫০) আশ্রমের কার্যকরী সমিতির সভায় কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। সভানেত্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী, দুই সহ সভানেত্রী শিবানী চক্রবর্তী ও শতদল ঘোষ এবং অন্যরা আলোচনায় বসে স্থির করলেন সারদা আশ্রম থাকবে। তাকে একটি আদর্শ ছাত্রী নিবাসে পরিণত করা হবে যাতে পুনরায় সেখান থেকে ত্যাগী মেয়েদের তৈরি করা যেতে পারে। ছাত্রী নিবাসে পরিণত করে আশ্রমকে রক্ষা করার জন্য আবাসিক ছাত্রী আহ্বান করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পরিচালিকারা আরও একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। ভবিষ্যতে কোনও কারণে আশ্রম পরিচালনা সম্ভব না হলে, আশ্রম বন্ধ করে দেবার পর উদ্ধৃত অর্থ ও জিনিসপত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা আরও বললেন আশ্রম থেকে আশারাণী সহ অধিকাংশ সদস্যারা রামকৃষ্ণ মিশনে সুযোগ পাবার জন্য তাঁরা আনন্দিত। এই থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যাঁরা পড়ে রইলেন, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আশ্রম বন্ধ করে দেবার সহজ রাস্তায় তাঁরা হাঁটলেন না। অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী তথা মধ্যমণী এবং অধিকাংশ কর্মীদের আশ্রম ত্যাগের প্রবল ধাক্কা সামলে প্রস্তুত হলেন আগামী দিনে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য— যে সিদ্ধান্ত না নিলে আজ এই ইতিকথা লিখতে বসার প্রয়োজন হত না। স্বামীজির ভাব তো রয়েছে এখানেও, এটিই আদি ধারা তাই এ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আগস্ট ১৯৫০। সমস্ত দায়িত্ব ও হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সম্পাদিকার পদ ছাড়লেন আশারাণী। তিনিও অন্য ১৮ জন চলে এলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। শুরু হল তাঁদের জীবনে আর এক অধ্যায়। ১৯৫১-এ আশারাণীকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। এই বিদ্যালয় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। অপর দিকে আশারাণীর পর তাঁর হাতে গড়া সারদা আশ্রমের দায়িত্বভার যাঁরা পরবর্তীকালে তুলে নিলেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যাদ্বয় মীরা দেবী ও বাণীদেবীর রামকৃষ্ণ ভাবধারায় কর্মজীবন শুরু এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। মীরাদেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় শ্রীশ্রীমা নাকি এক বার মন্তব্য করেছিলেন ''নিবেদিতার ইস্কুলই স্ত্রীমঠ''। ১৯৫৪ সালের ২রা ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীসারদা মঠ। আশারাণী সহ সাত জনকে ব্রহ্মচর্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা দেওয়া হল। পরবর্তীকালে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস। আশারাণী হলেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

শ্রীসারদা আশ্রমের নতুন সম্পাদিকা হলেন সুধাময়ী সেনগুপ্তা। সহকারী সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা হলেন শ্রীমতী অমিয়া সেন। কল্যাণীদেবীর হাত থেকে ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গেল শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের হাতে। শ্রীসারদা আশ্রমের মেয়েদের পড়াশুনোয় সাহায্য করতেন শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, কর্মজীবনে ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি নিলেন সংস্কৃত টোলের দায়িত্ব। আশ্রমের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তখন প্রধান কাজ। আয় কমে যাওয়ায় ব্যয় বেশি হতে লাগল। জোর দেওয়া হল ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। আই এ, বি এ, পাঠরতা ছাত্রী ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরতা ইচ্ছুক ছাত্রীদেরও জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সকলে। এরই মধ্যে আশ্রম থেকে চলে গেলেন লিজেল রেমঁ। আলমোড়ায় যোগী শ্রী অনির্বাণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুমায়ুন হিমালয়ের কোলে বসে লিখলেন 'মাই লাইফ উইথ এ ব্রাহ্মিণ ফ্যামিলি'। পরবর্তীকালে ভারত ত্যাগ করে তিনি জেনিভায় চলে যান ও বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

শ্রীসারদা আশ্রমে যখন এমনই পরিস্থিতি, তখন গ্রে স্ট্রীটে দুটি ঘর

ভাড়া করে রয়েছেন শ্রীশ্রী মায়ের শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গলাভ ও সেবা করে জীবন সার্থক করা তাঁর দুই শিষ্যা— মারীদেবী ও বাণীদেবী। ১৮৯২ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেটের ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে মীরাপ্রিয়া চৌধুরীর জন্ম। পিতা কামিনীকুমার চৌধুরী ছিলেন গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী কর্মনিপূণা ও ভক্তিমতি। কামিনীকুমার ও শ্যামাসুন্দরীর নবম সন্তান ছিলেন মীরা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গানের গলা খুব মিষ্টি, বাড়িতেও ছিল গানবাজনার নিয়মিত চর্চা। এক বার কুমিল্লার এক ম্যাজিস্ট্রেটকে পর পর প্রায় চল্লিশখানা গান শুনিয়েছিলেন। স্বদেশী গানও অনেক জানা ছিল তাঁর। একান্নবর্তী পরিবার, ভাইবোনদের সাহচর্যে সময় কেটে যেত। তিনমহলা বাড়ির পাশে বড়ো পুকুর। সেই পুকুরের এক পাড়ে একজন বসে গান ধরতেন, অপর পাড়ে বসে সেই সুরে গলা মেলাতেন মীরা। দিদি চপলার কাছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার সাথে প্রথম পরিচয়। এই ভাবরাজ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য সংসারের মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন মীরা। ১৯১৪ সালে যোগ দিলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কাজে। সেখানে পথপ্রদর্শকরূপে পেলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন ও রামকৃষ্ণভাবে সংসারত্যাগী সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় বাঙালি মহিলা সুধীরা বসুকে। প্রথমে কাছে একটি বাড়িতে একতলায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন, রান্না করে দিতেন এক বয়স্ক ব্রাহ্মণী। ওই বছরেই ভগিনী ক্রিশ্চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার পর বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব এল সুধীরা দেবীর হাতে ও তাঁর সুযোগ্য সাহায্যকারী হয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়েই থাকতে আরম্ভ করলেন মীরা।

১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮, রবিবার শ্যামাপূজার দিন বাগবাজারে বোস পাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ি। উপস্থিত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সঙ্গে অপর দুই গুরুভ্রাতা রাখাল ও শরৎ। একটু পরেই এসে পড়লেন যুগজননী, সঙ্গে গোলাপ-মা ও যোগীন মা। পূজা সম্পন্ন হতেই সেই বিখ্যাত আশীর্বাণী ''আমি প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।'' আনন্দে, আবেগে আত্মহারা নিবেদিতা তাঁর দিনলিপিতে লিখতে পারলেন মাত্র দুটি কথা— ''স্কুল খুলল''। খুলল বটে কিন্তু দেখা দিল অর্থসংকট। সাময়িক ভাবে বিদ্যালয় বন্ধ রেখে অর্থসংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি দিলেন নিবেদিতা। একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন তাঁর প্রকল্প সম্বন্ধে— দ্য প্রজেক্ট অফ রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও নরওয়ে হয়ে ভারতে ফিরে ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পূজার দিন পুনরায় বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন পাশের বাড়ি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে। পরের বছর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন। মেয়েরা ডাকত 'সান দিদি' আর 'মুন দিদি'। ১৯০৬ সালে এলেন সুধীরা বসু। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙের 'রাই ভিলা'-তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নিবেদিতা। দীর্ঘকাল অনাদরে অবলোয় পড়ে থাকার পর 'রাই ভিলা' বাড়িটি সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র হিসেবে নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।

মীরাদেবী আসার প্রায় কাছাকাছি সময়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তার 'ছোটমাসি' সুধীরা দেবীর সঙ্গে থাকতে এল তাঁর বারো বছরের বোনঝি বাণী ঘোষ। ছোটবেলায় হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারার জন্য ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'গদাই'। মাসি সুধীরাদেবীর তত্ত্বাবধানে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে প্রবেশিকা ও তার পর বেথুন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন বাণীদেবী। স্কটিশ চার্চ কলেজে বি এ পাঠক্রমে ভর্তি হয়েও পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পরে অবশ্য প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেছিলেন। ছোট হলেও তার উপযোগী বিদ্যালয়ের অনেক কাজ বাণীর উপর ন্যস্ত করতেন সুধীরা দেবী। বরাবর দক্ষতার সঙ্গে সে সব কাজ সম্পন্ন করতেন বাণী। কাছেই থাকতেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর দেহত্যাগের মাসখানেক আগে থেকে বাণীসহ বিদ্যালয়ের কয়েকজন মেয়ে তাঁকে পালা করে হাওয়া করতে যেতেন। মা জানতেন বাণীর ডাকনাম কিন্তু কখনও সরাসরি সেই নামে ডাকতেন না, বলতেন 'ঠাকুরের নামের যে মেয়েটি আছে, তাকে ডাক।' বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করে সুধীরাদেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন মীরা। ২০শে জুলাই ১৯২০। প্রতি দিনের মতো ছুটির পর মাতৃদর্শনে গিয়ে শারিরীক অবস্থার অবনতি দেখে রাত্রে মায়ের বাড়িতে রয়ে গিয়েছিলেন মীরাদেবী। সেই রাত্রে ১-৪০ মিনিটে ব্রাহ্মে লীন হলেন যুগজননী।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাবসানের পর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেন সুধীরা দেবী। তীর্থে বার হলেন, সঙ্গে মীরা, বাণী, সরলা, চপলা সহ আরও কয়েকজন। দুর্গাপূজার সময়টা কাশীতে কাটিয়ে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, বৃন্দাবন, আগ্রা, প্রয়াগ হয়ে পুনরায় কাশী ফেরার পথে ঘটল এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বারাণসীর অদূরে চলন্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে পড়ে গেলেন সুধীরাদেবী। মাথায় গুরুতর চোট নিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসা হল কাশী সেবাশ্রমে। জ্ঞান আর ফিরল না, পর দিন বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হল মণিকর্ণিকায়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল ভগিনী নিবেদিতার ছাত্রী ও সুধীরাদেবীর অনুগামী মহামায়ার উপর। কিছু দিন পরেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহামায়া। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এল মীরাদেবীর উপর। ১৯২৭ সালে হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন পিতৃপ্রতীম স্বামী সারদানন্দ। বিদ্যালয়ে আবার সাময়িক সংকট। মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করে চলে গেলেন মীরাদেবী, সঙ্গে বাণীদেবী, কিন্তু দু বছর পর (১৯২৯) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিলেন সারদামন্দিরের দায়িত্ব। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব দেওয়া হল বাণীদেবীকে। সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল মীরাদেবীর। ছাত্রীদের পড়াতেন সংস্কৃত ও বাংলা আবার তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছেন ইংরেজি ও অঙ্ক। তাঁর লেখা 'কিশলয়' ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার অত্যন্ত উপযোগী। তিনি ও বাণীদেবী প্রতি দিন লক্ষ্য রাখতেন প্রতিটি ক্লাসে ঠিক মতো পড়াশুনো হচ্ছে কি না। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অভিনব ও বিষয়ের উপর ছাত্রীদের দৃঢ় ভিত তৈরি করে দেওয়ার সহায়ক। এ কথা পরবর্তীকালে তাদের স্মৃতিচারণায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে কয়েকজন

ছাত্রী। ক্রমে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর আরম্ভ হল পরিচালনগত কিছু বিষয়ে। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে ১৯৪৬ এর ৪ঠা মে রেণুকা বসুর (পরবর্তীকালে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা) হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দির থেকে চলে গেলেন মীরাদেবী, সঙ্গে কন্যাসমা বাণী। কয়েকমাস শৈলশহর শিলঙে কাটানোর পর কলকাতায় এসে উঠলেন গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ির দুখানা ঘরে। তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয় থেকে চলে এলেন তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রী ও পরে সহকর্মী ঊষা সেন, শোভা সেন, অনিলা রায়। ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গৃহশিক্ষকতা করতেন কেউ কেউ। ঊষাদেবী শিক্ষিকার চাকরি নিয়েছিলেন স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে। ১৯৩৪ সালে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক ও আরও দুটি বিষয়ে আশি শতাংশের উপর নম্বর পেয়ে কৃতীত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ঊষা। ১৯৩৬-এ দ্বিতীয় দলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন অনিলা। পরে দুজনেই শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তাঁর সাধের নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদামন্দির ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন মীরাদেবী। কিন্তু বরাবর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ''কেউ যদি আশ্রমজীবন নিতে চায় তাকে মঠকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মঠ হচ্ছে গুরুস্থান। ঠাকুর সেখানে আছেন।'' ইন্দিরা গুহ ছিলেন বাণীদেবীর বোনঝি এবং সুধীরা দেবী ছিলেন তাঁর দিদিমার বোন। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে— 'হয়তো ওঁরা সে সময়ে স্থির ভাবে মায়ের চরণ আশ্রয় করে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের জন্য মা কী ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মুক্তি নিয়ে এলেন পূজনীয় স্বামী অখিলানন্দজী। এই জীর্ণ দীর্ণ গৃহে (গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি) এক দিন প্রবেশ করলেন এক সাধু মহারাজ। যিনি আমেরিকার সেন্টার থেকে মাতৃভূমি ও তাঁর গুরুস্থান ও ভ্রাতৃবৃন্দকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কিছু দিন আগেই তিনি 'মায়ের মেয়েদের খোঁজ শুরু করেছিলেন। সন্ধান পান পূজনীয় সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) কাছে। তাঁরই সহায়তায় 'মায়ের মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা হলেন মূলতঃ শ্রীমীরাদেবী ও বাণীদেবী যাঁরার শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ কন্যারা। অন্যরাও ছিলেন। মহারাজ এলেন, মাসীমায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন।

১৯৫১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন এই বিশেষ যোগাযোগের ফলস্বরূপ মীরাদেবী এসে উঠলেন ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থিত শ্রী সারদা আশ্রমে। সঙ্গে ছায়াসঙ্গী বাণীদেবী ও ঊষা, অনিলা, শোভা, প্রভৃতি। সঙ্গে এল নিবেদিতা বিদ্যালয় ত্যাগ করার সময়ে নিয়ে আসা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির ছোট ছোট তিনটি ছবি। ১৯১৮ সালে অন্তঃসত্ত্বা রাধুদিকে নিয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আশ্রমবাড়ির ওপরতলায় কিছু দিন বাস করার সময় শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের বেদীতে ওই তিনটি ছবির প্রতি দিন পূজা করেছেন। বোধ হয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার ইতিহাসে এটিই শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র ছবি। ছবি তিনটি বর্তমানে নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মীরাদেবীর সঙ্গে আরও ছিল শ্রীশ্রীমায়ের মাথার চুল, নখ ও আঙুলের টিপ সই। শ্রীসারদা আশ্রম মন্দিরে বর্তমানে নিত্য পূজিত শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন অন্তিমশয্যায় শায়িত মাতাঠাকুরাণীর পা থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) এবং দিয়েছিলেন মীরাদেবী ও বাণীদেবীকে। সবই বর্তমানে আশ্রমে সশ্রদ্ধায় ও সযত্নে রক্ষিত। ১৯৫১-এর অক্টোবর মাসে মীরাদেবী ও বাণীদেবী সহ ঊষা, শোভা ও অনিলা সদস্যা হলেন আশ্রম কার্যকরী সমিতির। সম্পাদিকা সুধীময়ী সেনগুপ্ত তাঁর পড়াশুনোর জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাঁর কর্ম অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে বাণী দেবীকে নতুন সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হল। ও দিকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কিছু দিনের জন্য প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী। নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদা আশ্রমের মধ্যে এ এক অদ্ভুত দায়িত্ব অদল-বদল।

দায়িত্ব নিয়েই শক্ত হাতে হাল ধরলেন বাণীদেবী। পরিস্থিতির সুযোগে ছাত্রী নিবাসের নিয়মে কিছু শিথিলতা দেখা গিয়েছিল মূলতঃ ছাত্রীদের বাইরে যাওয়া আসা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আশ্রমে দেখা করতে আসার ব্যাপারে। সেগুলি পুনরায় জানিয়ে নিয়মাবলী পরিমার্জন করা হল। ঠিক হল ছাত্রীনিবাসে কেবলমাত্র স্নাতকশ্রেণি ও তার নীচের ছাত্রাদের রাখা হবে। সহ সম্পাদিকা অনত্র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ডিসেম্বর মাসে সহ সম্পাদিকা দায়িত্ব নিলেন ঊষাদেবী। পরে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে ছাত্রীনিবাসের দায়িত্বে এসেছিলেন অনিলা দেবী।

প্রতি বছর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আবার সাড়ম্বরে পালিত হওয়া শুরু হল। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুসম্পন্ন হল তিন দিন ব্যাপী উৎসব। প্রথম দিন সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন, আরাত্রিক ভজন, ইত্যাদির মধ্যে পাঁচশো ভক্ত মহিলা অন্নপ্রসাদ পেলেন। দ্বিতীয় দিন আয়োজিত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা সুনীতিবালা গুপ্ত, মনোগ্রাহী বক্তব্য রেখেছিলেন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ওই কলেজেরই অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'স্বাধীন ভারতে চিন্তাধারায় শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর দান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। মীরাদেবী ও বাণীদেবী আসার পরে ১৯৫১-এর জুলাই মাস থেকে আশ্রমে এসে থাকতে আরম্ভ করেছিল সে। আশ্রমে এম.এ. পাঠরতা অবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হল-এ আয়োজিত সভায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে সে সকলের নজর কেড়েছিল। উত্তরকালে শ্রীসারদা আশ্রমে সে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছিল। মেয়েটির নাম রেবা রায়।

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে উক্তসভায় বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ও শিক্ষাবিদ ডঃ রমা চৌধুরী, বিচারপতি শ্রী কমলচন্দ্র চন্দ্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদার ও শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সুযোগ্য পুত্র জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ২৩শে জুন ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন মীরাদেবী। সে কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর দিনলিপিতে। ১৯৫৫ সালের উৎসবে বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের শিষ্যা রেবা রক্ষিত লোমহর্ষক ক্রীড়া ও যোগব্যায়াম প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৫৭-এর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন বর্ধমানের মহারাণী।

এই রকমই এক সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এক সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৈলাশনাথ কাটজুর কন্যা এবং স্বাধীন বিকানীর ও পরে কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যার কৈলাশ নারায়ণ হাক্সারের পুত্রবধু শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্সার। এর পর সুভদ্রাদেবী আজীবন আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে তিনি আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির সহ সভানেত্রী হন এবং পরে দীর্ঘ সময় সভানেত্রীর পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে আশ্রমে একটি দুঃসাহসিক চুরি হল। রাত্রে শোওয়ার ঘরের শিক ভেঙে আবাসিক মেয়েদের দামি কাপড় ও কিছু গয়না নিয়ে গেল চোরেরা। সে সময়ে ওই অঞ্চলে হঠাৎই বেড়ে গিয়েছিল চুরির উপদ্রব। এক বার মাঝরাতে চুরি করতে গিয়ে লোকজন জেগে যাওয়ায় প্রবল চিৎকার ও হই হট্টোগোলের মধ্যে এক চোর ধরা পড়ে গেল আশ্রমের পাশেই। তার পর তাকে ঘিরে ধরে প্রবল উত্তম মধ্যম দেবার মাঝে পুলিশের আবির্ভাব। পুলিশ দেখেই চোরের প্রতিক্রিয়া— 'পুলিশ এসেছে। বাঁচলুম!' পুলিশও উপস্থিত সকলকে হম্বিতম্বি শুরু করল— 'এ চোর তার প্রমাণ কী?' পরে দেখা গেল সে দাগি চোর, এর আগে কয়েক বার ধরা পড়েছে। আশ্রমবাড়ির নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও মজবুত করার আশু প্রয়োজন, সেই সঙ্গে এই সুযোগে কিছু অত্যাবশ্যক মেরামতির দরকার। কিন্তু আবার সেই সমস্যা— অর্থ। বাড়ির মালিক এ ব্যাপারে কোনও রকম ব্যয় করতে রাজি নন। বৈদ্যুতিন সমস্ত কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত খরচ বহনের জন্য এগিয়ে এলেন মীরাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচন্দ্রশেখর নিয়োগী। পরবর্তীকালে সারদা আশ্রমের ইতিহাসে ইনি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

১৯৫৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ কলকাতা পুরসভার কাছ থেকে বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি পাওয়া শুরু করল শ্রীসারদা আশ্রম। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'কেয়ার মিশন' থেকে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের জন্য স্থায়ী অনুদানের ব্যবস্থা হল। ছাত্রীনিবাসের জন্য কিছু টাকা নিয়মিত অনুদান পাওয়া শুরু হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই সময়ে আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হলেন রেবাদেবী। পরে তিনি সম্পাদিকা ও আশ্রমের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন।

শ্রীসারদা আশ্রমের তৎকালীন কর্মকাণ্ড মূলতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল— ধর্মীয়: প্রত্যহ ঠাকুরসেবা, শাস্ত্রপাঠ, সাধনভজন ও বিশেষ বিশেষ তিথি উৎসব পালন; সাংস্কৃতিক: মহিলাদের জন্য সাপ্তাহিক ক্লাশ ও গ্রন্থাগার; এবং সেবামূলক: যার কেন্দ্রে ছিল শ্রীসারদা আশ্রমের ছাত্রীনিবাস— বৈতনিক ও অবৈতনিক ছাত্রীদের নিয়ে। অর্থের সংকুলান হত অনুদান ও অন্যান্য আর্থিক দান থেকে। ছাত্রী নিবাসের আবাসিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির নানা উপায়ে চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। এক আমেরিকাবাসী শুভানুধ্যায়ী ভক্ত রবার্ট লুই ও তার সহধর্মিনী অর্থ সাহায্য করতেন। ১৯৫৫ সালে সরকারের 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড' থেকে ৩০০০ টাকা সাহায্য এল।

১৯৫৫ সালটি শ্রীসারদা আশ্রমের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আশ্রমকে শক্ত ও স্থায়ী সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন বাণী দেবী। আরম্ভ হল আশ্রমের সংবিধান তৈরি এবং কয়েকটি খসড়ার পর সেই সংবিধান অনুমোদিত হল। ঠিক যেমন স্বামী বিবেকানন্দ মঠ পরিচালনার জন্য অছি পরিষদ গঠন করেছিলেন, তেমনি শ্রীসারদা আশ্রমের সংবিধানেও অনুরূপ একটি 'ডিড অফ ট্রাস্ট' তৈরি করা হল এবং শ্রীশ্রী মায়ের আদর্শে তাঁর সেবাকর্মে যাঁরা জীবন অতিবাহিত করার ব্রত নিয়েছেন, এমন পাঁচজনকে নিয়ে প্রথম অছি পরিষদ গঠন করা হল। এই পাঁচজন হলেন মীরা দেবী, বাণী দেবী, ঊষা দেবী, অনিলা দেবী ও শোভা দেবী। ঠিক হল অছি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ পর্যন্ত ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে। অতঃপর নতুন সংবিধান অনুসারে চালিত হবে আশ্রম। ঠিক হল যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীর আদর্শে ও ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আশ্রমের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তাঁরা কয়েকটি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে 'ব্রতধারিনী' নাম নেবেন। অতঃপর তাঁদের আশ্রমের কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও অন্যান্য বিধি নিয়মের মধ্যে চলতে হবে। মীরা দেবী হবেন এই ব্রতধারিনী সঙ্ঘের প্রধান এবং আশ্রমে ধর্মজীবন যাপনের ব্যাপারে তিনিই নির্দেশ দেবেন। একই সঙ্গে ১৯৫৫-তে আশ্রমের নাম রেজিস্ট্রি করা হল। রেজিস্ট্রির পর যখন শংসাপত্র পাওয়া গেল তখন দেখা গেল তাতে শ্রীসারদা আশ্রম নামের বানান ইংরেজিতে 'Sri'র পরিবর্তে 'Sree' লেখা হয়েছে। এই কারণে অদ্যবধি আশ্রমের নাম ইংরেজিতে সর্বত্র 'Sree Sarada Ashrama' লেখা হয়ে থাকে।

আশ্রমকে আত্মনির্ভর হতে হলে প্রয়োজন আর্থিক আয় ও সেই কারণে কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা। এই প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাভাবনা শুরু হল। কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের ভাড়া বাড়িতে তার নানা অসুবিধা। যদি নিজস্ব জমি কিনে সেখানে বাড়ি তৈরি করা যায় তবে আশ্রমের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিত হওয়া চলে। আশ্রমের কাজ বেড়ে যাওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে ল্যান্সডাউন রোডের আশ্রম বাড়িতে সংকুলান হবে না ও বিদ্যালয়ের মতো প্রকল্প আরম্ভ করা যাবে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। শেষ হয়ে আসছিল বাড়ির ভাড়াচুক্তির (লিজ) মেয়াদ। এটর্নি রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, যাঁর তত্ত্বাবধানে সেই বাড়ি, জানতে চাইলেন তাঁরা সেখানে আর থাকতে চান কি না।

গরচা রোডে একটি পুকুর ও ফলের বাগান সমেত প্রায় ২ বিঘা ১৪ কাটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল, দাম ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আবার সেই এক সমস্যা— দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করা। জনসাধারণের কাছে আবেদন করে অর্থভিক্ষা করা সাব্যস্ত হল আরও এক বার। এটর্নি শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে আশ্রমকে জমি কেনার ব্যাপারে সাহায্য কররে এগিয়ে এলেন। এ বার অন্য সমস্যা। কেনার ব্যাপারে ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে জানতে পারা গেল জমিটি এক নাবালকের সম্পত্তি। দেখা দিল নানা জটিলতা। গরচা রোডের জমিটি কেনার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। কাছেই ডোভার লেনে ১৭ কাটার মতো আর একটি জমির সন্ধান পাওয়া গেল ৬৮ হাজার টাকায় কিন্তু অনেকে মনে করলেন জমিটি পরিমাণে কম তাই আশ্রমের উপযোগী হবে না। ১৯৫৫ সাল ধরে বেশ কতকগুলি জমি দেখা হচ্ছিল কিন্তু কোনওটাই তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। স্বাধীনতার পর চেতলা ও বেহালা অঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠছিল অভিজাত পল্লী নিউ আলিপুর। সেখানে শিয়ালদহ-বজবজ রেলপথের পুরনো কালীঘাট স্টেশনের কাছে 'ও' ব্লকে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির (বীমা ক্ষেত্র জাতীয়করণের পর ভারতীয় জীবনবীমা নিগম) মালিকানাধীন একটি জমির সন্ধান পাওয়া গেল। এই জমি পছন্দ হল সকলের। ১৯৫৬ সালে কেনা হল নতুন জমি, আশ্রমের একেবারে নিজস্ব। ১৩ মে-র সকালে ঊষাদেবী ও অনিলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিউ আলিপুরে মণ্ডল টেম্পল লেনে রাধাকান্ত জীউর মন্দিরে উপস্থিত হলেন মীরা দেবী। মন্দিরটি ১৭৯৬ সালের (মতান্তরে ১৮০৭) প্রতিষ্ঠা করেন বাওয়ালির জমিদার রামনাথ মণ্ডল। বাওয়ালি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য আরও মন্দিরগুলির মধ্যে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত রাসমঞ্চসহ এই নবরত্ন মন্দিরটি অন্যতম। বৈশাখের সেই সকালে রাধাকান্ত জীউর কাছে ভক্তিভরে পূজা দিলেন মীরা দেবী তার পর নতুন জমিতে এসে ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিলেন রাধাকান্ত জীউর চরণামৃত আর গঙ্গাজল। ৯ই জুলাই রথযাত্রার দিন। নতুন জমিতে একটি চতুষ্কোণাকৃতি ভিত খোঁড়া হয়েছে। সকাল ৯টা চল্লিশ নাগাদ্ শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্সারকে ডাকলেন পুরোহিত মশাই। কিছু মন্ত্র পড়িয়ে নামতে বললেন ভিতের মধ্যে। পাশে দাঁড়িয়ে হাতে কর্ণিক ও সিমেন্ট তুলে দিলেন মীরাদেবী। সে দিন তিনি (শ্রীমতী হাক্সার) বেশ অসস্থ তবু শারিরীক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য না করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করলেন সুভদ্রাদেবী। পরের বছর মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা অনুদান মঞ্জুরির খবর এল। এর জন্য চেষ্টা চলছিল আগে থেকেই। এর একটি অংশ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল শীঘ্রই। সরকারি অর্থানুকূল্যে আরম্ভ হল বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবন নির্মাণের কাজ। দশ হাজার টাকা অর্থসাহায্য করলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দ।

বাড়ির নকশা ও বিভিন্ন প্রকার অনুমোদন, নির্মাণে তদারকি, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে কাজ শুরু হল বাণীদেবীর নেতৃত্বে। বহু ক্ষেত্রে আসতে লাগল নানা বাধা বিঘ্ন, একই কাজের জন্য বহু বার তদ্বির ও ছোটাছুটি। বিশেষ করে সরকারি দপ্তরগুলির লাল ফিতের ফাঁস ছিল আজকের মতোই। দিনের পর দিন নানা বিভাগ ও ব্যক্তির কাছে দৌড়ঝাঁপ করে একটি একটি করে বাধাগুলি কাটিয়ে কাজ এগিয়ে চলল। এক দিন আশ্রমের বারান্দায় বসে হিসেব লিখছিলেন ঊষাদেবী। নির্মীয়মাণ নতুন বাড়ির কাজের চাপের কথা উঠল কথাপ্রসঙ্গে। বাণীদেবীকে বলে ফেললেন, 'বাড়ি হবে ঠিকই কিন্তু সবকটা মাথা খারাপ করে সেখানে গিয়ে উঠব!' সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে এল তীব্র ভর্ৎসনা— 'দেখ ঊষা, কাজ করলে শক্তি নষ্ট হয় না, কাজ করলে ক্ষমতা আরও বাড়ে। আর কখনও এ রকম কথা বল না। তোমাদের মুখে এ রকম কথা শুনলে পরবর্তী সকলের ধারণা এ রকমই হবে। মা যদি আজ তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেন না ইচ্ছে করেন, তোমাকে পঙ্গু করে কাজের অযোগ্য করে রেখে দেন, তুমি কী করতে পার? তোমার সাধ্য কি তখন তুমি এ সব কাজ করবে?'

১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাণী দেবী সহ কয়েকজনকে নিয়ে মীরাদেবী এলেন পাণিহাটি। কলকাতার আনুমানিক দশ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্ষদ নিত্যানন্দর লীলাস্থল পাণিহাটিতে জপ, ধ্যান ও নিয়মিত গঙ্গাস্থানে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করে এপ্রিল মাসে আবার ফিরে এলেন আশ্রমবাড়িতে।

এরই মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্প শ্রীসারদা আশ্রমের বিদ্যালয়টি আরম্ভ করার প্রচেষ্টা শুরু হল। কিন্তু নতুন জমিতে নির্মাণকাজ শেষ হতে তখনও অনেক দেরি— বাড়ি না হলে মেয়েরা ক্লাশ করবে কোথায়? এগিয়ে এলেন চন্দ্রশেখর নিয়োগী। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর বাড়ির একতলা তিনি বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন বিদ্যালয় শুরু করার জন্য। শ্রীযুক্ত নিয়োগী জীবনান্তে এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যান।

১লা জানুয়ারি ১৯৫৭, শুভ কল্পতরু দিবস। ওই দিন চন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়ির একতলায় বিদ্যালয় আরম্ভ করার পূজা দেওয়া হল। ক্লাশ শুরু হল ৭ই জানুয়ারি। সে দিন স্বামীজীর জন্মতিথি। নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের সে দিন কী উৎসাহ আর আনন্দ। মীরাদেবী রেবাকে ডেকে বললেন— 'দেখলি, ইস্কুলের নামে সকলের কী আনন্দ! ইস্কুল আমাদের দাঁড়াবার উপায়, বাঁচার পথ, ইষ্টলাভের উপায়। ইস্কুল না থাকলে আমাদের চলে না।' সকালে এগারোটায় স্তবের পর ক্লাশ আরম্ভ হল। ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে মীরাদেবী বললেন— 'স্কুল অর্থ কী জান? স্কুল মানে হচ্ছে বিদ্যার মন্দির। মন্দিরে যেমন ঠাকুরের পূজার কাজ নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্ত ও স্থির হয়ে করতে হয়, এখানেও তেমন শান্ত ও স্থির হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করতে হবে।' ছাত্রীদের সাইকে ক্লাশে যেতে বলে এ বার শিক্ষিকাদের ডাক দিলেন মীরাদেবী। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঊষা, অনিলা, রেবা ও রাণু। যে কথাগুলি তার পর উচ্চারিত হল বোধ করি শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশকারী পরবর্তীকালের সকল শিক্ষিকার উচিত নিজেদের মনে গেঁথে রাখা— 'মেয়েদের ভগবতীজ্ঞানে সেবা করে সেই

জগন্মাতারই সেবা করছ মনে করবে। খুব স্থির হয়ে খুব ঠান্ডা মেজাজে তাদের পড়াবে। আমার প্রথমে ভয় হচ্ছিল এত বড়ো একটা কাজে হাত দেব। আমাদের কী সাধ্য এ কাজ উদ্ধার করি যদি মায়ের ইচ্ছা না হয়। এ স্কুল করার ব্যাপারে বহু রকম পরীক্ষা করে দেখেছি এটি সম্পূর্ণ মায়ের ইচ্ছেয় হয়েছে।'

মীরাদেবীর একান্ত ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়ের নাম হোক তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক ভগিনী ক্রিশ্চিনের নামে কিন্তু কোনও কারণে আপত্তি করলেন বাণীদেবী। অনেক বিচার বিবেচনার পর স্থির হল নামকরণ হবে 'শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়'।

বিদ্যালয়ের মেয়েরা ঠিক মতো তাদের পড়াশুনো ও কাজ করছে কি না তা নিয়মিত খোঁজ নিতেন মীরাদেবী। পরিদর্শনে আসতেন ল্যান্সডাউন রোডের আশ্রমবাড়ি থেকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন শিক্ষিকাদের কর্তব্যপালনের উপর। সর্বদাই বলতেন যে সুধীরাদি আর সিস্টারের শিক্ষা যে কোনও মেয়ে কোনও পড়া না পারলে তার দায়িত্ব শিক্ষিকার, মেয়েদের নয়। কোনও মেয়ে কথা শোনে না বা বললে করে না— এ কথা বলাও ছিল মহা অপরাধ। সুধীরাদেবীর সঙ্গ করার ফলে তাঁর এই গুণাবলী নিজের জীবনেও টেনে নিয়েছিলেন মীরাদেবী।

অবশেষে ল্যান্সডাউন রোড থেকে বিদায় নেওয়া। পরের বছর (১৯৫৭) ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার, বিগত এগারো বছর ধরে বহু ঘটনার সাক্ষী ৮০/১/এ নম্বর বাড়ি থেকে যুগজননীর স্মৃতিচিহ্নগুলি সহ শেষবারের মতো বেরিয়ে এলেন মীরাদেবী, সঙ্গে অন্য সকলে। গন্তব্য নিউ আলিপুর, পরের ইতিহাস রচিত হবে সেখানেই। সাময়িক ঠাঁই হল চন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়িতে। একবার সকলে মিলে ঠিক করলেন সিনেমা দেখতে যাবেন। সদ্য মুক্তি পেয়েছে পরে বিখ্যাত হওয়া ছায়াছবি 'নীলাচলে মহাপ্রভু'। ভারতী চিত্রগৃহে আশ্রমের আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে দেখে এলেন মীরা দেবী। ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রীকে নিয়ে গেলেন চিড়িয়াখানায়। জীবজন্তু দেখে, ঘুরে বেড়িয়ে, সিঙাড়া, জিলিপি, ডালমুট ও কমলালেবু সহ জলযোগ করে সমস্ত দিন হৈচৈ করে কাটালেন সকলে।

১৯৫৮ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য তিথিতে 'ও' ব্লকে নতুন বিদ্যালয় ভবনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হল। এপ্রিল মাস থেকে নতুন ভবনে শুরু হল ছাত্রীদের ক্লাশ, পরের মাসে নতুন বাড়িতে উঠে এল আশ্রম। ১৫ই আগস্ট নতুন বাড়িতে প্রথম উদ্‌যাপিত হল স্বাধীনতা দিবস। গান, কুচকাওয়াজ, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এক সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করল ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত হলঘরে শ্রীশ্রীমায়ের বেদির কাছে বাণীদেবীর সঙ্গে একত্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মীরাদেবী। বললেন— 'আজকে আমি স্বাধীনতার পতাকা তুলিনি। আজকে মাকে সামনে বসিয়ে মায়ের ইচ্ছানুসারে সমগ্র নারীজাতির পতাকা তুলে দিয়ে এসেছি।'

১৯৫৯ সালে শ্রীশ্রীমায়ের তিন দিন ব্যাপী জন্মোৎসব পালন করার অঙ্গ হিসেবে ৮ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করলেন কলকাতার তৎকালীন মহানাগরিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। এই উপলক্ষ্যে পর দিন আহুত জনসভায় সভাপতিত্ব করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পার হয়ে গেল অতীতের সব ঊষা। পথ চলা শুরু হল মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তির মধ্যে। কিন্তু সে চলার অন্য কাহিনী।

> Purity, patience and perseverance are the three essentials to success, and above all, love.
>
> — Swami Vivekananda

স্মৃতির পাতা থেকে...

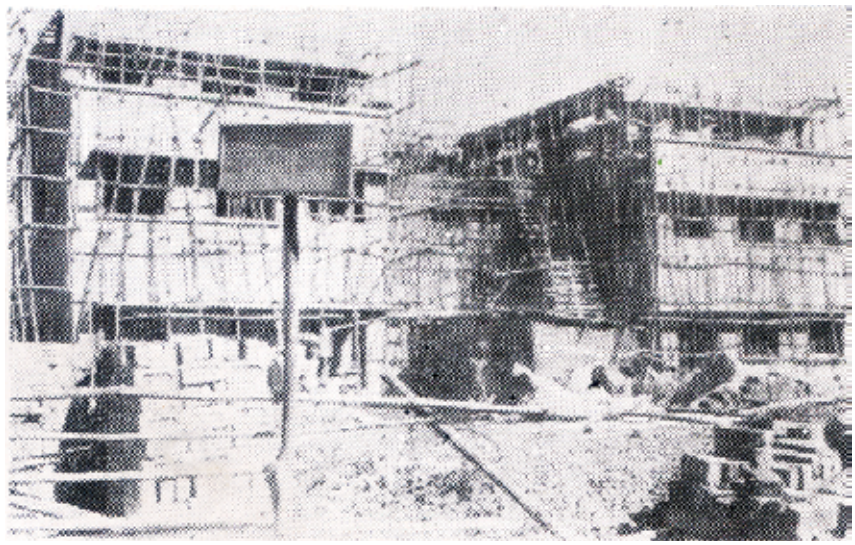

নির্মীয়মান বিদ্যালয় ভবন— ১৯৫৭

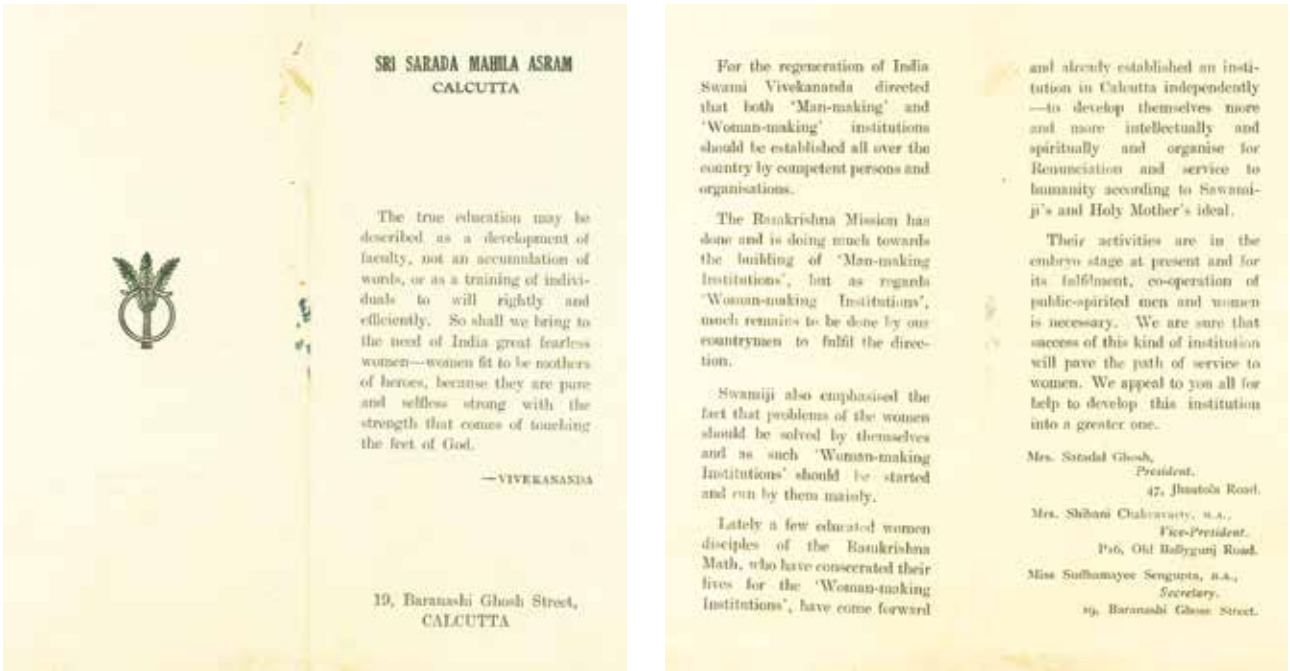

SRI SARADA MAHILA ASRAM
CALCUTTA

The true education may be described as a development of faculty, not an accumulation of words, or as a training of individuals to will rightly and efficiently. So shall we bring to the need of India great fearless women—women fit to be mothers of heroes, because they are pure and selfless strong with the strength that comes of touching the feet of God.

—VIVEKANANDA

19, Baranashi Ghosh Street,
CALCUTTA

For the regeneration of India Swami Vivekananda directed that both 'Man-making' and 'Woman-making' institutions should be established all over the country by competent persons and organisations.

The Ramkrishna Mission has done and is doing much towards the building of 'Man-making Institutions', but as regards 'Woman-making Institutions', much remains to be done by our countrymen to fulfil the direction.

Swamiji also emphasised the fact that problems of the women should be solved by themselves and as such 'Woman-making Institutions' should be started and run by them mainly.

Lately a few educated women disciples of the Ramkrishna Math, who have consecrated their lives for the 'Woman-making Institutions', have come forward and already established an institution in Calcutta independently —to develop themselves more and more intellectually and spiritually and organise for Renunciation and service to humanity according to Swamiji's and Holy Mother's ideal.

Their activities are in the embryo stage at present and for its fulfilment, co-operation of public-spirited men and women is necessary. We are sure that success of this kind of institution will pave the path of service to women. We appeal to you all for help to develop this institution into a greater one.

Mrs. Satadal Ghosh,
President.
47, Jhautola Road.

Mrs. Shibani Chakravarty, B.A.,
Vice-President.
P16, Old Ballygunj Road.

Miss Sudhamayee Sengupta, B.A.,
Secretary.
19, Baranashi Ghose Street.

শ্রীসারদা আশ্রমের সাহার্য্যার্থে প্রকাশিত প্রচারপুস্তিকা

১৬ নং বোসপাড়া লেন— ভিতরের দৃশ্য (২০১৩)

১৬ নং বোসপাড়া লেন— বাইরের দৃশ্য (২০১৩)

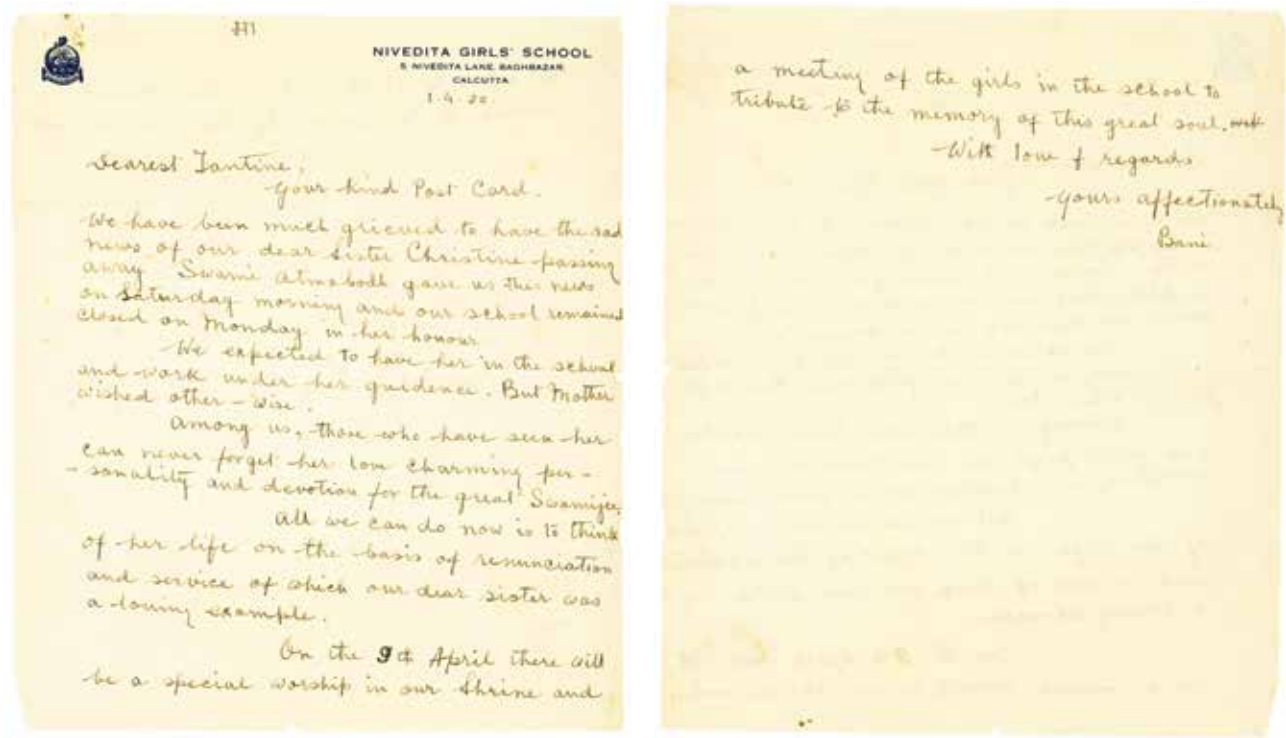

#1

NIVEDITA GIRLS' SCHOOL
5 NIVEDITA LANE, BAGHBAZAR
CALCUTTA

1.4.20.

Dearest Tantine,
Your kind Post Card.

We have been much grieved to have the sad news of our dear Sister Christine passing away. Swami Atmabodh gave us the news on Saturday morning and our school remained closed on Monday in her honour.

We expected to have her in the school and work under her guidance. But Mother wished other-wise.

Among us, those who have seen her can never forget her love charming per-sonality and devotion for the great Swamiji.

All we can do now is to think of her life on the basis of renunciation and service of which our dear sister was a loving example.

On the 9th April there will be a special worship in our shrine and

a meeting of the girls in the school to tribute to the memory of this great soul.

-With love & regards
-Yours affectionately
Bani

শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাক্‌লাউডকে লিখিত বাণীদেবীর পত্র

আশ্রমে রক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের টিপ সই

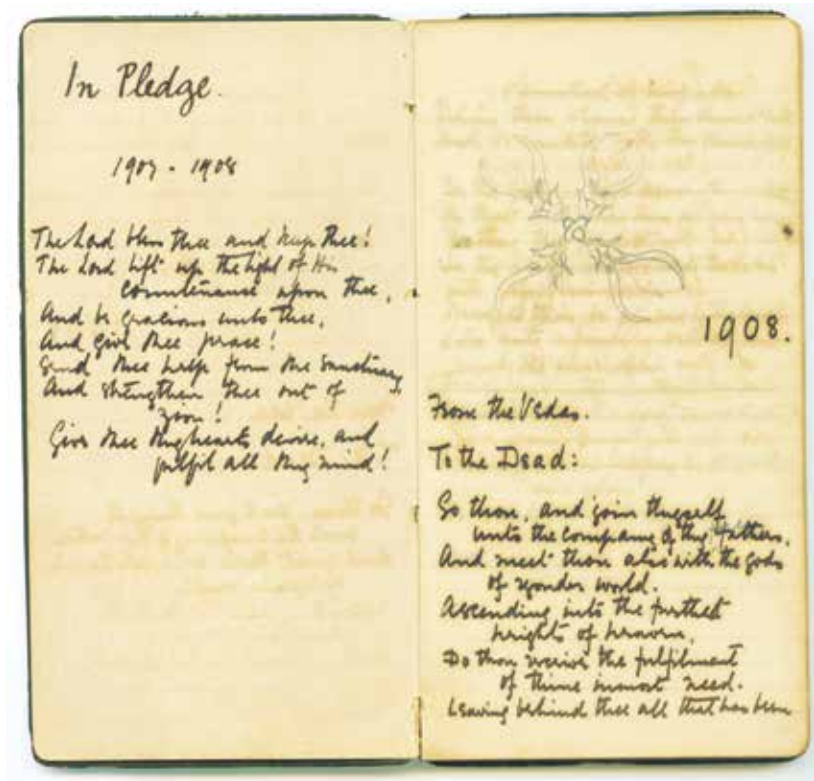

আশ্রমে রক্ষিত ভগিনী নিবেদিতার নোট বই

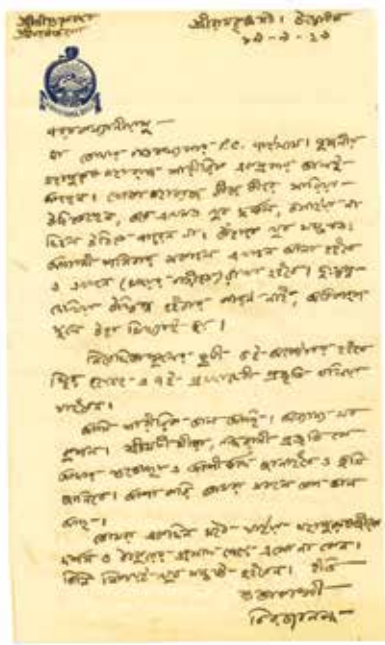

বাণীদেবীকে লিখিত স্বামী বিরজানন্দের পত্র

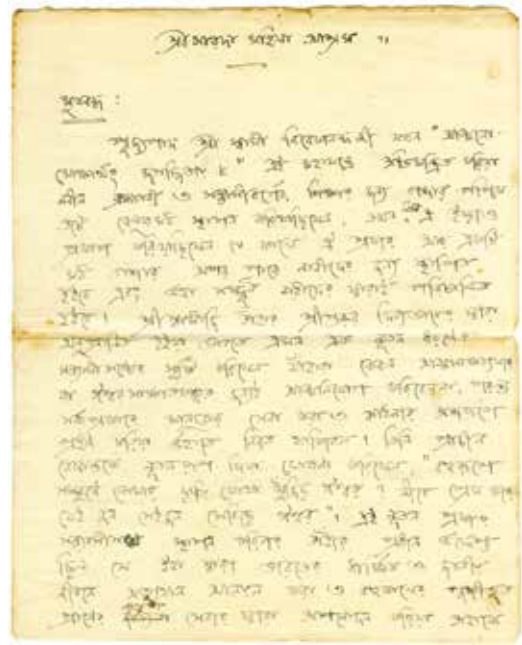

শ্রীসারদা আশ্রমের নিয়মাবলীর প্রথম খসড়া

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী ছাত্রী নিবাসের সাহার্য্যার্থে প্রকাশিত প্রচারপুস্তিকা

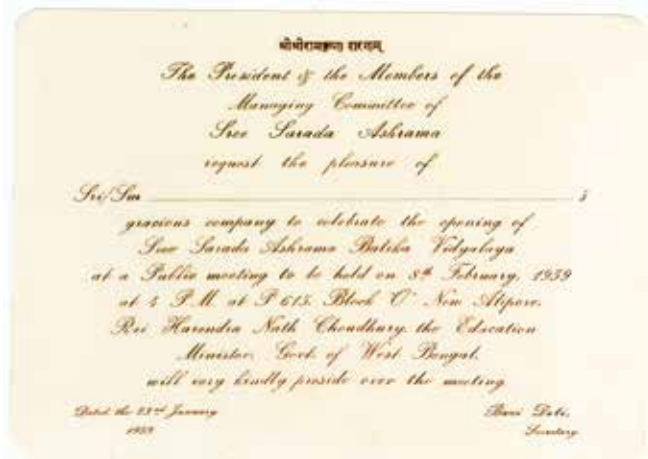

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

The President & the Members of the
Managing Committee of
Sree Sarada Ashrama
request the pleasure of

Sri/Sm _____

gracious company to celebrate the opening of
Sree Sarada Ashrama Balika Vidyalaya
at a Public meeting to be held on 8th February, 1959
at 4 P.M. at P 615, Block 'C' New Alipore.
Rai Harendra Nath Choudhury the Education
Minister, Govt. of West Bengal
will very kindly preside over the meeting

Dated the 23rd January
1959

Bani Deb
Secretary

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, নিউ আলিপুরে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে জনসভার নিমন্ত্রণ

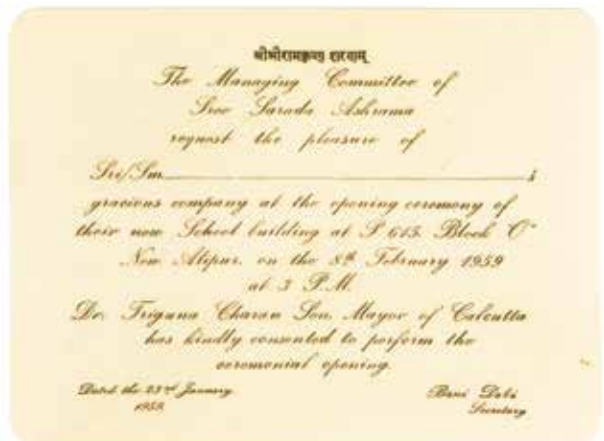

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

The Managing Committee of
Sree Sarada Ashrama
request the pleasure of

Sri/Sm _____

gracious company at the opening ceremony of
their new School building at P 615, Block 'C'
New Alipur, on the 8th February 1959
at 3 P.M.
Dr. Triguna Charan Sen, Mayor of Calcutta
has kindly consented to perform the
ceremonial opening.

Dated the 23rd January
1959

Bani Deb
Secretary

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, নিউ আলিপুরে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ

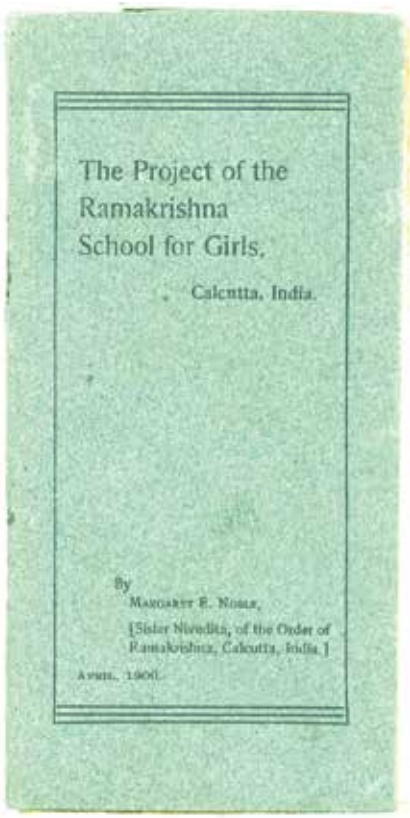

The Project of the
Ramakrishna
School for Girls,

Calcutta, India.

By
MARGARET E. NOBLE,
[Sister Nivedita, of the Order of
Ramakrishna, Calcutta, India.]

APRIL, 1900.

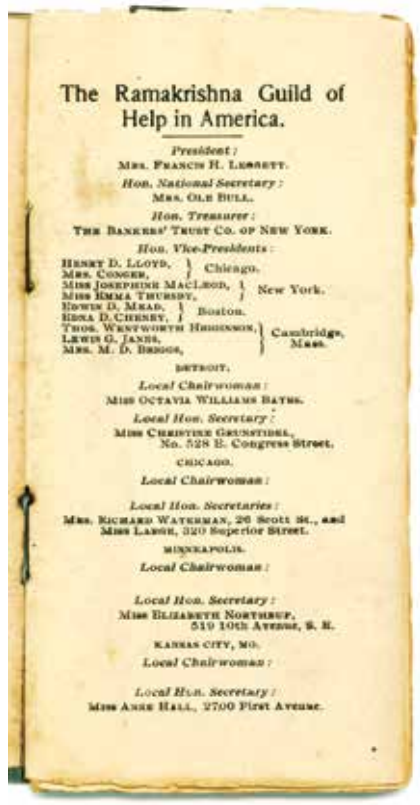

The Ramakrishna Guild of
Help in America.

President:
MRS. FRANCIS H. LEGGETT.

Hon. National Secretary:
MRS. OLE BULL.

Hon. Treasurer:
THE BANKERS' TRUST CO. OF NEW YORK.

Hon. Vice-Presidents:
HENRY D. LLOYD, MRS. CONGER, } Chicago.
MISS JOSEPHINE MACLEOD, MISS EMMA THURSBY, } New York.
EDWIN D. MEAD, EDNA D. CHENEY, } Boston.
THOS. WENTWORTH HIGGINSON, LEWIS G. JANES, MRS. M. D. BRIGGS, } Cambridge, Mass.

DETROIT.

Local Chairwoman:
MISS OCTAVIA WILLIAMS BATES.

Local Hon. Secretary:
MISS CHRISTINE GREENSTIDEL,
No. 528 E. Congress Street.

CHICAGO.

Local Chairwoman:

Local Hon. Secretaries:
MRS. RICHARD WATERMAN, 26 Scott St., and
MISS LARGE, 320 Superior Street.

MINNEAPOLIS.

Local Chairwoman:

Local Hon. Secretary:
MISS ELIZABETH NORTHRUP,
519 10th Avenue, S. E.

KANSAS CITY, MO.

Local Chairwoman:

Local Hon. Secretary:
MISS ANNE HALL, 2700 First Avenue.

শ্রীসারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম সভা, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৪

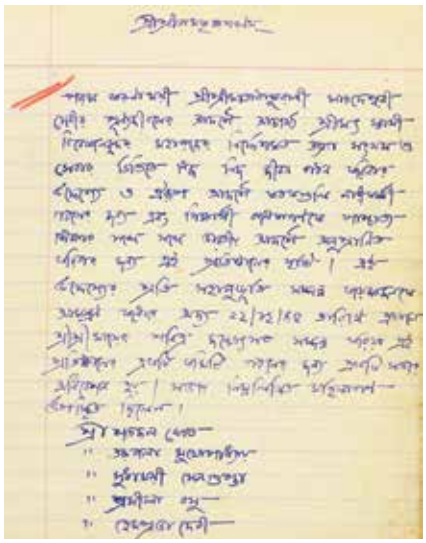

ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্যালয়ের সাহার্য্যার্থে প্রচারপুস্তিকা

তদানীন্তন মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন কর্তৃক বিদ্যালয় ভবনের দারোদ্ঘাটন। ১৯৫৯। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুনীতা বালা গুপ্তা ও তৎকালীন সম্পাদিকা বাণী দেবী

অতীতের শিক্ষিকাবৃন্দ— মাধ্যমিক বিভাগ

অতীতের শিক্ষিকাবৃন্দ— প্রাথমিক বিভাগ

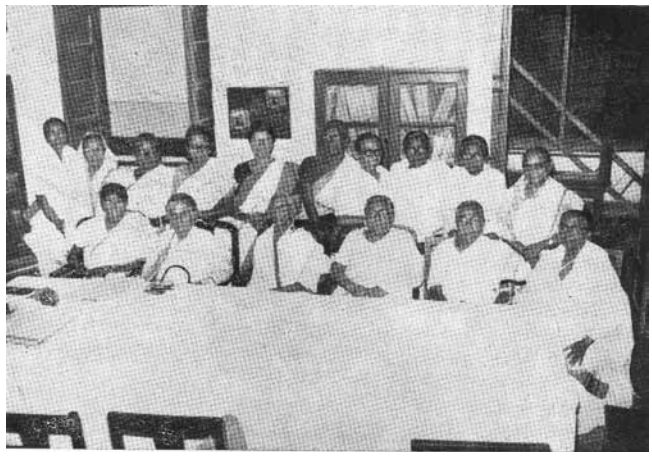

শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় কার্য্যকারী সমিতির সদস্যাবৃন্দ

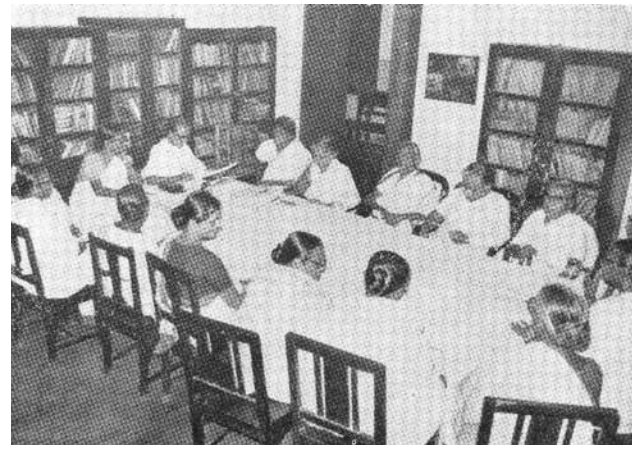

কর্মরত কার্যকারী সমিতি

বিদ্যালয়ের প্রথম মাসের ভর্তি হওয়া ছাত্রীবৃন্দ, জানুয়ারী— ১৯৫৭

৮০/১/এ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি— বর্তমান চেহারা

১৯ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি— বর্তমান চেহারা

নিউ আলিপুর মণ্ডল টেম্পল লেনে অবস্থিত
রাধাকান্ত জীউর মন্দির

দুইটি পত্র

[প্রধানা শিক্ষিকা রেবা দেবীর প্রতি—**সুনীতি বালা গুপ্তা** প্রাক্তন অধ্যক্ষা লেডিব্রেবোর্ণ কলেজ ও প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীসারদা আশ্রম কার্য্যকরী সমিতি]

আদর্শ শিক্ষাব্রতিনীষু　　　　ওঁ তৎসৎ　　　　পালামৌ
৪-২-৮০

স্নেহের রেবা,

বিশ্বভুবন জুড়িয়া মা আনন্দময়ী নিত্য বিদ্যমানা। তারই আহ্বানে পরম ভক্তি ভাজনীয়া স্বর্গীয়া মীরাদেবী ও তাঁহার সকলকর্মে অক্লান্ত কর্ম্মী, নিত্য সহকারিণী বানী দেবী ও অন্যান্য ভক্তগণ এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরটী গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মাতৃ পূজারিণী শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী, শ্রীমতী শোভাদেবী, শ্রীমতী উষাদেবী ও তোমরা সকলে বিদ্যালয়টীকে শণৈঃ শণৈঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিতেছ।

মা যাহাকে যে কাজ দেন, তার যোগ্য শক্তিও তাকে দেন। মার কাজই তাঁর পূজা। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা, সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ হইতে সুরু করিয়া যিনি বিদ্যালয় গৃহটীকে নিত্য সম্মার্জ্জনী হস্তে নির্মল করিতেছেন, যিনি পুষ্পোদ্যানে উদ্যানের পরিচর্য্যা করিতেছেন, যিনি ছাত্রী নিবাসে রন্ধন করিতেছেন, যিনি অসুস্থদের সেবা, শুশ্রূষা করিতেছেন, যিনি দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে বিদ্যামন্দিরদ্বার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সকলেই তাহারই পূজা করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের বালিকারা তো মা আনন্দময়ীরই এক একটী রূপ। তাহাদের শিক্ষাদান তো মা আনন্দময়ীরই পূজা। কে জানে, কাহার উপর মায়ের বিশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে? তাঁহার আহ্বানে তাঁহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পবিত্র ব্রহ্মচারিণী, শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা কুমারীর জীবন লাভ করিয়া আজীবন তাঁহারই পূজায় দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, উৎসর্গ করিবে?

সে দিন আমি এই মর-দেহে থাকিব না, কিন্তু থাকিবে আমার অমর আত্মা, থাকিবে আমার মাতৃ-পূজার চির আকুতি। এই বিশ্বজগতে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যেখানেই আনন্দময়ী মাতৃ-পূজারিণীগণ পার্থিব ও মানসিক এবং আত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়া মাতৃপূজা সম্পন্ন করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। অশেষ স্নেহশীষ লও।

ইতি
নিত্যশুভানুধ্যায়িনী
মাসীমা

ওঁ তৎসৎ

পালামৌ
২০-৯-৮০

আদর্শ মাতৃপূজারিণীষু,

অতি স্নেহের রেবা, পরম ভক্তিভাজন মীরাদেবীর নিজের হাতে গড়া ৺মায়ের একনিষ্ঠা পূজারিণী তুমি, তোমার ও তোমার সহকারিণী মাতৃপূজারিণীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৺মা সরদাদেবীর আশীর্ব্বাদপূত বিদ্যালয়টী পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কন্যা বিদ্যালয় রূপে একদিন পরিচিত হবে। বড়ই আনন্দ হ'লো বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সুফল জেনে।

যদি পারি রজত জয়ন্তী উপলেক্ষ্যে কয়েক পংক্তি লিখে পাঠাব।* কিন্তু সবই শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা ও দয়ার উপর নির্ভর করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ জানাই।

তুমি আমার অশেষ স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা ও শুভকামনা সর্ব্বদাই তোমাদের ঘিরে থাকবে।

ইতি
নিত্য শুভানুধ্যায়িণী
মাসীমা

---

* আজীবন কুমারী, স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, মাতৃগত প্রাণ এই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর গত ৯ই সেপ্টেম্বর মাতৃঅঙ্কে চির বিশ্রাম লাভ করায়, তাঁহার এই ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় নাই।

মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির

স্বামী সুপর্ণানন্দ

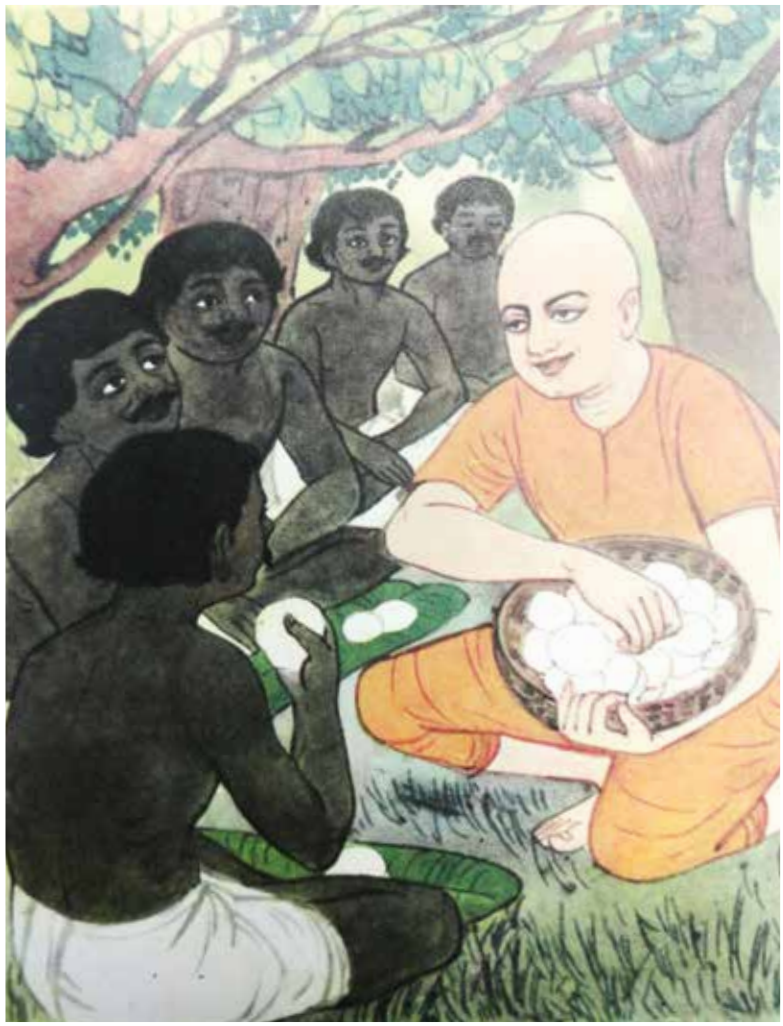

স্বামীজীর কথা— মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, মন্দিরের মধ্যে তাজমহল (বাণী ও রচনা-২য় খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা) ধর্মজীবন নিয়ে এমন Secular মন্তব্য বৈপ্লবিক।

দু'টি কথা পাই এখানে:

প্রথম কথা— মানুষ মন্দির শুধু নয়, মানুষই মন্দির। অন্য সব যে মন্দিরের কথা শুনি তা শ্রেষ্ঠ মন্দির নয়। সেখানে দেবতা নেই। দেবতা মানুষের মধ্যেই আছেন বলে মানুষই মন্দির হয়ে উঠেছে। আমরা ঈশ্বরকে শাস্ত্রানুসারে সর্বভূতে দেখবার কথা বলি। কিন্তু এখানে স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিলেন তা মানুষকেন্দ্রিক। ওই মন্দির চলমান, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এ মন্দির আমার, আপনার কাছে কাছে ঘুরছে। না। এ মন্দির আপনি, আমি নিজেও। আরও বড় কথা। মন্দির তো ঘুরছে না, মন্দিরের সঙ্গে দেবতা বা ঈশ্বরও ঘুরছেন। আমি, আপনি, সবাই ঈশ্বরকে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তিনি দূরে নন, আমাদের অন্তরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আমাদের— অন্তর্যামী তিনি। 'কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজছ? তাঁকে নিজের হৃদয়ে খোঁজ, জীবিত প্রাণীগণের মধ্যে খোঁজ। ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে তার ভিতরে দেখ (বাণী ও রচনা- ২য় খণ্ড)।' এই ভাব এলে সবচেয়ে কার্যকারী 'সাধনা' এসে পড়ে। প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখি,

যুক্তহস্তে প্রত্যেক মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারি। এই শ্রদ্ধা দৃঢ় হলেই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতর থেকে আমাদের কাছে আবির্ভূত হন। এরই নাম মুক্তি বা ভগবানলাভ।

হাজার যুক্তি দিয়েও ধর্ম এবং ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যাবে না। তা অনুভবযোগ্য। মানুষের মধ্যে যে অনন্ত দয়াশক্তির আবির্ভাব দেখি তিনিই তো ঈশ্বর। তিনিই মানুষের মধ্যে বিশেষ অধিকার নিয়ে গুরুপদবাচ্য। নবরূপ ধরে ঈশ্বর না এলে (যেমন— বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, যীশু, শ্রীরামকৃষ্ণ) ভগবানকে দেখবার আর কোনও উপায় আমাদের নেই। এঁদের মধ্যে আনন্দ, করুণা, প্রেম দেখি। ওঁরাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। পশুও হিংসা ভুলে প্রেমপ্রবণ হয় তাঁদের আবির্ভাবে। এবং স্বামীজী বলেছেন— একজন খ্রীষ্ট, একজন বুদ্ধ যদি দেবতা হতে পারেন তবে প্রত্যেকটি মানুষের দেবতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বড় আশার কথা। কোনও যুগে কোনও prophet এমন ভাগবত জীবনের পথ প্রদর্শন করতে সাহসী হননি। তাঁর যুক্তি অকাট্য। 'ঈশ্বর অনন্ত'— এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে তিনি এক প্রকাণ্ড জড়সত্তা। ঈশ্বর হিসেবে অনন্ত নন। তাঁর অনন্তত্ব চৈতন্যের অনন্তত্ব। এই চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হচ্ছেন, নিরাকার হচ্ছেন, আবার ক্রমশঃ বিকশিত হতে হতে পূর্ণমানব— খ্রীস্টমানব, বুদ্ধমানুব হচ্ছেন। স্বামীজী এ ভাবে, ঈশ্বরতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, অভ্রান্ত ভাবে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মানবের মধ্যে। প্রতিটি মানবই পূর্ণবিকশিত চৈতন্য হয়ে বুদ্ধমানবে পরিণত হবেন। আর এমন ঈশ্বরের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন তাঁকে সেবা করার, পূজা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়। জীবনের প্রতিটি অবস্থায়, কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করার 'হেতু' উপস্থিত হয়ে গেল। এই উপাসনাই প্রশস্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বামীজীর নির্দেশ।

দ্বিতীয় কথা— 'মন্দিরের মধ্যে তাজমহল' কথার অবতারণা আমাদের বুদ্ধিতে অনেক উজ্জ্বল করে দেয়। এখানে তাজমহলকেও মন্দির বলার স্পর্ধা আছে। মানুষের স্মৃতি নিয়ে ঐ অপূর্ব সৌধটি বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষ যদি দেবতা হয়, তবে মানুষের জন্য যা কিছু করা হবে তা দেবতার জন্যই করা হল। এটি মানুষই গড়েছেন আর একটি ভালবাসার পাত্রকে অমরত্ব দান করার জন্য। এ যাবৎ মানুষ দেবতার জন্য সৌধ গড়ে নাম দিয়েছে মন্দির। তাজমহল মানুষের জন্য তৈরি সৌধ। স্বামীজী তাকেও সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরের মর্যাদা দিলেন। অর্থাৎ মানুষকে secular এবং sacred এই দু'টি ভাবনা থেকে মুক্ত করে অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। একই বস্তু সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন নামে, রূপে। সুতরাং sacred এবং secular বিভাজন মনগড়া। ভ্রান্তিবশত।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রমে আসি বছর বছর ধরে এই ভাবটি শিখতে এবং কর্মে পরিণত করতে। এই ভাবে মন, বুদ্ধিকে রঞ্জিত করাই হল Man-making and Character Building Education. অন্য কোনও জটিল তত্ত্ব এতে নেই। এ জিনিস আমরা সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী Practice করতে যেন পিছপা না হই— শ্রীশ্রী ঠাকুর, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর কাছে এটাই প্রার্থনা।

> Those who give themselves up to the lord do more for the world than all the so-called workers.
>
> — Swami Vivekananda

‘বাণী ও রচনা’ থেকে গৃহীত

শিকাগো বক্তৃতা

ধর্মসভার প্রথম দিবসের অধিবেশন (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

কার্ডিন্যাল গিবন্সের উভয় পার্শ্বে ধর্মসম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নানাবর্ণের বেশ উজ্জ্বলতায় কার্ডিন্যাল সাহেবের বেশের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বোধ হইতেছিল। হিন্দু, বুদ্ধ ও মহম্মদ-মতাবলম্বীদের মধ্যে বাগ্মিপ্রবর ভারতবর্ষীয় বিবেকানন্দ স্বামী গৈরিকবর্ণের বেশ ধারণ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দর্শনীয় হইয়াছিল। তাঁহার শিরোভাগ বৃহদায়তনের পীতবর্ণ উষ্ণীষে মণ্ডিত হইয়া তদীয় মুখলাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।
অন্যান্য বাগ্মিগণের বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। তিনি সেই শ্রোতৃগণকে ‘‘আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনি কয়েক মিনিট ধরিয়া তুমুল করতালি দ্বারা সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিম্নোক্ত অভ্যর্থনা-সূচক বাক্যে কিছু বলিলেন:

অভ্যর্থনার উত্তর

হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তরদানের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি— ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কি বলিব— পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে

হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি-দূর-দেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব-প্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত-গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত সহ্য করি, তাহা নহে— সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশান' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যজা) শব্দটি কোনমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদিগকে বলিতে গর্ববোধ করিতেছি যে, যে বৎসর রোমানদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে আমরাই তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আজও তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। জরথ্রুষ্ট্রের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয়দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন এবং যাহা আমি বাল্যকাল হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি শ্লোকের অংশ আজ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি— ''রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।'' অর্থাৎ হে প্রভো, বিভিন্ন পথে গিয়াও যেরূপ সকল নদী একই সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদেরও তুমিই সেইরূপ একমাত্র গম্য স্থান।

এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমহাসম্মেলন গীতাপ্রচারিত সেই অদ্ভুত সত্যেরই পোষকতা করিতেছে, যাহা বলিতেছে— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।— অর্থাৎ যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জগতে ইহারা মহা উপদ্রব উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশায় নিমগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজ আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে তদপেক্ষা কতদূর উন্নত হইতে পারিত! কিন্তু আজ ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল, উহা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ নির্যাতনপরম্পরার এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান-বার্তা ঘোষণা করিবে।

(উদ্বোধনের সৌজন্যে)

স্মরণীয়া সুধীরা দেবী

চিত্রা বসু

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের নারী সমাজ শিক্ষিত হোক্। নারীরা নিজেদের স্বাধিকার অর্জন করুক। পাশ্চাত্য মুন্সিয়ানায় নয়, প্রাচ্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে। ভারতের কোনও নারী তখনও পর্যন্ত স্বামীজীর আদর্শে প্রস্তুত নয়, তাই বিদেশ থেকে মার্গারেট নোবেলকে আহ্বান করে আনতে হয়েছিল। তিনি কি করলেন? মার্গারেটকে ভারত দেবতার চরণে উৎসর্গ করলেন। মার্গারেট রূপান্তরিত হলেন নিবেদিতায়। স্বামীজীকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল 'নিবেদিতা' নামক নারীকে ভারতীয়ত্বে পরিণত করতে। ভারতের নানা শহর, গ্রাম, নদনদী দর্শন করে, ভারত দেবতা হিমালয়ের পবিত্র পরিবেশে এনে, ভারতীয় সনাতন ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতির বর্ণনা শুনিয়ে তাঁকে তৈরী করলেন ভারতীয় নারীদের শিক্ষা দেবার উপযুক্ত করে। এরপর নিবেদিতার কাজ শুরু হল, স্থাপিত হল বিদ্যালয়। শ্রীশ্রীমা আশীর্ব্বাদ করে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন, স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের পবিত্রতম উপস্থিতিতে। নিবেদিতারই উত্তরসূরী, পূজনীয়া সুধীরা দেবীর স্বল্প জীবনকথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সুধীরা দেবী নামটি নারী শিক্ষা এবং বর্তমানে নারীরা যে সর্ব্বত্যাগী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিবেদন প্রয়াসী তারও অন্যতম পথিকৃত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের পর এবং সিস্টার ক্রিশ্চিন বেশ কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় ফিরে যাবার পর নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির ভার কে নেবে এবং মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত কিভাবে অগ্রসর হবে এ প্রশ্ন উঠেছিল। শ্রীশ্রীমা সব প্রশ্নের সমাধান করে তাঁর অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন, আরও ব্রতধারিনী মেয়েরা আছেন যাঁরা ঠাকুর ও স্বামীজীর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শ্রীশ্রীমা সুধীরা দেবীর মধ্যে সেই মহৎকার্য সম্পাদনায় উপযুক্ত কর্মীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা সুধীরা দেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সুধীরাদেবী

অসুস্থ হলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেন। সুধীরা দেবী যে এই মহৎকার্যের জন্য নির্বাচিত ছিলেন সেটি তাঁর একদিনের স্বপ্নেদৃষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন থেকেই প্রমাণিত হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারে সুধীরা দেবীর জন্ম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবব্রত বসু তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য। খুব অল্প বয়সে পিতার প্রয়াণের পর ভাই-ই কনিষ্ঠা ভগিনীর দেখাশোনার ভার নেন। ভ্রাতার শিক্ষায় তিনি হ'য়ে ওঠেন সাহসী এবং তেজদৃপ্ত এক নারী। পনেরো বছর বয়সে মা মারা যাবার পর তিনি পদব্রজে পুরী যাত্রা করেন, সেই কালে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচায়ক। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর বড়ভাই দেবব্রত বসু তাঁর অন্তরের শুভইচ্ছাটি লক্ষ্য করে তাঁকে নিবেদিতা স্কুলে নিয়ে যান এবং সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্র খুঁজে পান। সালটি ছিল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আসেন এবং আমৃত্যু স্কুলটি পরিচালনা ও উন্নতিকল্পে সেবা করে যান। এর পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন। মনে হয় সেখানেই তাঁর স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পে স্থির থাকার মনোভাবটি শুরু হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর ভাই দেবব্রত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন ও তার নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। আমাদের প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধেয়া সারদাপ্রাণা মাতাজীর স্মৃতি পঞ্জীতে দেখেছি সুধীরাদির বোনঝি বানীদেবী অতীত স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন দেবব্রতর স্বদেশী কাজে বোন সুধীরা অন্তরালে থেকে সাহায্য করতেন। ইংরাজ পুলিশ আসবে দেবব্রতর বাড়ী অনুসন্ধান করতে, ভগিনী আপত্তিকর স্বদেশী কাগজপত্রগুলি আগুনে পোড়াতে লাগলেন, ছোট্ট বোনঝি বাণীও সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশের নারীদের ডাক দিয়েছিলেন যাঁদের আত্মোৎসর্গে ভারতের নারীজাতির কল্যাণ ও শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে। বিলাত থেকে মার্গারেট নোবেল, পরে নিবেদিতা, আমেরিকা থেকে সিস্টার ক্রিশ্চিন নিবেদিতার স্কুলটি পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। সুধীরা বসু এলেন নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনকে সাহায্য করতে। স্বামীজীর ঐকান্তিক ইচ্ছামত ভারতের নারী শিক্ষার রূপায়ণে ও প্রসারে সিস্টারদের কাছে শিখলেন শিক্ষাপ্রদানের বাস্তব দিকটি। তিনি সুনিপুন ভাবে সেই কাজটি করতে লাগলেন। তাঁর কাছে স্কুলটি ছিল সাধনার ক্ষেত্র এবং সচেষ্ট ছিলেন ছাত্রীদের শুধুই পুঁথিগত বিদ্যা নয়, তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি বিধানে। নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিন স্কুলটি ছাড়াও পুরস্ত্রী বিভাগও খুলেছিলেন, সেকানে সুধীরাদেবী মেয়েদের কাছে বাংলা সাহিত্যের এবং ভগবদ্গীতার পাঠ নিতেন। যে সমস্ত মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে ছিলেন তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করতেন যেমন সেলাই করে সেগুলি বিক্রির মাধ্যমে বা বাইরের ছাত্রীদের পড়িয়ে কিছু রোজগারের আশায়। অপরদিকে তিনি সিস্টারদের কাছে ইংরাজীর পাঠ নিতেন। সিস্টারদের নারীকল্যাণের কর্মসাধনায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। এইভাবে তিনি সিস্টারদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের পর সুধীরা দেবী বিদ্যালয়ের কাজে ক্রিশ্চিনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন এবং ১৯১২ সালে নিজের বাড়ী থেকে চলে আসেন স্থায়ীভাবে বিদ্যালয়ে বাস করার জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ক্রিশ্চিনকে তাঁর নিজ দেশ আমেরিকায় ফিরে যেতেহয়। তাই ১৯১২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ক্রিশ্চিনের অনুপস্থিতিতে সুধীরাদেবীকে সব দায়িত্ব নিতে হয় এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে একাই সব কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। তাঁর নির্দেশনায় স্কুল ভালোভাবে পরিচালিত হতে থাকে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। এমনকী যখন বারাণসীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম শুরু হয় তখন তিনি তাঁর দুজন ছাত্রীকে পাঠানা আর্তের সেবা করার জন্য। কুমিল্লায় মেয়েদের স্কুল তৈরীতে তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ ছিল, তিনি তাঁর কয়েকজন পুরানো ছাত্রীকে শিক্ষিকা হিসাবে পাঠান। এইসব সম্ভব হয়েছিল কারণ ছাত্রীদের তিনি ছিলেন স্নেহদাত্রী এবং ছাত্রীরাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন। স্বামী সারদানন্দের ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে বিদ্যালয় পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী চপলা, মীরা দেবী, বাণী দেবী ও নরেশনন্দিনী প্রমুখ। এই কয়জন সকলেই শিক্ষাকার্যে নিজেদের উৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করেছেন। এঁরা নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনের নিজের হাতে গড়া। এঁরাই সুধীরাদিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন নিবেদিতা বিদ্যালয় সুন্দররূপে গড়ে তোলার কাজে। ছাত্রীদের নিয়ে সুধীরাদি মাঝে মাঝে ভারতের নানা তীর্থভ্রমণে যেতেন। দুঃস্থ ছাত্রীদের তিনি অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করতেন এমনকি তাঁদের সেলাই ও লেখাপড়া শিখিয়ে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করে দেবার চেষ্টা করতেন। সুধীরাদির আরেকটি ঐতিহাসিক কীর্তি একটি যুবতী মেয়েকে আশ্রমিক জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেওয়া। মেয়েটির নাম সরলা, তাঁকে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইনিই আজকের সারদামঠের প্রথম অধ্যক্ষা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা মাতাজী। শ্রীশ্রীমায়ের তাঁর উপর ছিল অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পূজনীয়া ভারতীপ্রাণা শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় তাঁকে সেবা করার অধিকার পেয়েছিলেন।

১৯১০ সালে সুধীরাদেবী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। সুধীরাদেবীর বহুদিনের আকাঙ্খা ছিল মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম বিভাগ শুরু করার। অবশেষে ১৯১৪ সালে নিবেদিতা স্কুলেই শুরু হল 'মাতৃমন্দির'। স্বামীজী চেয়েছিলেন পুরুষদের মত মেয়েরাও যাঁরা গার্হস্থ জীবন থেকে সরে এসে আশ্রমিকা হবেন এবং দেশের নারীকল্যাণ কর্মে নিজেদের ব্যাপৃত রাখবেন। নারীকল্যাণ ও নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সুধীরা দেবীর এটি ঐতিহাসিক সাহসী পদক্ষেপ। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। সুধীরাদেবীর উদ্দীপনায় বহু দূর থেকে অনেক মেয়েরা এসে জড়ো হলেন এই মাতৃমন্দিরে আশ্রমিকা জীবনযাপন করার জন্য। নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরাও অনেকে এসে এখানে বাস করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমাও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন সুধীরাদির এই সাহসী পদক্ষেপে এবং উৎসাহও দিতেন। যখন অভিভাবকেরা মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখার পক্ষপাতী

ছিলেন বা বিবাহ দিতে পারছেন না বলে মায়ের কাছে আক্ষেপ করতেন। সেই যুগেও আধুনিক চিন্তাদর্শী মা বলতেন, 'সুধীরার কাছে নিবেদিতা স্কুলে দিয়ে দাও'। নিবেদিতা স্কুল সংলগ্ন আশ্রমটিকে শ্রীমার একমাস বাস আশীর্ব্বাদধন্য করে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজকের দক্ষিণ কলিকাতার নিউআলিপুরের শ্রীসারদাআশ্রমে তিনটি ছোট চিত্র আছে শ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সেগুলি মায়ের নিজের হাতে পূজা করা। মা যখন নিবেদিতা স্কুলের সংলগ্ন আশ্রমে বাস করেছিলেন তখন ঐ চিত্রগুলি মা পূজা করতেন। এইভাবে স্বামীজীর অভিপ্রেত স্ত্রীমঠের বীজটি রোপিত হ'ল। বিদ্যালয় সংলগ্ন এই আশ্রমটি কয়েকজন ত্যাগব্রতা নারী এবং কিছু ছাত্রীর আবাসস্থল হ'য়ে উঠলো। শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় সুধীরাদেবীর নির্দ্দেশে পূজনীয়া সরলাদেবীর সঙ্গে মাতৃআশ্রম থেকে গিয়ে মীরাদেবী ও বানী দেবীও মাকে সেবা করেছেন।

মাতৃমন্দির বা নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নেওয়া হতো। এই কঠিন অবস্থায় নিবেদিতার উইলের চিরস্থায়ী তহবিল, প্রয়াত দূর্গাদাস বাহাদুর প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তহবিল এবং ঋষি অরবিন্দের সহধর্মিনী প্রয়াতা মৃণালিনী বসুর পিতা ভূপাল চন্দ্র বসুর দেওয়া 'মৃণালিনী স্মৃতিরক্ষা ফান্ড' থেকে প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখার রসদ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা মৃণালিনীদেবী সুধীরাদেবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সুধীরা দেবী তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের এক সংকটঘন মুহূর্তে। তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অপার আশীর্ব্বাদ। শ্রীমা তাঁকে বৌমা ব'লে ডাকতেন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মৃণালিনী দেবী অতি অল্পবয়সে দেহরক্ষা করেন। প্রিয়সখীর মৃত্যুতে সুধীরাদেবী অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন। এর পরে বজ্রাঘাতের মতে এলো শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ। মায়ের দেহত্যাগে সুধীরা দেবী ভেঙ্গে পড়েন। তিনি তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেড়িয়ে পড়েন। হরিদ্বার, ঋষিকেশ, এলাহাবাদ, বারাণসী হয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের কারণে সুধীরাদি ট্রেনের কামরা থেকে পড়ে যান। তাঁকে বারাণসীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই তাঁর দেহান্ত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর সুধীরাদি মাতৃমন্দিরের নাম রাখলেন 'সারদামন্দির'। সুধীরাদেবীর অকাল প্রয়াণে বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বিপর্যয় দেখা গেল। কিন্তু সুধীরাদির স্নেহধন্যা কয়েকজন ছাত্রী এবং আশ্রমিকা বিদ্যালয় ও আশ্রমের ভার নিলেন। স্বামী সারদানন্দজীও তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের নূতন ভবন তৈরী হল এবং বিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলতে লাগলো। সুধীরাদির অনুগামী মীরাদেবী, বোনঝি বাণীদেবী ও চপলাদেবী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে লাগলেন। ১৯২৭ সালে স্বামী সারদানন্দের দেহান্ত হ'লে আবার সঙ্কট দেখা দিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থেকে পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। তাঁরা মীরাদেবীকে সারদামন্দিরের পরিচালিকা ও বাণীদেবীকে প্রধানা শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। মীরাদেবী ত্যাগব্রত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সুধীরাদেবীর আশ্রয় নিয়েছিলেন আর বাণীদেবী অতি অল্পবয়স থেকে সুধীরাদির তত্ত্বাবধানে জীবন গঠন করেছিলেন। মীরাদেবী ও বাণীদেবী উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তা। একে একে বিদ্যালয়ে এলেন ঊষাদেবী, অনিলা দেবী, শোভা দেবী। আরও অনেকে এসেছিলেন তবে এই প্রবন্ধে এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আজ দক্ষিণ কোলকাতায় সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় এঁদেরই অতি পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় তৈরী। ১৯৪৬ সালে এঁরা নিবেদিতা বিদ্যালয় থেকে সরে আসেন, তবে এঁদের জীবন উৎসর্গ করেন উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে। মীরাদেবী ও বাণীদেবীর একান্ত প্রচেষ্টায় দক্ষিণ কোলকাতায় মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। কত শত ভক্ত আর্ত নারীরা আজ এখানে এসে শ্রীশ্রীমাকে তাঁদের হৃদয়ের আর্তি ও প্রণাম জানিয়ে যায়। শ্রীসারদা আশ্রমের পূজনীয়া সারদাপ্রাণা মাতাজীর একটি স্মরণীয় উক্তি বারে বারে মনের মধ্যে চলে আসে— মীরাদি ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৭ সালে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বলেছিলেন, 'এ পতাকা শুধু ভারতে জাতীয় পতাকা নয়, আজ আমি এই সঙ্গে নারী স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলাম।' স্বামীজী ও তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার বাণীর প্রতিধ্বনি নয় কি! আজ সুধীরাদেবীর স্বল্পপরিসর জীবনকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশনের মাঝে তাঁরই গড়া ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসিনীদের স্মরণ করা প্রয়োজন কারণ আজকের নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার নেপথ্যে এই পূজনীয় নারীদের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য।

লেখাটি শেষ করার আগে সুধীরাদেবীর জীবনকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আজ নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার বীজটি রোপণের সঙ্গে সুধীরাদেবীর ত্যাগও স্মরণীয়। তাঁর শেষকৃত্যের দৃশ্যটিও ছিল অভিনব, যখন মণিকর্ণিকায় তাঁর দেহ— অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক সন্ন্যাসী নৃত্য সহকারে আনন্দে চিৎকার করে চলেছেন এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি। পরে আর ঐ সাধুটিকে কখনও দেখা যায়নি।

— (স্বামী সারদানন্দের চিঠিপত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়)।

This is the gist of all worship- to be pure and to do good to others.

— Swami Vivekananda

The Ideal for the Young

Swami Sunirmalananda

Everyone wants freedom, but the young crave for it the most. Any little intervention, a little strong word of advice, and the youth think that elders are dominating. Since their childhood, the youth yearn to be free from parental control- to play without limit, to jump and run about always. Children are angry when they are told what they should do and what they should not. Children dislike parents' interference in their little activities. And they grow up. In schools and colleges, children love to be free like the birds. They do not appreciate authoritarian control, being tied down to routine, pep talks, advice, observation etc. When they grow up, their desire for freedom is more pronounced. Not only do the youth want liberty in life, but they want liberty to change the world also. Later, in the workplace, they dislike bossism as it's called. Every intrusion is considered oppressive. In social life, they hate politicians who are not according to what the youth think they should be.

Suppose the young ones are given the 'freedom' and 'liberty' they want. What would they do? Would they

sit quietly in their rooms, study and pass exams? Perhaps not. They would rush out, eat, drink, dress, enjoy, and travel as they wish. This is the ambition of freedom-lovers. All this will go on for some days. And then? Within a short time they are in troubles. They youth's ideal of freedom and liberty is the freedom a hero is seen to have in some movie. The young wish to imitate him or her; that is their dream. But they are just imaginations. So the youth should be careful. The truth of this can especially be seen in the West, where the question of freedom is predominant. Parents lose control over their offspring very early in life. So one is astounded to see the number of young men and women overusing drinks, drugs etc, and entering asylums or consulting psychiatrists. The so-called freedom takes its effect very soon. This is about the young. The grown-ups who seek freedom are no better. Given the freedom they want. They can drown themselves, their families and the institutions they work for.

The simplest example of the love is in the day-to-day life of an individual in today's culture. All crave for the weekend. Come Saturday, and there is planning and preparation for the next day. However, it was Eric Fromm who suggested that everything we do is routine; even the Sunday visit to the park or the theatre, which is considered out-of-routine adventure, is routine. There's virtually nothing which is not routine. 'This Universe is only a little circle. What is there to desire in it?' asks Swamiji.

Thus, in the name of freedom and liberty, what the young do is nothing new. It's all the same- going where their eyes and ears lead them; doing what the mind drags them to do. The eyes and ears are the prominent sense organs, and the mind is called the sixth sense organ. Therefore that they call freedom is only slavery to sense organs. All the endless struggle for liberty is to be slaves! Further, what is done 'using the power of freedom' is only to attract attention of others or to gain something. So what is the end of this freedom 'struggle'? Fighting for liberty, gaining it and under its spell, imitating some hero, following the senses blindly, and entrenching their lives at the hands of someone or some temporary thing- this is the story of freedom. Struggle for freedom is struggle to be slaves.

Several movements have come and gone in the West- sweeping thousands of 'freedom'aspirants into their fold like gusts of wind sweeping up dry leaves, only to drop them down, broken or dead. The hippie movement in the 70s is an example. There are still people who are trying hard to wipe away the accumulated dust and dirt of the fall caused by this tempest. If we don't learn lessons from history, history repeats itself.

What do we learn from the past? We learn that seeking absolute freedom and liberty to do whatever we like is not correct- especially now, when ethical and moral ideals are changing the world over. When the plant is young, it should never protest the fence around it, and should not say that the cow or the goad is its dearest friend. We are living in a strange plant- this earth is a strange place for us. Here everything appears to go wrong finally-every river flows into the ocean. Everything ends in death. The best things die in the end. So we should be careful to save ourselves from disaster. We should not flow with the current but swim against it. It is not necessary to burn every hand on earth to learn that fire burns; one hand burnt is enough to teach everyone else. That's the reason why we should listen to what those who have lived here longer than us have to say.

So the young need training and some discipline in life. They need elderly guidance. At the individual level, they have the family. Mother is the best teacher. Since ages, she has remained unchanged- she never thought her child was a stranger to her ever though the world changed so much. Her love for the child has remained undiminished always and she wants the best for the offspring. If she says something, it's for one's good. Next comes the father, and then the teacher. May-be the present-day world and its struggles have changed some teachers, but generally they do not give wrong guidance. So children have to listen to elders while they are still growing. These elders not only guide through words but through actions also. Children hear through their eyes, as they say. To children, their parents and other family members are the ideals. The elders appear grand to them and they wish to become like them. And thus they grow.

It's when children are on the threshold of youth that various external forces try to capture their imagination. They open their eyes to see the world around, as it were. Today's world is not very vast- sitting in one's room one sees what's happening in some other corner of the globe. Thus they begin to seek newer ideals. This is where they begin to face problems too. The greatest 'teacher' now are the media; print and electronic. They deify stars from the movie, sport and other fields. Further, something else happens. Day after day, for hours at a stretch, the young are shown glitter, which is just litter, and are brainwashed to want them. They are brainwashed and conditioned to think that the best stars of the times

are stars because they use such things. So they too should use them. Thus an inseparable connection between the idols and the things they use is created in the young minds. Millions of youth are made to feel that if they don't follow such stars, they are nobodies. To follow them, the young should to what they do, wear what they wear. It's the opening chapter of the book on slavery. Blind following of stars begins in this way. And thus, individuality is lost. Freedom is lost.

It is in the nature of living beings to follow, to be led. With human beings, it is a predominant quality- we wish to be led by some one. Swami Vivekananda puts it rather strongly: 'Men who have brains to think for themselves are few, everywhere. These few men with brains are the real leaders in everything and in every department of work; the majority are guided by them as with a string, and that is good, for everything goes all right when they follow in the footsteps of these leaders. Those are only fools who think themselves too high to bend their heads to anyone, and they bring on their own ruin by acting on their own judgment.'2

So people seek idols and imitate them. This is not a new phenomenon and since ancient times human beings have followed someone powerful. People have always sought heroes. If there are none, they have created heroes. Amongst the heroes that the world has followed in the past were kings, priests and chieftains. Kings were not always essentially good. There were terrible and ruthless kings, but the world has followed them out of fear. There was no concept of democracy. If at all democracy was practised, it was practised in very rare periods of history, for a very short time.

Coming to recent times, the world had a lot of experience with dictators. One should see how Germans behaved under Hitler, how they followed him and brought misery to the world. So the worst types of political heroes are dictators, who force themselves to be idols of the masses. However, when their time is up, not only are they hanged, but the numerous images they put of themselves in different places are broken, and anything related to them is destroyed. The same frenzy that makes them also breaks them. Political leaders are somewhat better. Masses by promising goods, freedom, self-rule, prosperity and so on. Gradually, however, they too fade away. Then there are the sports and movie stars. There are instances in India where the movie star has been divinized- made a god and worshipped.

Next comes a higher level of leadership. There are exemplary men and women, whose qualities can definitely be emulated. The main point to note is if they are selfish or not; those who live for others are great ones. There are some political leaders, personalities in the fields of sport, movie, the arts and others, who have lived extraordinary lives of sacrifice and service to the nation. Then there are idols in social service, arts, literature. These leaders have a more lasting effect on the masses. They have their imperfections too, but we tend to overlook them. However, somehow nobody seems to satisfy us completely- no ideal seems to be to our liking from start to finish. 'A leader is born. Do not understand? And it is a very difficult task to take on the role of a leader. One must be a servant of servants, and must accommodate a thousand minds. There must not be a shade of jealousy or selfishness, then you are a leader, first, by birth, and secondly, unselfish- that's a leader.'3

Finally, we come to the world of the Spirit. Human beings are here in this world and to suffer, not to follow false ideals or not to live like other living beings. All scriptures tell us that we are here to know God, to know the Truth, to know who we are really. All our seeking is to know our true nature. While we seek freedom outside, we are actually seeking freedom within, unconsciously. We in fact want to be liberated from the bonds of karma. We want to be freed from ignorance. That is our real idea of seeking freedom. The rest is only a shadow. According to our great scriptures, we have to come here again and again, live the lives of miseries again and again, until we know who we are: we are not the body, the mind, or the intellect- we are the atman. Until we know that, we have to come repeatedly, they say. So real freedom is in seeking this truth. While the whole creation is said to be seeking this true freedom- freedom from existential suffering born of ignorance- some who know seek it consciously. Thus begins the spiritual life. Spiritual life does not mean only doing puja or visiting temples. Spiritual life means the journey inward-seeking the Light within, seeking freedom within.

When it comes to the spiritual world, we need to follow some masters. So we seek leaders at an altogether different level. There may be very rare instances of some who have attained this highest goal without any external help, but it is often dangerous and misleading to walk the path along. So we need idols or ideals here. Generally, the spiritual masters, gurus, take up the position of ideals. These are no ordinary ideals but personalities who have become embodiments of spirituality. We should note this difference carefully.

Having led extraordinary lives, having known the path to God and having tasted the sweetness of God, these spiritual masters are the most worthy ideals human beings can have. Their lives are pure. They are selfless. They are otherworldly. They only want the welfare of others sincerely. Such masters are really our ideals. By emulating them, we can evolve spiritually without doubt.

There are two questions before us now: Can we not live without idols or ideals? Of course we can. Depending on what we want in life, what our aim of life is, we can definitely discard all idols. We can walk the path all alone, but we should be ready to face numerous problems and pitfalls. If we have some higher ideals, we could have understood that on the way there are some areas which are difficult, and could have avoided them. If we accept ideals according to our goal, we avoid making many mistakes. The next questions is: Whom shall we choose as our ideal to follow? Undoubtedly, our goad should be the highest, our ideal should be the highest, and our aspirations should be the highest. A small man has a small ideal. There can be one or two immediate goals for living in this world- like getting a job, passing an exam, etc. but we should have the highest goal in life, and strive to attain it- this is what all spiritual teachers teach us. The highest goal is always spiritual. And our idol or ideal too will be in accordance with the goal, we must seek spiritual masters as our ideals.

Secondly, we ourselves are our ideals, say the scriptures. But, saints warn us that this stage will come only when our minds are pure. Until then, we have these external masters as our ideals, as the directors of the path. Almost every seeker of spirituality has a guru or spiritual master. The guru is worshipped as a manifestation of God Himself. Holding on to the instructions of the guru with faith and sincerity, the seeker climbs higher and higher in the spiritual ladder, and finally his or her own mind becomes the guru.

Further, apart from our venerable gurus, there are spiritual masters of the past, the sages and saints, who too belong to the last category we mentioned- selflessly trying to help us out of ignorance and suffering. Swami Vivekananda says: 'And we must also remember that the leaders of our societies have never been either generals or kings, but Rishis. And who are the Rishis? The Rishi as he is called in the Upanishads is not an ordinary man, but a Mantra-drashta. He is a man who sees religion, to whom religion is not merely book-learning, not argumentation, nor speculation, nor much talking, but actual realizaiton, a coming face to face with truths which transcend the senses. This is Rishihood, and the Rishihood does not belong to any age, or time, or even to sects or caste.'4 They have received inner light, they have known that there is the glorious universe beyond this one, and have left behind their lives and teachings as examples for us to follow. Along with individual gurus who critiate and bless seekers, there are vishva-gurus or jagad-gurus. We are not speaking of those who claim to be so, but those venerable saints, who come for the good of the world: Shankaracharya, Ramanuja, Madhava, etc. They are not just ordinary gurus, but are teachers of whoever seeks their help. They are jagad-gurus not in the sense of being 'teachers of the whole world'. But of 'anyone from anywhere in the world who seeks their guidance.' It is our bounden duty as spiritual seekers to venerate them. They brought us the knowledge of the Vedas and have saved religion in difficult times. Even amongst these teachers, this is gradation, if one may say so. As Sri Ramakrishna has explained several times, it is all a question of the manifestation of power: some less, some more. Of all the great seers and sages, Swami Vivekananda is the latest and the greatest spiritual luminary that the world has seen. He is the ideal for everyone- the young and the old, the scientist and the spiritual seeker. For our own benefit, we should study his life and works, and try to follow them.

Reference

1. Complete works of Swami Vivekananda, Vol 9, Advaita Ashrama, Kolkata, p. 316
2. ibid., Vol 5, p. 333
3. ibid., Vol 6, p. 284
4. ibid., Vol 3, p. 175

Three things are necessary to make every man great, every nation great:
1) Conviction of the powers of goodness
2) Absence of jealousy and suspicion
3) Helping all who are trying to be and do good.

— Swami Vivekananda

বিদ্যালয় পত্রিকা ‘আলিম্পন’-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

স্মৃতির খেয়ায়

আশাপূর্ণা দেবী

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের (নিউ আলিপুর) রজত জয়ন্তী উৎসব হচ্ছে শুনে, মনটা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে পিছিয়ে চলে গেল অনেক দূরে। মনে ভেসে উঠল স্মৃতির টুকরো টুকরো ছবি।

সেই ছবি বর্তমানের এই নিউ আলিপুরের আশ্রম গৃহের পরিবেশে নয়। এখানে বোধহয় তখন জমিও সংগ্রহ হয়নি এবং একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনাও ছিল কল্পনার মধ্যেই। ‘‘আশ্রম’’ ছিল ল্যান্সডাউন রোডের একটি মাঝারি বাড়ীতে।

আমি তখন সেই বাড়ীর অনতিদূরে খুব নিকটবর্তী একটি গৃহে বাস করি। একদিন সৌভাগ্য হল আরতি দেখার। মন আনন্দে ভরে গেল।

কিন্তু শুধুই কি দেবী আর দেবীর আরতি দর্শনেই অমন আনন্দে ভরা মন নিয়ে ফিরেছিলাম সেদিন! তার সঙ্গে যুক্ত ছিল নাকি জীবন্ত ‘দেবী’ দর্শনের সৌভাগ্যের আনন্দ?

দেখলাম আশ্রম অধিষ্ঠাত্রী মীরাদেবীকে। ‘‘পুণ্যময়ী এই দেবী মা সারদামণির সাক্ষাৎ শিষ্যা’’। এই কথাটি শোনামাত্র অদ্ভুত একটি রোমাঞ্চ এল মনের মধ্যে। মনে হল এর মধ্য দিয়েই বুঝি জননী সারদা দেবীর স্পর্শ পাওয়া যাবে। আমার সেই অনুভূতির কল্পনা বৃথা হয়নি। সেই মাতৃমূর্তি ‘মীরা মাসীমা’ রূপে আমাকে কী অনায়াসেই মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন।

অথচ—

আমি যে এই স্নেহের যোগ্য অধিকারী নই তা মর্মে মর্মেই অনুভব করেছি। আমার সেদিনের সংসার পরিবেশও ঠিক অনুকূল ছিল না। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হতো না। তবু স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হইনি কোনদিন। ‘কোন কর্মে লাগেনা’ এমন মেয়েটাকেও মাসীমা

মাতৃস্নেহে কাছে ডেকেছেন। আদর করেছেন।

সেখানে আরও দেখলাম বাণীদিকে। এখনও যাঁর নামের আগে পরলোকগতার চিহ্নটি বসাতে মন সায় দিতে পারছে না। দেখলাম কী দীপ্ত উজ্জ্বল রূপ! যেন বুদ্ধি আর কর্মশক্তির একটি আশ্চর্য 'সমন্বয়ের' মূর্তি। দেখলাম মৃদুভাষিণী ঊষাদিকে। নিউ আলিপুরের পরিবেশে যিনি এখন আশ্রম কর্ণধার। কিছুপরে দেখলাম শোভাদিকে— আরও কিছুপরে অনিলাদিকে।

আগের কথায় আসি। সেদিনের সেই আশ্রম-তরুটি ক্রমশঃ কিভাবে উপযুক্ত মাটিতে এসে শিকড় স্থাপন করে আজকের এই বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠেছে, তার ইতিহাস অবশ্যই নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। আমার কাছে স্মৃতির পর্দায় সাল তারিখের হিসেব বিহীন টুকরো টুকরো ছবিগুলির মধ্যে ধরা আছে তার ইতিহাস।

এই আশ্রম গৃহ নির্মাণের নানা ধাপ, ধাপে ধাপে তার নতুন রূপ, বিদ্যালয় গঠন, তার আদর্শ, তার সুচারু ব্যবস্থাপনা, বারে বারেই তার দর্শক হবার সৌভাগ্য হয়েছে। নিজের চেষ্টায় নয়, অযোগ্যের ভূমিকায়— শুধু স্নেহের ডাকে।

মনে পড়ছে— পরিকল্পনাকে রূপ দিতে কঠোর পরিশ্রম আর প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার দুরূহ ক্লেশে আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে কর্মময়ী দেবীদের।

এই প্রতিষ্ঠানেরে কী ভাগ্যের পরিহাস! তার গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে ভেঙ্গে পড়ছিল অসীম কর্মময়ী বাণীদির অটুট স্বাস্থ্য। ক্রমেই দেখেছি সেই বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটিতে ক্লান্তির ছাপ— তাঁকে নিতে হয়েছে রোগ শয্যার আশ্রয়। শেষ শয্যায় শুয়েও মধুর কথায় প্রশ্ন করেছেন আমার কুশল।

বাণীদির মৃত্যু একটা বজ্রসম আঘাত হানল। মাসীমা মীরাদেবীও শয্যা নিলেন। রোগ শয্যায় শুয়েও তিনি তাঁর তিন তলার ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে সামনে বসিয়ে প্রসাদ খাইয়েছেন, 'আরও খাও' অনুরোধ করে।

চলে গেলেন প্রতিষ্ঠাত্রী মীরাদেবী। এঁদের কাছে পেয়েছি অগাধ স্নেহ, ভালবাসা। অভিভূত হয়েছি।

আশ্রমের বয়স বাড়ছে, বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে কিন্তু একে একে বিদায় নিচ্ছেন সকলে। যেন আরব্ধ কাজ শেষ হওয়া মাত্রই নামিয়ে রাখছেন কর্মভার। সে ভার বহন করুক পরবর্তী জনেরা।

চলে গেলেন কর্মময়ী বাণীদি, পরম শ্রদ্ধেয়া মাসীমা, চলে গেলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে থাকা সেই শোভাদিও।

এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একে একে রথী মহারথী-সেনাপতিদের বিদায় গ্রহণ। জয়মাল্য অর্জন করেই বিদায় নিয়েছেন, তবু ভাবলে মন বড় বিষন্ন হয়ে যায়, চলে যাবার বয়েস কি হয়েছিল সবাইয়ের?

এই দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী— আমি তো পড়ে রয়েছি এখনো। স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে, মন ভেঙ্গেছে, আর এখন কারো ডাকে চট করে ধেয়ে উঠতে পারিনা, উৎসাহের বদলে আতঙ্কই আসে, তবু শ্রীসারদা আশ্রমের এই বিশেষ দিনটিতে হয়তো গিয়ে উপস্থিত হবো। আর নিঃশ্বাস ফেলে ভাবব, মন্দির পরিকল্পনা যাঁদের কল্পনার মধ্যে গড়ে উঠেছিল— মন্দির গড়ে ওঠার পর তাঁরা অনেকেই কেন থাকছেন না?

আজকের এই উৎসবদিনে আসবেন অনেক নূতন জন, অনেক নতুন জনের উৎসাহ-দীপ্ত মুখ দেখতে পাবো। হয়তো আমারই মত বার্ধক্যজীর্ণ কিছু পুরনো মুখেরও দেখা মিলবে তার সঙ্গে। এই মিলন ক্ষেত্রে প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হবে 'ছবি' হয়ে থাকা দেবীমূর্তিদের স্নিগ্ধ দৃষ্টি থেকে আর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হবে চিরআনন্দময়ী মা সারদাদেবীর। ...মা।

পুণ্য আদর্শমণ্ডিত এই আশ্রমবিদ্যালয় ও মাতৃপুজার মন্দির যেন কখনও তার আদর্শ থেকে তিলমাত্র চ্যুত না হয় এই প্রার্থনা।

> কোনও বিষয় সত্য কি অসত্য— জানতে হলে তার অব্যর্থ পরীক্ষা এই: তা তোমাকে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে কি না; যদি করে তবে তা বিষবৎ পরিহার করো, তাতে প্রাণ নেই, তা কখনও সত্য হতে পারে না। সত্য বলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতা-বিধায়ক, সত্যই জ্ঞানস্বরূপ।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

‘Completer works of Swami Vivekananda’ থেকে গৃহীত

The Divine Call

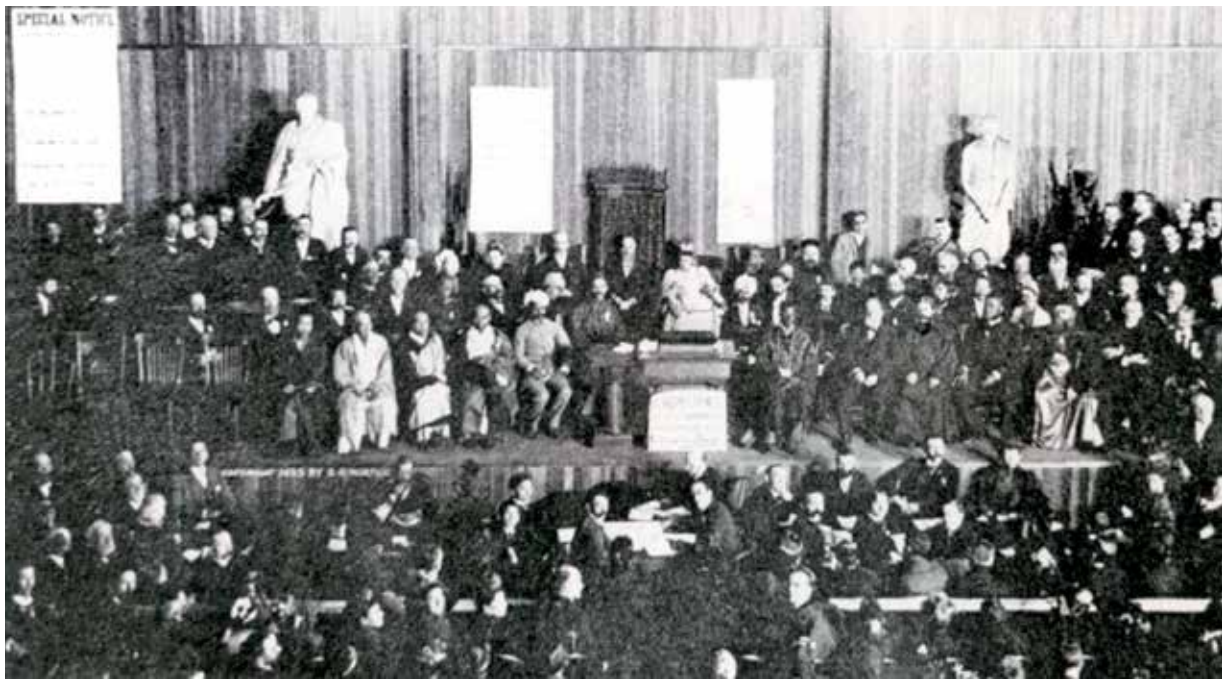

Chicago, 2 November 1993 – The Lord sent me friends. At a village near Boston I made the acquaintance of Dr. Wright, Professor of Greek in the Harvard University. He sympathised with me very much and urged upon me the necessity of going to the Parliament of Religions, which he thought would give me an introduction to the nation. As I was not acquainted with anybody, the Professor undertook to arrange everything for me, and eventually I came back to Chicago. Here I, together with the oriental and occidental delegates to the house of a gentleman.

On the morning of the opening of the Parliament, we all assembled in a building called the Art Palace, where one huge and other smaller temporary halls were created for the sitting of the Parliament. Men from all nations were there. From India were Mazoomdar of the Brahmo Samaj, and Nagarkar of Bombay, Mr. Gandhi representing the Jains, and Mr. Chakravarti representing Theosophy with Mrs. Annie Besant. Of these, Mazoomdar and I were, of course, old friends, and Chakravarti knew me by name. There was a grand procession, and we were all marshalled on to the platform. Imagine a hall below and a huge gallery above, packed with six or seven thousand men and women representing the best culture of the country, and on the platform learned men of all the nations of the earth. And I, who never spoke in public in my life, to address this august assemblage!! It was opened in great form with music and ceremony and speeches; then the delegates were introduced one by one, and they stepped up and spoke. Of course my heart was fluttering, and my tongue nearly dried up; I was so nervous and could not venture to speak in the morning. Mazoomdar made a nice speech, Chakravarti a nicer one, and they were much applauded. They were all prepared and came with ready-made speeches. I was a fool and had none, but bowed down to Devi Sarasvati and stepped up, and Dr. Barrows introduced me. I made a short speech. I addressed the assembly as “Sisters and

Brothers of America", a deafening applause of two minutes followed, and then I proceeded; and when it was finished, I sat down, almost exhausted with emotion. The next day all the papers announced that my speech was the hit of the day, and I became known to the whole of America. Truly has it been said by the great commentator Sridhara – "Mukam Karoti Vacalam – who maketh the dumb a fluent speaker." His name be praised! From that day I became a celebrity, and the day I read my paper of Hinduism, the hall was packed as it had never been before. I quote to you from one of the paper: "Ladies, ladies, ladies packing every place-filling every corner, they patiently waited and waited while the papers that separated them from Vivekananda were read". etc. you would be astonished if I sent over to you the newspaper cuttings, but you already know that I am a hater of celebrity. Suffice it to say, that whenever I went on the platform, a deafening applause would be raised for me. Nearly all the papers paid high tributes to me, and even the most bigoted had to admit that "This man with his handsome face and magnetic presence and wonderful oratory is the most prominent figure in the Parliament," etc, etc. Sufficient for you to know that never before did an Oriental make such an impression on American society.

And how to speak of their kindness? I have no more wants now, I am well off, and all the money that I require to visit Europe I shall get from here…

I am now out of want. Many of the handsomest houses in this city are open to me. All the time I am living as a guest of somebody or other…

Day by day I am feeling that the Lord is with me, and I am trying to follow His direction. His will be done… We will do great things for the world, and that for the sake of doing good and not for name and fame…

While I was in America I had certain wonderful powers developed in me. By looking into people's eyes I could fathom in a trice the contents of their minds. The workings of everybody's mind would be patent to me, like a fruit on the palm of one's hand. To some I used to give out these things, and of those to whom I communicated these, many would become my disciples; whereas those who came to mix with me with some ulterior motive would not, on coming across this power of mine, even venture into my presence any more.

When I began lecturing in Chicago and other cities, I had to deliver every week some twelve or fifteen or even more lectures at times. This excessive strain on the body and mind would exhaust me to a degree. I seemed to run short of subjects for lectures and was anxious where to find new topics for the morrow's lecture. New thoughts seemed altogether scarce. One day, after the lecture, I lay thinking of what means to adopt next. The thought induced a sort of slumber, and in the state I heard as if somebody standing by me was lecturing- many new ideas and new veins of thought, which I had scarcely heard or thought of in my life. On awaking I remembered them and reproduced them in my lecture. I can not enumerate how often this phenomenon took place. Many, many days did I hear such lectures while lying in bed. Some times the lecture would be delivered in such a loud voice that the inmates of adjacent rooms would hear the sound and ask me the next day, "With whom, Swamiji, were you talking so loudly last night?" I used to avoid the question somehow. Ah, it was a wonderful phenomenon.

USA 1895

Ingersoll once said to me: "I believe in making the most out of this world, in squeezing the orange dry, because this world is all we are sure of." I replied: "I know a better way to squeeze the orange of this world than you do, and I get more out of it. I know I cannot die, so I am not in a hurry; I know there is no fear, so I enjoy the squeezing. I have no duty, no bondage of wife and children and property; I can love all men and women. Everyone is God to me. Think of the joy of loving man as God! Squeeze our orange this way and get ten thousandfold more out of it. Get every single drop."

In the West, people often used to ask me, "How could you know the questions that were agitating our minds?" this knowledge does not happen to me so often, but with Sri Ramakrishna it was almost always there.

বিদ্যালয় পত্রিকা ‘আলিম্পন’-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

মানুষ চাই

স্বামী ঈশাত্মানন্দ

ছোট্ট পিঙ্কি আজ তার জীবনের প্রথম দিন স্কুলে যাবে। নামকরা স্কুল। অনেক কষ্টে, বহু খরচ করে তবে সুযোগ পাওয়া গেছে। সমস্ত বাড়িতে প্রায় উৎসবের আমেজ। পিঙ্কিও বেশ বুঝে গেছে আজ একটা বিশেষ দিন। স্কুলের পোশাক পরতে, জুতো মোজা পরতে, ব্যাগ কাঁধে নিতে কোন আপত্তি করেনি। মা বেশ খুশি। বাবাও আজ অনেক দিন পর সকাল সকাল ঘুম থেকে তৈরী হয়ে গাড়ী বের করছেন। সবই ঠিকই ছিল শুধু গোল বাঁধলো ভুলুকে নিয়ে। ভুলু পিঙ্কির পোষা কুকুর ছানা। ভুলুকে ছাড়া পিঙ্কি কোথাও যায়না। আজও তাই স্কুলে রওণা হবার মুখে ভুলুকে কোলে নিয়েই যেতে গেল আর তখনই গোলমাল শুরু হল। মা’র মুখ লাল, বাবার চোয়াল শক্ত, ঠাকুরদার হো-হো হাসি, ভুলুকে জড়িয়ে ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি বোঝার চেষ্টা করে— কি ভুল হল। পিঙ্কির সব সমস্যার সমাধান যিনি সবদিন করে দেন সেই ঠাকুমাকে ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতে দেখে পিঙ্কি ছুটে গেল আর ঠাকুমাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন সমস্যাটা এবং পিঙ্কির কোল থেকে ভুলুকে ধীরে ধীরে নাবিয়ে দিয়ে পিঙ্কিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন— তুমি এখন স্কুলে যাবে, পড়াশুনো করবে, বড় হবে— মানুষ হবে— ভুলুর ওসব দরকার নেই তাই ওকে স্কুল যেতে হবে না। পিঙ্কি ভুলু বিচ্ছেদের বেদনা মাথা চোখ দুটি তুলে শুধু জিজ্ঞাসা করলো— কেন?

ছোট্ট পিঙ্কি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা, আমাদের এক বিশাল প্রশ্নর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়—

মানুষ কে?

পশু পাখী যদি জন্মের পর থেকেই পশু পাখি হয়, তবে মানব সন্তানকে মানুষ হতে কেন আলাদা করে শিক্ষার প্রয়োজন? বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হলেই কি মানুষ, মানুষ হয়? সমাজের ধনী, প্রতিষ্ঠিত যারা তারাই কি শুধু মানুষ?

মানুষ কে? একজন দার্শনিক দিনের বেলায় লণ্ঠন হাতে করে বাজারে, রাস্তায় ঘুরতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন মানুষ খুঁজছি। স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত মানব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— মানুষ চাই। মনে রেখ মানুষ চাই। কোন মানুষদের খুঁজছেন এঁরা!

পশুর মধ্যে থাকে কেবল পশুত্ব, দেবতাদের মধ্যে থাকে কেবল দেবত্ব, কিন্তু আশ্চর্যভাবে মানুষের মধ্যে থাকে পশুত্ব, মানবত্ব ও দেবত্ব তিনটি ভাব। তাই মানব সন্তানকে শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পশুত্ব পরিহার করে মানবত্বে উন্নীত হতে হয়; এবং পরে মানব থেকে সে সাধনার মধ্যে দিয়ে দেবত্বে পৌঁছতে পারে। সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই পারে দেবতা হতে। তবে সে অনেক দূরের কথা। সত্যিকারে মানুষ হতেই বহু বহু বছরের উদ্দ্যম ও কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ছোট্ট মানব শিশু মাটিতে, কাদায়, নোংরার মধ্যে ঘুরছে। কুকুরছানার মুখ থেকে হয়তো বা খাবার নিয়ে মুখে পুরছে। কোন বোধ বিচার নেই। পশুশাবকের সঙ্গে ব্যবহারে কোন পার্থক্য নেই। তখন মা কিংবা বাড়ির বড়রা তাকে বোঝায় এটি করোনা, ওটি করোনা, এটি করতে নেই, ওইটি কর, ওটা করতে হবে ইত্যাদি। শুরু হয় শিক্ষা। পশুত্বকে জয় করার শিক্ষা। ধীরে ধীরে সেই অবোধ, অবুঝ পশুর মত বোধ বুদ্ধিহীন মানব সন্তান আত্মবিকাশ করতে থাকে। বেড়ে উঠতে থাকে, তবু প্রশ্ন থেকে যায় কেমন অবস্থায় পৌঁছলে সেই মানব সন্তানকে মানুষ বলা হবে? মানুষ কে?

মানুষের সংজ্ঞা:

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যিকারের মানুষ। সেই হল মানুষ যার মধ্যে দুটি গুণ পরিপূর্ণ ভাবে থাকে— শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। দুটি ছোট ছোট শব্দ কিন্তু এই দুটির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের ইমারত।

শাস্ত্রে বলেছে— আহার, নিদ্রা, ভয়, সংসার বাসনা পশু ও মানুষের মধ্যে সমান ভাবে থাকে। ধর্মই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে। 'ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা'— ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। ধর্ম শব্দের অর্থ হলো যা ধারণ করে থাকে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই হলো সেই ধর্ম যা মানুষকে মানুষ হিসাবে ধরে রাখে।

শ্রদ্ধা তিন প্রকার—

১। শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস— শাস্ত্র শ্রদ্ধা

২। গুরু বাক্যে বিশ্বাস— গুরু শ্রদ্ধা

৩। নিজের উপর বিশ্বাস— আত্ম শ্রদ্ধা

মহামতি শঙ্করাচার্য্য শ্রদ্ধার সংজ্ঞা নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন

''শাস্ত্রস্য গুরু-বাক্যস্য সত্য
বুদ্ধ্যবধারণম্ সা শ্রদ্ধা...।।''

শাস্ত্রে এবং গুরু বাক্যে সত্য বুদ্ধি করা বা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করাকেই বলে শ্রদ্ধা।

এখন প্রশ্ন হল শাস্ত্র কাকে বলে? আপ্ত বাক্যকেই বলে শাস্ত্র। আপ্ত অর্থাৎ যিনি অনুভব করেছেন, জেনেছেন, উপলব্ধি করেছেন তিনিই আপ্ত। তিনি যে কথাগুলি বলেন তাকেই শাস্ত্র বলে। আর গুরু হলেন তিনি যিনি নিজে যা জেনেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞান নিঃস্বার্থ ভাবে উত্তর-পুরুষদের কাছে পৌঁছে দেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়া অধ্যয়ন। অশ্রদ্ধার সঙ্গে পড়া সংবাদগ্রহণ। নিজের জ্ঞানের জ্যোতি থেকে জ্বালিয়ে দেন ছাত্রদের, শিষ্যদের জ্ঞানের-প্রদীপ। শ্রদ্ধা হীন মানুষ অত্যন্ত হীনস্তরের প্রাণী। শ্রদ্ধাহীন মানুষ সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে পারেনা। ভগবৎ গীতায় বলছে— 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' শ্রদ্ধাবান মানুষই কেবল জ্ঞানলাভ করতে পারে। যদিও আচার্য্য শঙ্করের এবং ভগবৎ গীতার কথাগুলি উন্নত ধর্মজীবন বা আধ্যাত্মিক জীবনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবুও জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যালয়ে আমরা যে বিষয়গুলি পড়ি কখনও কি ভাবি কত দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফসল সেগুলি! ভূগোল পড়ে আমরা একমুহূর্তে জেনে যাই কোন একটি মহাদেশের নদী-সমুদ্র-পরিবেশ-আবহাওয়া-ফসল ইত্যাদি সবকিছু। কিন্তু হয়তো মনেও আসেনা কত মানুষদের কত দিনের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল আমরা একটি বইয়ের পাতায় পেলাম। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র যে কোন বিষয় যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি তবে তা হবে অধ্যয়ন আর যদি অশ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি তা হবে সংবাদ গ্রহণ। অধ্যয়ন ও সংবাদ গ্রহণের মধ্যে আকাশ-পাতাল মানসিকতার পার্থক্য থাকে আর তাই শিক্ষার্থীর ব্যবহারেও অনেক পার্থক্য হয়। অধ্যয়নের মাধ্যমে আহৃত জ্ঞান আলোকিত করে বিদ্যার্থীর হৃদয় আর সেই আলোকে উদ্ভাসিত হয় মানবসমাজ। আর জ্ঞান যখন সংবাদ-সংগ্রহের মতো সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় তখন সেই বিদ্যা কেবল নিজের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ উপেক্ষিত হয়। এই রকম মানুষ যত বেশী হয় স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাশবিক ভাবগুলি তত বেশী প্রকাশিত হয় আর মানুষের দেহে পশুর মন বিশিষ্ট সমাজ মানুষের বাসযোগ্য থাকেনা। তাই সমাজকে মানুষের বাসযোগ্য রাখতে শাস্ত্র শ্রদ্ধা একান্ত প্রয়োজন।

যিনি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাচ্ছেন, পশুত্ব থেকে উন্নীত করছেন মানবত্বে সেই শিক্ষকের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে সেই শিক্ষার্থী কখনই মানুষ হয় না। তার বিদ্যা অপূর্ণ থেকে যায়।

ভারতবর্ষ বহুবছর আগেই এই সত্য লাভ করেছিল তাই মানব সভ্যতার উন্মেষের প্রথম প্রভাতেই শুনি আমাদের মননশীল পূর্বপুরুষেরা শেখাচ্ছেন মাতৃদেব ভব; পিতৃদেব ভব; আচার্য্যদেব ভব; ইত্যাদি মহামন্ত্র স্বরূপ বাক্য। মানুষের প্রথম আচার্য্য তার মা, বাবা তাই তাঁদের দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতে শেখানো হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের তাই এইসব অমূল্য বৈদিক শিক্ষাকে হেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করছি। কিছু স্বার্থপর কুটিল ক্ষমতালোভী মানুষ তথাকথিত আধুনিকতার নামে, রাজনীতির নামে বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন জ্ঞান, পশুত্ব থেকে মানবত্বে উন্নত হবার একমাত্র সোপান ''শ্রদ্ধা''কে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফল মারাত্মক— যাঁকে দেবীজ্ঞানে মাথায় করে রাখার কথা সেই প্রাণদায়িণী মাকে নেশাগ্রস্ত পুত্র হত্যা করছে। যিনি একদিন বুকে করে রক্ষা করেছিলেন সেই পিতা স্বয়ং নেশাগ্রস্ত পুত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে তাকে হত্যা করছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়— শ্রদ্ধা।

আচার্য্য শঙ্কর শিখিয়েছেন শাস্ত্র ও

গুরু বাক্যকে শ্রদ্ধা করতে আর বর্তমান যুগের যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ শেখাচ্ছেন— আত্মশ্রদ্ধা। সম্পূর্ণ নতুন, পরিপূর্ণ বৈপ্লবীক এক সাহসী ঘোষণা করছেন— প্রাচীন ধর্ম শেখাতো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা সে নাস্তিক আর আধুনিক ধর্ম (বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম) বলছে যে নিজেকে বিশ্বাস করেনা সেই নাস্তিক। নিজেকে বিশ্বাস বা আত্মশ্রদ্ধাই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনচেতা করে। আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ অন্যের উন্নতি দেখে হিংসা করেনা বরং নিজেও উন্নত হবার চেষ্টা করে। অন্যের সমালোচনা করে না কারণ নিজের অভিজ্ঞতায় সে জানে কাজ করতে গেলে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে অন্যকে দোষ দেওয়া আত্ম-শ্রদ্ধা হীনতার লক্ষণ।

অহঙ্কার ও আত্ম-শ্রদ্ধা কিন্তু এক জিনিস নয়। অহংকার মানুষকে দানবে পরিণত করে আর আত্ম-শ্রদ্ধা মানুষকে দেবতা বানিয়ে দেয়। অহংকারী বলে অন্যরা কেউ পারবে না কেবল আমিই পারবো। (I only can do)। আর আত্মশ্রদ্ধাবান বলেন, আমি ও পারবো (I too can do)।

আত্মশ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যদি নেতা হয় তবে সে সবসময় চেষ্টা করে তার থেকে হীন, সমস্ত ব্যাপারে তার থেকে নীচু মানুষদের তার সহকর্মী করে রাখতে। মূর্খ, অল্পবুদ্ধি মানুষদের মধ্যে বাস করে আত্মশ্রদ্ধাহীন নেতা নিজে হয়তো আনন্দবোধ করে কিন্তু দেশ, সমাজ, ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষকে তথা সমস্ত মানব সমাজকে বাঁচাবার জন্য তাই স্বামী বিবেকানন্দ নচিকেতা'র মতো আত্মবিশ্বাসী, আত্ম-শ্রদ্ধাবান হতে আহ্বান করেছেন।

যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী কোন বিষয়ে ভাল ফলকরতে না পারে তা হলে সাধারণতঃ তার সমাজ, তার পরিবার তাকে— তুই পারবি না, তোর দ্বারা কোন কিছু হবে না ইত্যাদি বলে তাকে আত্মশ্রদ্ধাহীন এক জড় বস্তুতে পরিণত করে দেয়। এটা একটা মস্ত ভুল। শুধু ভাল নয় অন্যায় ও পাপ। বরং তুমি এটা পারনা তো কি হয়েছে ওটা তো কত ভাল পার, বিজ্ঞান না পারতো কোন দোষ নেই, সাহিত্যে তুমি অনেকের থেকে ভাল।

আমি পড়াশুনা পারিনা কিন্তু ভাল রান্না করতে পারি, বা ভাল ফুলগাছ করতে পারি। কোন না কোন একটা জিনিস আমি পারি এবং অনেকের মধ্যে প্রথম হতে পারি— এই আত্ম-বিশ্বাসই আমার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনাময় শক্তিকে জাগরিত করবে এবং এটাই আত্মশ্রদ্ধা।

I only can do— Ego

I too can do— Self-Confidence

আত্ম-শ্রদ্ধার একটি সত্য ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। ১৯১৭ সালে একটি গরীব কিন্তু বুদ্ধিমান তরুণ (P.C.S) প্রভিনশ্‌ল সিভিল সার্ভিসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য যায়। দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত পোষাক না থাকায় বন্ধুর কাছে পোষাক চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করে। একটি মাত্র পদের জন্য মাত্র দুজন প্রার্থী। পরীক্ষা শেষে কর্তৃপক্ষ জানালেন, যদিও দুটি পরীক্ষার ফল ভালই, পদটির জন্য সবরকম যোগ্যতাও ছেলেটির আছে; তথাপি পদ যেহেতু একটি মাত্র, তাই অন্য প্রার্থীটিকেই পদটি দেওয়া হবে। এই বলে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, এক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব কি হবে তাঁরা জানতে আগ্রহী। আমরা জানি, অন্তত শতকরা নিরানব্বই জনই এক্ষেত্রে অত্যন্ত কাকুতিমিনতি করে, দারিদ্র্যের কথা বলে অনুরোধ করবে যাতে তাকেই কাজটি দেওয়া হয়। এই তরুণটি কিন্তু সেদিকেই গেলনা। সপ্রতিভ উত্তর ''যদি এই কাজ আমি না পাই, তাহলে বুঝব এর চেয়ে ভাল সুযোগ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এবং ভবিষ্যতে তা আমি পাবই।'' কর্তৃপক্ষ এই উত্তরে এতই খুশি হলেন যে, তাঁরা অন্য একটি পদ সৃষ্টি করে তাঁকে নিয়োগ করলেন। সেদিনের সেই তরুণ প্রসিদ্ধ গান্ধীবাদী নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই।

মানব সন্তানের মানুষ হয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ হলো শ্রদ্ধা আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো কৃতজ্ঞতা। মিলেনিয়ামের প্রথম সূর্য্যের আলো যেখানে এসে পড়েছিল আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কাঁচাল নামের সেই দ্বীপটির সামনে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ''এম-ভি-স্বরাজ'' নামের বিশাল জাহাজটির ডেকে দাঁড়িয়ে শতাব্দীর প্রথম সূর্য্য উদয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যে কোন হিন্দুর মতো আমিও সেদিন উদিত সূর্য্যকে প্রণাম করেছিলাম, মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা করেছিলাম। আমার পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে দ্বীপপুঞ্জের লেঃ গভর্নরের স্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ নেভি অফিসার ও তাদের স্ত্রীরাও নিজের নিজের মতো করে সূর্য্য পূজা করছিলেন। এরপর আমি যখন জাহাজের ডেকের উপর একলা বসেছিলাম তখন একটি বিখ্যাত সংবাদসংস্থা সি এন এন-এর প্রতিনিধি এসে আমাকে দু-তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল— শতাব্দীর প্রথম সূর্য্য উদয় একটি ঘটনা যা আজকের আমরা হয়তো আর এ জীবনে দেখতে পারবো না। সেটিই এর বৈশিষ্ট্য। তাই সবাই এসেছেন কিন্তু সূর্য্য একটি নক্ষত্র মাত্র তাকে আপনি কেন পূজা করলেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম— হিন্দুরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ জাতি। তারা কৃতজ্ঞতাটাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হিসাবে মনে করে। হিন্দুরা জানে যে সূর্য্য একটি নক্ষত্র মাত্র কিন্তু তবুও এই সূর্য্যের জন্যই সমস্ত প্রাণী তথা পৃথিবীর জীবন রক্ষা হচ্ছে। সূর্য্য যদি না থাকে তবে এই পৃথিবীতে প্রাণের কোন চিহ্ন থাকবেনা। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটা হিন্দুরা জানে এবং সেই জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সূর্য্যকে তারা ভগবানের মত সম্মান প্রদান করেন।

কৃতজ্ঞতাহীন মানুষ, মানুষ পদবাচ্য নয়। অনেক বিদেশীরা বুঝতে পারেনা, অনেক তথাকথিত শিক্ষিকা স্বদেশীরাও হিন্দুদের গাছপালা-নদী-পশু-পাখী পূজাকে অজ্ঞতা, মূর্খতা বলে হেয় জ্ঞান করে। কিন্তু কৃতজ্ঞ হিন্দু জানে যে কীট, পতঙ্গ, গাছপালা, পশু, পাখি, নদ-নদী এই প্রকৃতির সব কিছু জীবন ধারণের সহায়ক, তাই হিন্দুরা নদী পূজা করে, গাছপালা পূজা করে, পশু পাখিকে পূজা করে, এ তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অতি সুন্দর ধারা।

মানুষ তখনই মানুষ— যখন তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে। যে ভূ-খণ্ড আমরা জন্মগ্রহণ করি, বাস করি, বড় হই, সেই মাতৃভূমিকে গভীর শ্রদ্ধা করতে শেখানো হচ্ছে। জন্মদাত্রী মা এবং জীবন রক্ষাকারী মাতৃভূমিকে হিন্দুরা চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শেখাচ্ছেন ''জননী জন্মভূমিশ্চ, স্বর্গাদপি গরীয়সী।''

জন্মভূমিকে ভালবাসা, জন্মভূমির কোন প্রকার ক্ষতি হতে না দেওয়া কোন ক্ষুদ্র মানসিকতার পরিচয় নয়। এ মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ, কৃতজ্ঞতা।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন অতি সাধারণ সন্ন্যাসী। তাঁর এক গুরুভাই এর সঙ্গে হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে আলমোড়ার কাছে একটি পাহাড়ের উপরে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যান। ঠিক সেই সময়ে গরীব স-হৃদয় মুসলমান ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হন এবং একটি শশা খাইয়ে স্বামীজীর প্রাণ রক্ষা করেন। এর পরদিনই চলে যান। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ নির্দেশে ও ভগবতী মা সারদাদেবীর আশীর্বাদে বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একদিন ওই আলমোড়া শহরে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকাননেদ্র সম্বর্ধনার বিশাল আয়োজন হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয়ে সভা মঞ্চে বসেছিলেন বিবেকানন্দ। সামনে উপস্থিত অসংখ্য শ্রোতার মধ্যে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো সেই দরিদ্র, মুসলমান ব্যক্তিটির দিকে যে একদিন তাকে শশা খাইয়েছিলেন। সকলকে চমকিত করে বিবেকানন্দ মঞ্চ থেকে নেমে এসে সেই অতি সাধারণ মানুষটির হাত ধরে তাকে মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে সেই জনসভায় তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণদাতা হিসাবে।

যত সামান্যই হোক, যত ক্ষুদ্রই হোক কারও থেকে কোন প্রকার সহায়তা পেলে তাকে ভুলে যেতে নেই। অকৃতজ্ঞতা মানুষকে ক্ষুদ্র করে দেয়। অকৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের অবমাননা।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাচ্ছেন, বলছেন জগৎজননীর কাছে প্রার্থনা কর— ''মা আমাকে মানুষ কর।'' মনুষ্যসমাজকে আহ্বান করে বলছেন ''এস মানুষ হও।''

শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষই, মানুষ।

> আমি চাই— এই শ্রদ্ধা। আমাদের সবারই প্রয়োজন এই আত্মবিশ্বাস। ...আমাদের জাতীয়-শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করছে— সব বিষয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যা-কিছু সব আসবেই আসবে।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যালয় পত্রিকা ‘আলিম্পন’-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

শিক্ষার্থীর গৃহ ও বিদ্যালয়

গৌরিরাণী সোম

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে যে বৃত্তের অবস্থান সে বৃত্তের পরিধিতে জ্ঞানসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই আছি— মা-বাবা, গৃহ-পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষালয়, পরিচিত-অপরিচিত যারা তার সংস্পর্শে মুহূর্তের জন্যেও হয়ত এসে গেছেন। অষ্টপ্রহরের বেশী সময় ঐ বৃত্তে যাদের অবস্থান তাদের প্রভাব যেমন শিশুচিত্ত গড়ে ওঠার অংশ-ভাক্— শিশু জীবনের ক্ষণিক অতিথির প্রভাবও এ জীবনে কখনও কখনও বিল্লবাত্মক হয়ে উঠতে পারে। শিশুচিত্তের এই যে সজীবতা, ভিন্ন পরিবেশে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্ন ভাবে সাড়া দেওয়ার এই যে প্রবণতা— কমবেশী প্রায় সব শিশুর মধ্যেই এটির প্রকাশ দেখা যায়। কখনও কখনও ত অপেক্ষাকৃত কমসময়ের জন্য আগত এই অপরিচিত গ্রহের আবির্ভাব রীতিমত মারাত্মক বা শূভাত্মকও হয়ে যায়। এক গ্রহের কক্ষপথের পাশে অন্যগ্রহ ছুটে গেলে যেমন প্রথম গ্রহ তার আকর্ষণের প্রভাবে কিছু প্রভাবিত হয়ই, মহাশূন্যে আবর্তমান গ্রহের প্রভাব ত সময়ে সময়ে অসামান্যও হতে পারে। প্রস্তরীভূতা অহল্যার জীবনে যে ক্ষণিক অতিথির স্পর্শ তাকে সঞ্জীবিত করেছিলো— সে ঘটনা ত মহাকবি

নিজেই স্বীকার করে গেছেন। শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থের জীবনে জরা ইত্যাদির আবির্ভাব যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল— সে ত অকল্পনীয়। সে যাই হক, এই আকস্মিক গ্রহের আবির্ভাবের ওপর আমাদের ত বিশেষ কোনও হাত নেই, আর সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের কথা, সেরকম ঘটনা কদাচিৎই ঘটে, তাই ত বিষয়ে চিন্তার আগে, আমরা যারা শিক্ষার্থীকে প্রায় অষ্টপ্রহরই ঘিরে থাকি— ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দৈহিক এবং মানসিক সংস্কার গড়ে তুলতে আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কিছু চিন্তা করা যাক। আর আগন্তুককে বিপজ্জনক দুর্গ্রহ মনে হলে, তার থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখার দায়িত্বও ত আমাদের।

অপরকে সাহায্য করার অভ্যাস, সাহায্য করার প্রবণতা, পরের জন্য খানিকটা স্বার্থত্যাগ, যুক্তি-গ্রহণ ক্ষমতা এই সব অভ্যাস ত ছোট থেকেই সুরু হলে— বড় হলে সুসংস্কারে পরিণত হয়। এইখানেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকের যোগের আরম্ভ।

কিন্তু এটাও পুরো ঠিক কথা বলা হ'ল না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপনয়নেই সুরু হয় না (যেমনটি আমরা ভেবে থাকি)— এর সুরু ত জাতকের জন্মের পর থেকেই যখন থেকে বাইরের প্রতিটি ঘঠনায় তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। বিরূপ পরিবেশে— তার বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া, এবং বিরুদ্ধ মনোভাব হওয়াই স্বাভাবিক। এই আক্রোশ-ভাবাপন্ন অসুখী মনোভাব আর তার সঙ্গে অনুরূপ শারীরিক সংস্কারও তখনই তৈরী হয়। ঐ জাতক স্কুলে এসে ঝগড়াটে, মারকুটে, অবাধ্য হয় আরও কতো রকম যে বিরূপ অবস্থা এবং সমস্যা সৃষ্টি করে— সে ত অভিজ্ঞ লোকের অজানা নয়। আমরা অর্থাৎ অভিভাবকেরা এবং শিক্ষকেরাও অজ্ঞ বিশ্বাসে শিশুদের ওপর শাসনের নামে যে অত্যাচার করি— তার ফল ঐ মানবকের জীবন যে কতোদূর পর্যন্ত প্রভাবিত করে— এ বিষয়ে আমাদের ধারণা না থাকায় আমরা এ রকম করে থাকি। দ্বিতীয় রিপুটির সংযমের শিক্ষা ত আমাদের সব সময় থাকে না। বাড়ীতে শিশুরা অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে সব সমইে কি আমরা শিশুর প্রতি সুবিচার করে থাকি?

শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসার আগে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অনেকটা ত বাড়ীর ভেতর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের পরিবেশে তাঁদের প্রভাবেই গড়ে ওঠে। শিক্ষালয়ে সদ্যপরিচিত নতুন পরিবেশে তার প্রতিক্রিয়া ত অনেকটা আগের জীবনে গড়ে ওঠা সংস্কারের বা স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও শিশু লাজুক হয়, অপরিচিত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করে, অচেনা অপর শিশুর সঙ্গে মিশতে পারে না, মানসিক-গ্লানি বেধ করে কষ্ট পায়, বিদ্যালয়-জীবন তার সুখের হয় না। এই রকম অসুখী শিশুতে নানা রকমের অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই কিন্তু এই নতুন পরিবেশে বেশ আনন্দেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে একদিন এই বিদ্যালয়-সমাজেরই একজন হয়ে ওঠে। এই যে মানবশিশুর সামাজিক-বোধ যার বীজ তার জন্মগত, সেই বোধকে পরিকল্পিত এবং বিজ্ঞান সম্মতভাবে অতি শৈশব থেকে অভ্যাস করালে বয়স বাড়ার সঙ্গে সামাজিকতার প্রবণতা স্বতই বেড়ে যায়।

পাণ্ডিত্য-লাভের ক্ষমতা সব মানুষের যেমন সমান নয়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণের ক্ষমতার তারতম্যের অস্তিত্বও তেমনি সব শিশুতেই আছে। এ বিষয়ে মা-বাবা বা শিক্ষকের উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হয়ে, শিশুর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু আশা না-করে, তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি এবং গ্রহণক্ষমতার বৃদ্ধির বয়সানুপাতিক বিকাশ লক্ষ্য করে গেলে সেটাই তার পক্ষে ভালো। শারীরিক এবং মানসিক যে অভ্যাসের সুরু বাড়ীতে বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশে সেই সংস্কারেরই বার বার অনুশীলনে শিক্ষার্থীর সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শ্রদ্ধা, বাধ্যতা, নিয়মপালনে স্বাভাবিক প্রবণতা— বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জটিল মানসিক বৃত্তিগলি স্বভাবতই জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ যে কখনও হয় না— তা নয়। তবে জৈবিক নিয়মেই মানবকের সামাজিক সত্ত্বা বড়োদের সহানুভূতির স্পর্শে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই ভালোবাসে। বাড়ী থেকেই অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় জাতক অভ্যস্ত থাকলে তার ব্যক্তিত্ব গঠন সুষ্ঠু হয়।

আমাদের এই গতি এবং প্রতিযোগিতার যুগে এই অপেক্ষাটাই আমরা করতে চাই না। কিন্তু শিক্ষকের এবং অভিভাবকের গরজের দোহাই দিয়ে শিশুর 'মানস-মুকুল' ত আগুনে ভেজে ফোটানো যায় না। ঐ তাপে খই ফোটে— কিন্তু ফুল ত ফোটে না। তাকে সময় দিতে হবে, হৃদয়ের উত্তাপ দিতে হবে। এইখানেই ত অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষকের সহযোগিতা চাই।

অনেক শিক্ষিত মা-বাবা শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অবহিত হয়ে সন্তানের সঙ্গে ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্ক থাকেন। তাঁদের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ বক্তব্য নেই। তবু, তাঁরা শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে তার মূল্যবোধের ধারণা যেন বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে সংঘর্ষমূলক না হয়, বয়ঃসন্ধির নানারকম মানসিক এবং দৈহিক বিপর্যয়গুলি যেন বাড়ী ও বিদ্যালয় সহানুভূতির সঙ্গে কাটিয়ে ওঠায় তার সহায় হয়— এ বিষয়ে বাড়ীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ থাকা চাই-ই।

অনেক সময় দেখি, যে-সব শিশু খেলার বয়সে তারা গৃহভৃত্যের কাজ করে অথবা রাস্তায় কাগজ বা কয়লা কুড়োয়— তাদের বিষয়ে কিছু বলতে আমার গলায় কথা আটকে যায়— আমি বাক্‌হারা হয়ে যাই : সে প্রসঙ্গে আজ থাক। কিন্তু আমার শিক্ষকতার জীবনে এমন অনেক শিশুর সাক্ষাৎ পেয়েছি— যারা বাড়ীতে আদর্শ ব্যবহার পায় না বলে বিদ্যালয়ে তাদের নানারকম অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের গরীব দেশে সামাজিক অনেকরকম ক্ষতিকর সংস্কার আমাদের মনকে এবং জীবনকে বেঁধে রেখেছে বলে সুস্থ আনন্দময় জীবনবোধ আমাদের বাড়ীতে গড়ে ওঠে না। বিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে ঐ রকম বাড়ী থেকে আগত শিশুদের মনও আনন্দে বেড়ে উঠতে চায়। কিন্তু বাড়ীতে যদি পরিচ্ছন্নতাবোধ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা, এবং সুস্থ মূল্যবোধের সংস্কারের মূল না-গড়ে ওঠে— বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে— সে স্বস্তি বোধ করে না। এই জন্যেও বাড়ী এবং বিদ্যালয়ের সহযোগিতা দরকার।

আমরা সকলেই ত চাই আমাদের

সন্তান সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বড়ো হয়ে মানুষ হয়ে উঠুক এবং বয়সের সঙ্গে তার নিজের বিষয়ে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা, সম্মানবোধ, পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ, দেশাত্মবোধ তার মনে দানা বেঁধে উঠুক। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহারিক উপায়ে যে ভাবে Congenital পরিবেশ দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ এই মানবকদের দেশের সম্পদ হয়ে উঠতে সাহায্য করা যায়— সে এক সমবেত প্রক্রিয়া। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে সব শিক্ষকের এবং সব পিতামাতার এ বিষয়ে সচেতনতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর পরামর্শ নিতে এঁরা এগিয়ে আসতে যেন দ্বিধা বোধ না-করেন।

এ বিষয়ে, ইচ্ছুক বিদ্যালয় অর্থাৎ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি শিক্ষক এবং উৎসুক বাবা-মা-ই পারেন নিয়মিত মিলিত হয়ে আলোচনার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু উপায় খুঁজে বার করতে।

অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াশুনোয় অমনোযোগী, মিথ্যা বলার প্রবণতা অনেকের থাকে, সহপাঠীদের জন্যে নিজের সুবিধা সামান্যও ছাড়তে চায় না, অন্যের জিনিষ নিয়ে নেওয়ার প্রবণতা অনেকের থাকে, অপরের খাতা দেখে উত্তর লেখার চেষ্টা করে অনেকে ইত্যাদি আরও কতো রকমের যে অবাঞ্ছনীয় স্বভাবের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষণবৃত্তি যাঁরা পেশা বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের হতাশ হলে চলবে না। মা-বাবা বা শিক্ষণ বৃত্তিধারীদের ধৈর্যহারা হলে ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁদের দায়িত্বপালনের অমার্জনীয় ত্রুটির শেষ থাকবে না। যে পরিবেশে আজ শিশুরা লালিত হচ্ছে সে ত সবসময়ে অনুমোদনযোগ্য বা প্রীতিকর নয়: কিন্তু সে বিষয়ে ত আমরা প্রায় অসহায়। তবু এই অনিষ্টকর প্রভাব থেকে শিশুমনকে মুক্ত রেখে, নৈতিক মান এবং যুক্তি গ্রাহ্যতার মূল্যবোধ তার ভেতর গড়ে তুলতে হবে। সুন্দর ভবিষ্যতের আশা তার মনে জাগাতে হবে। বাবা-মা এবং শিক্ষাব্রতী আমরা নিজেদের চিন্তার, আচরণের এবং বাক্যেরও নিজেদের সমালোচক এবং সংশোধক না-হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সে ত্রুটি ক্ষমা করবে না। বড়োদের কথায় বা ব্যবহারে মিথ্যাচরণ, ভীরুতা, শিশুদের দৃষ্টি এড়ায় না। অনুচ্চারণীয় শব্দ-ব্যবহার বা অশালীন ভাবভঙ্গী শিশুরা অজ্ঞাতসারেই শিখে নেয়। সকলেরই জানা এ সব কথা, তবু আমরা সব সময়ে ত অবস্থিত থাকি না এ বিষয়ে। বাড়ী এবং বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশে যৌথভাবে লালিত শিশু পরে সমাজকেও উন্নত করে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-গ্রহণে শিক্ষার্থীকে যতোটা সতর্ক এবং চকিত হওয়া আমরা আশা করি এবং অন্যথায় শিক্ষা-জীবনে সে যেমন অকৃতকার্য হয়— আমাদের বড়োদেরও সেই রকম আচারে, ব্যবহারে, কথায়, সিদ্ধান্তগ্রহণে শিশু-পরীক্ষকের কাছে সতর্ক এবং সুসমঞ্জস থাকতে হয়। নয়ত— আমরাও ওদের চোখে ফেল করেই যাই।

> What is education? Is it book-learning? No, is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under contrast and become fruitful is called education.
>
> — Swami Vivekananda

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতীয় নারীজাগরণের পূর্ণরূপ

স্বামী বলভদ্রানন্দ

একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, ভারতীয় নবজাগরণের আর কোন মহাপুরুষই স্বামী বিবেকানন্দের মতো ভারতীয় নারীর সমস্যা নিয়ে এত গভীর ভাবে ভাবেননি। বিবেকানন্দের নির্মাণ পূর্ণ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর ভারতব্যাপী পরিব্রজ্যার কালে। এই পরিব্রাজক জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারত এবং সনাতন শাস্ত্রকে একাকার-রূপে চিনেছিলেন— একথা আমরা নিবেদিতার চিন্তাসূত্রে জেনেছি।[১] এই চেনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি ভারত ও বিশ্বের প্রয়োজনে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকাটিকেও চিনে নিতে পেরেছিলেন।

এই পরিব্রাজক জীবনেই বিবেকানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন, ধর্ম-আত্মিক ভারতবর্ষের তদানীন্তন সমাজে শাস্ত্রের ধর্ম আর আচরণের ধর্মের মধ্যে কী আকাশপাতাল তফাত। শাস্ত্রে আছে অদ্বৈততত্ত্বের কথা, 'মহা অভেদের কথা'; কিন্তু 'কার্যে মহা ভেদবুদ্ধি', অস্পৃশ্যতা, ছুঁতমার্গ। নারী মাত্রেই দেবী— শাস্ত্রের কথা, আর বাস্তবে নারীর মর্যাদা পুরুষেরও নিচে। জাতীয় জীবনে বহু ত্রুটির মধ্যে দুটিকে স্বামীজীর মনে হল মহাপাপ— 'Great national sin'। প্রথমটি হল জনসাধারণকে অবহেলা করা, দ্বিতীয়টি হল নারীজাতির প্রতি দীর্ঘদিনের সমষ্টিগত অবিচার। নারী যদিও জনসাদারণেরই অঙ্গ, তবু নারীজাতিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে স্বামীজী নারীসমস্যাকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। আমরা স্বামীজীর এই কথাগুলির সঙ্গে বহুপরিচিত—

''মেয়েদের পূজা করেই সব জাতি বড় হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই— সে-দেশ, সে-জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।''[২]

''যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের, সে-দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই।''[৩] ''মেয়েদের উন্নতি করিতে পার তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।''[৪] স্বামীজীর আরেকটি বিখ্যাত কথা: ''এক পক্ষে পক্ষীর উত্তান সম্ভব ন।''[৫] সমাজের একটি ডানা যদি হয় পুরুষ, অপরটি অবশ্যই নারী— দুটি ডানারই সমান পুষ্টি ও শক্তি না থাকলে 'পাখি'র উত্থান সম্ভব নয়। সমাজ ও দেশের প্রগতির জন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ যে সমভাবেই আবশ্যক, এটি বোঝানোর জন্য স্বামীজীর এই সূত্রাকার উপমাটি এককথায় অতুলনীয়।

নারীজাগরণ সম্পর্কে স্বামীজীর একটি মৌলিক এবং সুদৃঢ় নির্দেশ : মেয়েদের কোন ব্যাপারে যেন পুরুষেরা হস্তক্ষেপ না করে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো কুপ্রথাগুলির প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু এসংক্রান্ত সমকালীন আন্দোলনগুলির অধিকাংশের প্রতি স্বামীজীর সমর্থন ছিল না। কারণ, সেগুলির অধিকাংশ ছিল পুরুষ-পরিচালিত। স্বামীজী আজন্ম স্বাধীনতার পূজারি ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শনের মূল সুরই হল স্বাধীনতা: ''Liberty is the first condition of growth''[৬]— তিনি বলতেন। তাই পুরুষ ও নারী উভয়েরই জাগরণের জন্য তিনি স্বাধীনতাকে অবশ্য অবলম্বনীয় মনে করতেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন, মেয়েদের শুধু শিক্ষার সুব্যবস্থা করে ছেড়ে দিতে, তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের

জাগরণের পথ খুঁজে নেবে।

স্বামীজী যদিও ভারতে থাকাকালীনই ভারতীয় নারীর দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন, তবু নারীসমস্যা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা নারীজাগরণ সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলি গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের নারী সমাজকে দেখার পরই।

ভারতে যে-নারীসমাজকে দেখে তিনি অভ্যস্ত, পাশ্চাত্যে দেখলেন ঠিক তার বিপরীত। ভারতের নারী অন্তঃপুরচারিণী, প্রায় অসূর্যম্পশ্যা, অশিক্ষিত, জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু ধর্মপ্রাণা, গৃহকর্মনিপুণা এবং সর্বপ্রকার বাহ্য দুর্বলতা সত্ত্বেও সতীত্বের আদর্শে বজ্রদৃঢ়। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীন, শিক্ষিত, সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে চলতে অভ্যস্ত। স্বামীজীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারী আদর্শের মূল পার্থক্যটি ধরা পড়ল। ভারতীয় নারীতে জননীভাবের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে জায়াভাবের। ভারতে পরিবারের কর্ত্রীমা, পাশ্চাত্যে স্ত্রী। ভারতীয় নারীর মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির প্রাধান্য, পাশ্চাত্য নারীর মধ্যে কর্মশক্তির। স্বামীজী বলেছেন: ভারতে নারীকে একটি চিন্তাই সবসময় তৎপর রাখে যে, তিনি মা। তিনি ভগিনী হোন, কন্যা হোন বা পত্নীই হোন— মাতৃভাব তাঁর মধ্যে থাকেই। কৈশোর, যৌবনের স্বাভাবিক পর্যায়গুলি সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর জীবনেও আসে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মাতৃভাবেই তিনি তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান এবং যৌবন বিগত হয়েছে বলে আক্ষেপ করেন না বা যা গত হয়েছে তাকে বর্তমান করার জন্য কৃত্রিম প্রচেষ্টা করেন না। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য নারীর মধ্যেও মাতৃভাব জায়াভাবের পাশাপাশি অবশ্যই থাকে; কিন্তু জায়াভাব বা যৌবনসুলভ ভাবগুলোকে কোনদিনই তিনি যেন মরতে দিতে চান না! মাতৃভাবের চেয়ে এই ভাবই তাঁর জীবনে অধিক সময় নিয়ে অধিকতর গুরুত্বসহ বিরাজ করে।

স্বামীজী পাশ্চাত্য নারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কয়েকজন মহীয়সী মহিলা তাঁকে বহু কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁরা তাঁকে সন্তান এবং ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেখানকার আপামর নারীসাধারণের মধ্যে মাতৃভাবের অভাব দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, যখন ভারতীয় রীতি অনুযায়ী পাশ্চাত্য নারীদের 'মা' বলে ডেকেছেন তখন তাঁরা আঁতকে উঠেছেন।

স্বামীজী প্রায় হাহাকার করে বলেছেন : ''কোথায় সেই সর্ব-মহিমময়ী জননী, যিনি আমার এই শরীর দিয়েছেন? এই পাশ্চাত্য দেশে তিনি কোথায়? কোথায় তিনি যিনি আমার প্রয়োজন হলে বারবার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যার ভালবাসা কখনো ফুরায় না, তা আমি যতই দুষ্ট বা হীন হই না কেন?... হে আমেরিকার নারী! এই দেশে আমি তাকে— সেই মাকে খুঁজে পাব না; ধন্য আমাদের জননী।... যদি মায়ের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহলে মায়ের কোলে মাথা রেখেই মরতে চাই।''[৭]

ভারতীয় নারীদের এই মাতৃত্বের আদর্শটির ব্যাপারে স্বামীজী ছিলেন সম্পূর্ণ uncompromising— নারী-জাগরণের পরিকল্পনায় যত কথা তিনি বলেছেন, সব এই মাতৃত্বের আদর্শটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। এর কারণ যেমন এই যে, ভারতভূমির স্বাভাবিক সংস্কার জন্মসূত্রেই তাঁর মধ্যে ছিল এবং তিনি নিজেকে শাক্তমায়ের সন্তান ভাবতে ভালবাসতেন— এর কারণ সেইসঙ্গে সম্ভবত এও যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিলে মর্ত্য-দেহধারী জগজ্জননীর আবির্ভাবের তাৎপর্য তিনিই সর্বপ্রথম যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী শুধু ভাবের জগতে বাস করার লোক ছিলেন না। নারীজাতির দুরবস্থা তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। তাঁর ইংরেজি জীবনীতে ইঙ্গিত আছে, পরিব্রাজক জীবনে যখন ভগিনীর আত্মহত্যার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছাল, তখনি ভারতীয় নারীর দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠলেন। তাই পাশ্চাত্যে এসে তিনি যখন দেখলেন, পাশ্চাত্য নারীর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ, তাদের উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষা, পুরুষের সঙ্গে সর্বব্যাপারে অংশগ্রহণ, সর্বোপরি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সমমর্যাদা, তখন তিনি চমৎকৃত হলেন।

খোলা মন নিয়ে তিনি পাশ্চাত্য নারীকে তাঁর দেশের নারীদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন। সিস্টার ক্রিস্টিন বলছেন, এটা তাঁর কাছে 'mental gymnastics' বা নিছক বৌদ্ধিক আনন্দ ছিল না। এই ছিল তাঁর কাছে জীবন-মরণ সমস্যা। দিনের পর দিন তিনি এই চিন্তায় বিভোর হয়ে পায়চারি করেছেন— সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। যেন মাইকেল এঞ্জেলো ছেনি-হাতে পাথরপিণ্ড থেকে তাঁর মানস-প্রতিমাকে রূপ দিতে মগ্ন। স্বগতোক্তিরূপে যে দু-একটি কথা তাঁর মুখ থেকে ঝরে পড়ত, তা থেকে তাঁর অন্তর্জগতে যে-

আলোড়ন চলছে, তার আভাস পাওয়া যেত। ক্রিস্টিনের সৌজন্যে প্রাপ্ত তার অংশবিশেষ এইরকম : ''For days at a time his mind would be concerned with this problem. Pacing up and down, every now and then a few words would fall from his lips. He was not addressing anyone but thinking aloud.''[৮]

কোন্‌টা ভাল? আমেরিকার নারীদের স্বাধীনতা, নাকি ভারতীয় জীবনধারা বিধি-নিষেধ? আমেরিকার জীবনধারা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক— individualistic; সর্বনিম্ন মানুষকেও তা সুযোগ দেয়। স্বাধীনতা ছাড়া কোন উন্নতি সম্ভব নয়, কিন্তু স্বাধীনতার বিপদও তো আছে। সে হল, পড়ে যাওয়ার ভয়। আবার এও তো সত্যি, ভুল থেকেও মানুষ শিক্ষালাভ করে। ভারতীয় সমাজে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই। সম্পূর্ণভাবে তা সমাজের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিকে সেখানে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই হবে, যদি না সে সন্ন্যাসী হয়। এদেশে সন্ন্যাসীরাই একমাত্র সামাজিক বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। (''There is no freedom for individuals unless he becomes a sannyasin.'')

একথা ঠিক, ভারতীয় সমাজ বিরাট মাপের আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের সৃষ্টি করেছে; কিন্তু তা কি হাজার হাজার সাধারণ মানুষের বিনিময়ে— যারা আধ্যাত্মিকতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়? একটা জাতির পক্ষে কোন্‌টা ভাল? ব্যক্তির ওপর ভারতীয় সমাজের বিধিনিষেধ, নাকি ব্যক্তির জন্য পাশ্চাত্য সমাজের স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতার কী বিরাট গুরুত্ব ও সুফল, তা তিনি আমেরিকার সমাজে প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-কাঠামো যে এদেশের জন্য কী অসীম সুফল প্রসব করেছে, সে-সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে ওয়াকিবহাল আর কে ছিলেন? যখন অপর অপর মহান দেশগুলি গৌরবের শিখরে উঠেও কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে, শুধু ইতিহাসের পাতায় বেঁচে আছে— তখন এই সমাজ-কাঠামোই তো ভারতকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাহলে এই কাটামোটিকেই বা বর্জন করা যায় কী করে? আমেরিকার সমাজে প্রসারতা আছে, আবার ভারতীয় সমাজে আছে গভীরতা। কীভাবে দুটিকেই রাখা যায়? কীভাবে ভারতীয় গভীরতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রসারতাকে যুক্ত করা যায়? (''The freedom of America… makes for breadth, whilst the intensity of India means depth… How to keep the Indian depth and at the same time add breadth?'') তিনি প্রাণপণে খুঁজে বের করতে চাইছিলেন এমন একটি উপায়, যাতে ভারতীয় কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়। (''…to find out whether where was a way of adding to this structure the best of other countries, without endangering the structure itself'')[৯]

সেই উপায় তিনি বেরও করেছিলেন। তা হল— শিক্ষা। নিবেদিতা বলেছেন: ''স্বামীজী মনে করতেন— প্রকৃত শিক্ষা যদি দেওয়া যায়, তবে নারী এবং সাধারণ মানুষ উভয়ই তাদের যার যা সমস্যা আছে তার সমাধান নিজেরাই করে নিতে পারবে।'' এমন যে মহা শক্তিশালী শিক্ষা, তার রূপ কী হবে? নিবেদিতা বলছেন, সেই শিক্ষার প্রথম শর্ত হবে পবিত্রতা। যে-শিক্ষায় পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, স্বামীজী তাকে শিক্ষা বলতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১০] সেই শিক্ষা হবে একাধারে 'intellectual, national and spiritual'।[১১] বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাবে এবং অবশ্যই সেই শিক্ষা হবে জাতীয় ধারায়। কারণ, নিবেদিতা নিশ্চিত ছিলেন, স্বামীজী ভারতের জন্য তাঁর যে মানুষ তৈরির ব্রতের কথা বলেছেন ('Man making is my mission.') তা আসলে জাতীয় ধারায় মানুষ তৈরির ব্রত— 'national man making'। সিস্টার ক্রিস্টিন বলছেন, নারীশিক্ষায় মাতৃভাষা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস, রান্না-বান্না, সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজ, এমনকী বিজ্ঞান-সহ পাশ্চাত্যের সমস্ত আধুনিক বিদ্যার স্থান থাকবে। কিন্তু ভারতীয় আদর্শকে সবসময় পবিত্র জ্ঞান করতে শিক্ষা দিতে হবে। ''Indian ideals and Indian traditions must always be held sacred. Education will come by the assimilation of the greatest ideas of the East and of the West. Any kind of education which undermines the faith of the Indian woman in the past culture of her race, its religion and tradition, is not only useless but detrimental. She had better be left as she is.''[১২] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহত্তম আদর্শগুলির সমন্বয় ঘটাতে হবে শিক্ষার আদর্শে। শিক্ষা যদি ভারতীয় নারীকে ভারতের অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন করে তোলে, তবে সেই শিক্ষা তার পক্ষে শুধু অর্থহীনই হবে না, হবে ক্ষতিকারকও। স্বামীজী এমনকী এও মনে করতেন, কুশিক্ষা করার চেয়ে নারীরা বরং অশিক্ষিত থাকুক। নিবেদিতা বলেছেন : 'চটুল বিলাসী, জাতীয়তা বোধশূন্য একজন মানুষ যতই শিক্ষিত বলে পরিগণিত হোন না কেন, স্বামীজী তাঁকে শিক্ষিত বলে গণ্য করতে রাজি হননি। তাঁকে তিনি অধঃপতিত বলেই মনে করেছেন। আবার অন্যদিকে, আধুনিক এক নারী যদি অন্তরে পবিত্রতা ও অন্য সদ্‌গুণের অধিকারী থাকেন, স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে তার সমস্ত বাহ্য আধুনিকতা সত্ত্বেও তিনি, স্বামীজীর দৃষ্টিতে, আদর্শ ভারতীয় গৃহিনী। কারণ, স্বামীজী মনে করতেন, প্রকৃত নারীত্ব প্রকৃত সাধুত্বের মতোই অন্তরের ঐশ্বর্যের ওপরে নির্ভরশীল, বাইরের কোন কিছুর ওপরে নয়। নারী-শিক্ষা সার্থক হবে না, যদি না তা নারীর মধ্যে প্রকৃত নারীত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে।'[১৩]

স্বামীজী যে 'true womanhood' বা প্রকৃত নারীত্বের কথা বলেছেন, তার মধ্যে পবিত্রতা এবং সতীত্বকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'I love purity'— তিনি সর্বদা বলতেন। কিন্তু এরই সঙ্গে আরো একটি গুণের সপ্রশংস উল্লেখ তিনি বারবার করতেন, যা তাঁর আগে কেউ সম্ভবত নারীত্বের অঙ্গ বলে কল্পনাও করতে পারেনি। সেটি হল রাজপুত নারীসুলভ বীরত্বের ভাবটি। বারবার করে তিনি বলতেন পদ্মিনীর নেতৃত্বে সেই জহরব্রতের কথা কিংবা সেই রাজপুত রমণীর কথা, যিনি স্বামীকে যুদ্ধ-সাজে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : 'Come back

with your shield or on it.'— হয় যুদ্ধ জয় করে এই ঢালসহ ফিরে এস নয়তো শহিদ হও। এই ঢাল ফিরে আসুক তোমার ছিন্ন শিরকে ধারণ করে। ঝাঁসির রানির কথাও তিনি বারবার বলতেন। স্বামীজী যে আদর্শ নারীকে কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে এই বীরত্বের ভাবটিকেও আবশ্যিক মনে করতে হবে। সিস্টার ক্রিস্টিন বলেছেন : ''instead of sympathizing with the trembling timid woman, full of fear for the one she loved, he said, 'Be like the Rajput wife'!''

নিবেদিতা বলেছেন : 'Strength, strength, strength was the one quality – he called for, in woman as in man।'[১৫]

পুরুষদের মধ্যে যেমন, তেমনি নারীদের মধ্যেও তিনি বারবার শক্তির প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ছিল। অতিরিক্ত আত্ম-ঘোষণা বা অতিরিক্ত আবেগ— কোনটিকেই তিনি শক্তি বলে মনে করেননি। শক্তি বলতে বুঝেছেন সেই প্রাচীন মহান ধারাটিকে— যেখানে শক্তির প্রকাশ নীরবতার মাধুর্যে এবং স্থৈর্যে।[১৬] স্বামীজীর মানসনেত্রে প্রতিভাত আদর্শ নারীর মধ্যে শারীরিক শক্তি তো থাকবেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে থাকবে এই আত্মিক শক্তি।

এই শিক্ষার ফলে নতুন একদল শিক্ষিকা (women educator) গড়ে উঠবে[১৭], দেশ ও জাতির রক্ষক হয়ে যারা বিরাজ করবেন। কীরকম হবেন তাঁরা? —সম্পূর্ণ নিবেদিত-প্রাণ নিবেদিতার ভাষায়— 'no home, save in their work, no ties save of religion, no love but for God and people and motherland.' —তাদের কোন গৃহ নেই, কর্মই তাদের গৃহ কোন বন্ধন নেই, ধর্মই তাদের একমাত্র বন্ধন; কারো প্রতি ভালোবাসা নেই— গুরু, জনসাধারণ ও মাতৃভূমিই তাদের একমাত্র ভালবাসা

নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে তারা স্বামীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাকে রূপায়িত করবে। তারা শুধু শিক্ষাই দেবে না, নারীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়েও স্বাধীন করতে সচেষ্ট হবে; কারণ, দেশের বহু নারী শুধু দারিদ্র্যের কারণেই পুরুষদের কাছে ক্রীতদাসী হয়ে রয়েছে। স্বামীজী তাই স্বষ্ঠভাবে বলেছেন: 'They (the women) must be economically independent'[১৮] কীভাবে তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবে, সেকথা স্বামীজী বলেননি; কারণ, মেয়েদের দিশা মেয়েরাই দেখাবে— এটিই ছিল তাঁর নারীজাগরণের গোটা পরিকল্পনার মূল সুর।

নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে আরো কয়েকটি দিঙ্‌নির্দেশ তিনি করেছেন। লিখতে পড়তে জানাই নারীশিক্ষার লক্ষ্য নয়— যদিও লিখতে পড়তে মেয়েরা অবশ্যই শিখবে। শিক্ষা এমন হবে যে, লেখাপড়া শিখে মেয়েরা যেন সেটিকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে। শিক্ষা যেন কোন বাহ্য অস্ত্রে ('superficial weapon'-এ) পর্যবেসিত না হয়। কোন মেয়ে পড়তে শিখে যদি কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য পাঠেই তার বিদ্যাকে ব্যবহার করে, তবে তার নিরক্ষর থাকাই ভাল। কিন্তু যদি দেখা যায়, সেই বিদ্যাই তার নিজের দেশকে, দেশের ঐতিহ্যকে, সংস্কৃতিকে এবং ইতিহাসকে জানার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে বুঝতে হবে, শিক্ষা তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।[১৯]

ভারতের নারীদের শুধু উচ্চশিক্ষিত হলেই হবে না, তাদের কয়েকজনকে অন্তত বিরল বৌদ্ধিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে— যাতে তারা পৃথিবীর যে কোন জ্ঞানী নারীর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। একই সঙ্গে ত্যাগ ও সেবার জাতীয় আদর্শ হবে তাদের জীবনমন্ত্র। অতীতে নারীরা ব্যক্তিগত কারণে সর্বোচ্চ স্বার্থত্যাগ করেছে। স্বার্থত্যাগ করার ক্ষমতা ও অভ্যাস তাদের আছে। এখন অন্তত কয়েকজন নারীকে দেশের জন্য সেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে। এরকম কয়েকজন নারীই গোটা দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। স্বামীজী নিজেই বলেছেন : 'পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশো নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।'[২০]

সিস্টার ক্রিস্টিন প্রশ্ন করেছেন : নারীদের জন্য কী কাজ স্বামীজী করতে চেয়েছিলেন? আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ? নাকি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র? নাকি বিধবাশ্রম? এগুলি প্রতিটিই ভাল কাজ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু নারীজাগরণের যে পরম লক্ষ্য স্বামীজীর মানসনেত্রে বিধৃত ছিল, তার তুলনায় এগুলি গৌণ পর্যায়ের। সেই লক্ষ্যটিকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে অনুধাবন করতে হবে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের কী তাৎপর্য জগতের জন্য, বিশেষত সমকালীন ভারতের জন্য? আধ্যাত্মিকতার এই বিরাট উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন শক্তি, যে নতুন জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে তা শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীদের জন্যও। ('The new power, the new life that came with this influx of spirituality was not meant for men alone.') কিন্তু সেই শক্তি ও জীবনকে কী করে আমাদের মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে? ('But how could it be brought to the women of India?') কী করে ভারতীয় নারীদের জীবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অগ্নিময় করে তোলা যাবে, যা থেকে আরো লক্ষ লক্ষ নারী নিজেদের জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারবে? —এই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান চিন্তা। স্বামীজী মনে করতেন, মেয়েদের বিদ্যালয় বা বিধবাশ্রম গঠন এর তুলনায় নগণ্য। অন্তরে বাহিরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় স্নাত ও পরিচালিত একদল শিক্ষিকা যদি গড়ে ওঠে, তবে নারীকল্যাণের সজীব স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিশালী যন্ত্ররূপে তারা সমাজে বিরাজ করবে। শত শত নারীকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান তখন স্বতঃই গড়ে উঠবে। স্বামীজীর সমগ্র নারীজাগরণ পরিকল্পনাটি এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রূপ গ্রহণ করেছে। এবং একথা স্বামীজী স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন, কোন পুরুষকে দিয়ে একাজ হবে না। না, তাঁর মতো যুগন্ধর পুরুষকে দিয়েও নয়। এর জন্য একজন নারীই দরকার, কিন্তু কোথায় সে নারী? 'For this work a women is needed, he cried, No man can do it. But where is the woman?'[২১]

স্বামীজী খুঁজেছিলেন সেই নারীকে। কয়েকজনকে দিয়ে এই বিরাট কাজের পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন, স্বামীজীর শক্তিকেই ভুল করে তাঁরা নিজেদের শক্তি ভেবেছেন। তা দিয়ে

তাঁরা নিজেদের কাজ করতে চেয়েছেন, স্বামীজীর নারীজাগরণের কাজ তাঁদের দিয়ে হয়নি। স্বামীজী ভেবেছিলেন, যদি একজন উপযুক্ত নারী পাওয়া যায়, যাঁর মধ্যে বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সমস্ত গুণ আছে, আছে শিষ্যা-সুলভ ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, সেইসঙ্গে অপরের হৃদয়ে আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা— তাহলে তাঁকে শিক্ষা দিয়ে প্রথমে তৈরি করবেন। তিনি আবার তৈরি করবেন পাঁচ-ছয়টি অনুরূপ নারীকে— যাদের মধ্যে অসামান্য বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকবে, যাদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সমস্ত সদ্‌গুণের সমন্বয় ঘটবে। পেয়েছিলেন কি স্বামীজী এইরকম নারী? আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি।

মানুষের অন্তর্জগতের রূপান্তর ঘটিয়ে একটি নতুন মানবসমাজ গঠনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছেন। সেই নতুন পৃথিবী রূপায়ণের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন— স্বামীজীর ভাষায়— 'the method, that wonderful unconscious method! He did not understand himself… he lived that great life, —and I read the meaning.'[২২] শ্রীরামকৃষ্ণই হচ্ছেন পদ্ধতি বা প্রণালী, যাকে ব্যবহার করে সেই নতুন পৃথিবীকে বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন সম্পূর্ণ অসতর্ক, অসচেতনভাবে। তিনি আপন খেয়ালে একটা অনন্য জীবন যাপন করেছেন। স্বামীজী সেই অনন্য জীবনের রহস্য ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি সেই জীবনের প্রতি আকর্ষণ করেছেন। আমরা তখন আবিষ্কার করেছি, এই অনন্য জীবনটি ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গসুন্দর মানবজীবনের পথ বা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বামীজীর নারীজাগরণ পরিকল্পনায় সারদাবেদী হলেন সেই অপূর্ব অ-সচেতন পদ্ধতি— 'the wonderful unconscious method'। মায়ের সেই জীবনের ভাষ্যপাঠ করেছেন এক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা। মা প্রেরণা ও পথ নিবেদিতা রূপকার। যেমন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আশ্রয় করে নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে, তেমনি শ্রীমা ও নিবেদিতাকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর আকাঙ্খিত নারীজাগরণ বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

যদি তা হয়, এক নতুন গোত্রের নারীকে আমরা উদ্ভূত হতে দেখব, পৃথিবীর ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো হয়নি— 'A being will be evolved who will be unique in the history of the world.' প্রাচীন গ্রিক নারীরা যেমন দৈহিক গঠনে প্রায় নিখুঁত ছিলেন, তেমনি এই নারীরাও প্রায় নিখুঁত হবেন বুদ্ধিতে এবং আধ্যাত্মিকতায়। 'প্রায়' কথাটি বলতে হয়, কারণ তা না হলে মানুষের অগ্রগতির অনন্ত সম্ভাবনাকে সীমায়িত করে দেওয়া হয়। ' …a woman gracious, loving, tender, long-suffering, great in heart and intellect but greatest of all in spirituality.'— সেই নারী হৃদয় ও বুদ্ধির সমস্ত ঐশ্বর্যে মহান হবে, কিন্তু সবচেয়ে মহীয়সী হবে আধ্যাত্মিকতায়।[২৩]

তথ্যসূত্র

১. বাণী ও রচনায় নিবেদিতা-কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য
২. ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ২০০
৩. ঐ, পৃ ২০১
৪. ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৮৯
৫. ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ ২৪৪
৬. দ্র The Complete Work of Swami Viveknanda, Vol-III. 1984, p. 246
৭. দ্র Ibid, Vol-VIII, 1985, p. 57-58
৮. Reminiscences of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Admiers, 1983, p. 202
৯. Ibid
১০. দ্র The Complete Works of Sister Nivedita, Vol-I, 1982, p. 193
১১. Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 205
১২. Ibid
১৩. দ্র The Complete Works of Sister Nivedita, Vol-I, p. 193
১৪. Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 204
১৫. The Complete Works of Sister Nivedita, Vol-I, p. 195
১৬. দ্র Ibid
১৭. স্বামীজীর নারীজাগরণ পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এই নারী-শিক্ষিকা তৈরি। সিস্টার ক্রিস্টিন ও নারী-শিক্ষিকা গঠনের কথা বলেছেন।
১৮. Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 207
১৯. দ্র Ibid, p 207
২০. দ্র The Master as I Saw Him— Sister Nivedita, p. 260
২১. Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 203
২২. The Complete Works of Sister Nivedita, Vol-I, p. 139
২৩. Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 210

> প্রাচ্যের নারীকে প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে বিচার করা ঠিক নয়।
> প্রতীচ্যে নারী হলেন স্ত্রী, আর প্রাচ্যে তিনি জননী।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

‘বাণী ও রচনা’ থেকে গৃহীত

কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা

আমেরিকা ও ইওরোপে তিন বৎসর কাল বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ জানুয়ারী স্বামীজী সিংহলের রাজধানী কলম্বো বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই এক অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরদিন অপরাহ্নে ‘ফ্লোরাল হলে’ স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন, তাহাই ‘কলম্বো হইতে আলমোড়া বক্তৃতাবলী’র প্রথম বক্তৃতা।

যেটুকু সামান্য কার্য আমাদ্বারা কৃত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন শক্তিবলে হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে পর্যটনকালে আমার এই পরম-পবিত্র প্রিয় মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার; কারণ পূর্বে যাহা হয়তো হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন তাহা আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করিতাম— ভারত পুণ্যভূমি— কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন— ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃতিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে ‘পুণ্য-ভূমি’ নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে— যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে— যেখানে ঈশ্বরাভিমুখী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে— যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে— যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি— এই ভারতবর্ষ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন স্থাপয়িতাগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব-পশ্চিম— সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই সঞ্চিত রহিয়াছে। বন্ধুগণ, বিশ্বাস

করুন— ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; আপনাদের মধ্যেও যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তথ্য অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, ততটা আর কোন জাতিরই নিকট নহে। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটি সময়ে সময়ে তীব্র নিন্দারূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন তিরস্কারবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে ইহাতেই আছে। হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য, প্রাচীন ও বর্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড়ো বড়ো জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব প্রসূত হইয়াছে সত্য, অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য, কোন কোন জাতির জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী ভাবের জীবসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য— কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন— ঐ-সকল ভাব রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত প্রচারিত হইয়াছিল, রক্তবন্যায় সিক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-কর্দমের মধ্য দিয়াই ঐ-সকল ভাবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিপূর্ণ ভাব-প্রচারের পশ্চাতেই অগণিত মানুষের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছে।

প্রধানতঃ এই উপায়ে অপর জাতিসকল পৃথিবীর শিক্ষা দিয়াছে, ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নীলবর্ণে নিজেদের রঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে— ইতিহাস যাহার কোন সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না— সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই, সেই শুভ কর্মের ফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীসের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত। এমন একদিন ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। রোম সর্বত্র যাইত এবং মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে পৃথিবী কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন-গিরি (Capitoline Hill-রোম যে সাতটি পর্বতের উপর নির্মিত ছিল, তাহার একটি) ভগ্নস্তূপমাত্রে পর্যবেসিত! যেখানে সীজারগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তত্ত্ব রচনা করিতেছে! অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মদগর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বল্পকালমাত্র অত্যাচার-কলঙ্কিত জাতীয় জীবন যাপন করিয়া তাহারা জলবুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এরপূপেই এই-সকল জাতি মনুষ্যসমাজে নিজেদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপনারা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবেন না; কোন এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে— এ-কথা মনে করিবেন না! সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্তমান; শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই-সকল সনাতন আচার এখানে এখনও বর্তমান। যতই দিন যাইতেছে, ততই দুঃখ-দুর্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে শুধু এই ফল হইয়াছে যে, সেগুলি আরও দৃঢ়— আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ-সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল উৎসই বা কোথায়— ইহা যদি জানিতে চান, তবে বিশ্বাস করুন তাহা এই ধর্মভাবেই বিদ্যমান। সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়া আমি যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম— সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটি কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার চেষ্টা আছে, এই-সব নানা কার্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে— সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু ধর্মকর্মও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে— এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।

চীন-জাপানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানেন? পাশ্চাত্য সমাজে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন সেই সংবাদ রাখেন? যদি রাখেন, দুই-চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্মসভা বসিয়াছিল এবং সেখানে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য! দেখিতেছি— এখানকার সামান্য মুটে-মজুরও তাহা জানে! ইহাতে বুঝা যাইতেছে— হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। পূর্বে দেশীয়, বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোক প্রকাশ করিতে শুনিতাম, আর নিমেষে ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয়ে পড়িতাম। এখন বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা আংশিক সত্য, আবার আংশিকভাবে অসত্য বটে।

ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে-কোন দেশের একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন— 'তুমি কোন্ রাজনীতিক দলভুক্ত?' সে বলিয়া দিবে— সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল দলভুক্ত (Liberal or Conservative), এবং কাহাকেই বা ভোট দিবে। আমেরিকার কৃষক জানে, সে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট; এমনকি রৌপ্য-সমস্যা (Silver question) সম্বন্ধেও তাহার কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, 'বিশেষ কিছু জানি না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র!' বড়জোর সে বলিবে— তাহার পিতা খ্রীস্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, 'রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জান কি?' সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, 'এটা আবার কি? সোশ্যলিজম্ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনে কখনও শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে— রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকুই বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে নিজের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, 'আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।' ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দু-একটি কথা বাহির হইবে যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি; তাই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু— আমরা বলি, অনন্ত পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্তমানের যে রূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এ-সংসারজাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন না করিলে সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির যেন একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই যেন একটি বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনে উদ্দেশ্য নহে— কখনও ছিল না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা এই ঃ সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরেজরা তাহাদের অজেয় বাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই-সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে— আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের দান।

এইরূপ অতীতে ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মিলন ঘটাইয়াছে, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ভারতের একাকিত্ব তখনই ভাঙিয়াছে; যখন এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক-কৃত অস্পষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ''উপনিষদ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালে উহাই আমাকে শান্তি দিবে''। অতঃপর সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, ''গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।'' আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে।

যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন— ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন ও সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে। আমি সে-সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখনও বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরেজী ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে— যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে— fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে, বরং ঠিক তাহার বিপরীত; উহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানব-মনে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু যদি মানুষ অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করে, মনোযোগের সহিত ভারতীয় গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মূলীভূত মহান তত্ত্বসমূহের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে— শতকরা নিরানব্বই জনই ভারতীয় চিন্তার

সৌন্দর্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসু, ঊষাকালনী শান্ত শিশির-সম্পাতের মতো এই ধীর সহিষ্ণু 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে পুরাতন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত শিথিল হইয়া যাইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব-জাতিকে নিজ নিজ মতে অনুবর্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবি করিয়া থাকে, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাত প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ভঙ্গুর কাচ-পাত্রের মতো চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই যে ভারতের অধিবাসীগণের ধর্মজীবন সর্বোচ্চ দার্শনিক সত্য দ্বারা নিয়মিত, সেই ভারতের দর্শন— ভারতীয় মনের ধর্মবিষয়ক সর্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ এই-সকল মহান তত্ত্ব— অসীম জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্তত্ব ও বিভিন্ন জীবশরীরে তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা-রূপ অপূর্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্ব— পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ এই পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র কাদা মাটির ডোবা মনে করিত এবং ভাবিত— কাল অতি অল্প দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্বোপরি মানবাত্মার অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেই বিদ্যমান, এবং সর্বকালেই এই মহান তত্ত্ব সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy) প্রভৃতি আধুনিক বিস্ময়কর মতগুলির সর্বপ্রকার অপরিণত ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে— তখন মানবাত্মার অপূর্ব সৃষ্টি— ঈশ্বরের অদ্ভুত বাণীস্বরূপ এই বেদান্তের হৃদয়গ্রাহী, মনের উন্নতি-বিধায়ক ও চিত্তপ্রসারকারী তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানবজাতির শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু ইহাও বলিতে চাই, ভারতের বাইরে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ— যেগুলির উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ নির্মিত— সেগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা— শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, সেগুলি বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণ-বিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার; এগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। একটি সত্য সনাতন— উহা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে— পূর্বে অবস্থিত কোন কিছুর বিকাশমাত্র— এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগপ্রবাহ-সম্বন্ধীয় আশ্চর্য নিয়মাবলী ও এইরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক বিষয়সমূহ এই সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলি ছাড়া আবার অনেকগুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেইগুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়মিত। সেগুলিকে 'শ্রুতি'র অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে 'স্মৃতি'র— পুরাণের অন্তর্গত। এগুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন স্থায়ী সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্যজাতির ভিতর এগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে দেখা যায়। এক যুগে যে বিধান, অন্য যুগে তাহা নহে। যখন এযুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তখন ঐগুলি আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালের উপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন।

জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই-সকল অপূর্ব অনন্ত চিত্তোন্নতি-বিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহৎ তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ— ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার (tribal gods) জন্য ''আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা; এস, যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি'' বলিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখনও দেখা যায় নাই। মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মহান মূলতত্ত্বগুলি সহস্র বছর পূর্বের মতো আজও মানবজাতির কল্যাণ-সাধনে সক্ষম। যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, যতদিন কর্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তি দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বিদ্যমান থাকিবে।

সর্বোপরি, ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী লক্ষ্য করি, তবে আমরা সর্বত্র দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এই-সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত, তবে সেই-সকল দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম হইত— যেমন ব্যাবিলনীয় দেবতাগণ। যখন ব্যাবিলনবাসিগণ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতাগণের সাধারণ নাম ছিল 'বল' (Ball)। এইরূপ ইহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবতাগণের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক' (Moloch)। আরও দেখিতে পাইবেন, এই-সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ যখন অপরগুলি হইতে বড় হইয়া উঠিত, তখন তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া দাবি করিত। এই ভাব হইতে আবার স্বভাবতই এইরূপ ঘটিত যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া

তুলিতে চাইত। ব্যাবিলনবাসিগণ বলিত, 'বল মেরোডক' দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ— অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'মোলক য়াভে' অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসিত হইত। ভারতেও দেবগণের মধ্যে এই সংঘর্ষ— এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)— একমাত্র সংস্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিা থাকেন— এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব বিষ্ণু অপেক্ষা বড় নহেন, অথবা বিষ্ণুই সব, শিব কিছু নহেন— তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যেই ভারতের সমগ্র ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে ঐ তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রতিটি শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে— জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে-উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে— সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখা— পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী। তোমার বিশ্বাস— তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন বলিতে পারে, সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব ঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— সৎস্বরূপ এক, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

হে আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান সত্য আমাদের শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা স্থির করিয়া কখনো ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোর কুসংস্কাররাশি বর্তমান! এখনও সর্বত্র এই ভাব— এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই নীচ সঙ্কীর্ণতা! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের নিজেদের যাহা আছে, তাহাই অতি মূল্যবান; অর্থোপার্জনই তাঁহাদের মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই একমাত্র কাম্য বস্তু, আর বাকি সব কিছুই নয়। যদি তিনি মৃত্তিকা দ্বারা কোন অসার বস্তু নির্মাণ করিতে পারেন, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তবে সব-কিছু ফেলিয়া দিয়া ঐগুলিকেই ভাল বলিতে হইবে। শিক্ষা ও বিদ্যার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন— এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এখনও মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই জন অল্প-বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে এই-সব কথা পড়িতে পার, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও এরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি, এখনও পৃথিবীতে এই ভাবগুলি নাই বলিলেই হয়; শতকরা নিরানব্বই জন এ-সকল বিষয় চিন্তাও করে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশে আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি— এখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর দারুণ নির্যাতন চলিতেছে; নূতন বিষয় শিক্ষা করা সম্বন্ধে পূর্বেও যে-সকল আপত্তি উঠিত, এখনও সেই পুরানো আপত্তিগুলিই উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ধর্মাভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যতঃ তাহা এইখানেই— এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীস্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে! তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন— ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা— শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে কথিত হইয়াছে:

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।''

— বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত— এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, অপরটিকে হিতকর বলেন। সমুদ্র যেমন নদীসকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানাপথগামী জনগণেরও সেরূপ তুমিই একমাত্র গম্য।

ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইলেই কিন্তু একই লক্ষ্যে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া, কেহ বা সকল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে সকলেই সেই এক প্রভুর নিকট পৌঁছিবে। যখন তোমরা শুধু তাঁহাকে শিবলিঙ্গে নয়— সর্বত্র দেখিবে, তকনই তোমাদের শিবভক্তি এবং তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যে রূপে তাঁহাকে

উপাসনা করা হউক না কেন, তোমকে বুঝিতে হইবে যে, সব তাঁহারই উপাসনা। কাবা-র (মক্কায় অবস্থিত পবিত্র প্রস্তরখণ্ড-সমন্বিত উপাসনাস্থল) দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীস্টীয় গির্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে। যে-কোন নামে যে-কোন মূর্তির উদ্দেশে যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায়, কারণ তিনি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। পৃথিবীতে কি-অভাব, তাহা তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালভাবেই জানেন। সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। পৃথিবীতে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে— আমাদের মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি এ-কথা বলিতেছি? কারণ, এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে; আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বত্র ইহা প্রবাহিত রহিয়াছে। এখানে— কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এইভাবে আমাদের জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। ভারত ইহা অপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে, কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই নম্রতা, শান্তভাব, তিতিক্ষা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবের মহতী শিক্ষা— আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিতস সর্বজাতি, সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’।

ইন্দিরা গুহ'র স্মৃতিচারণা

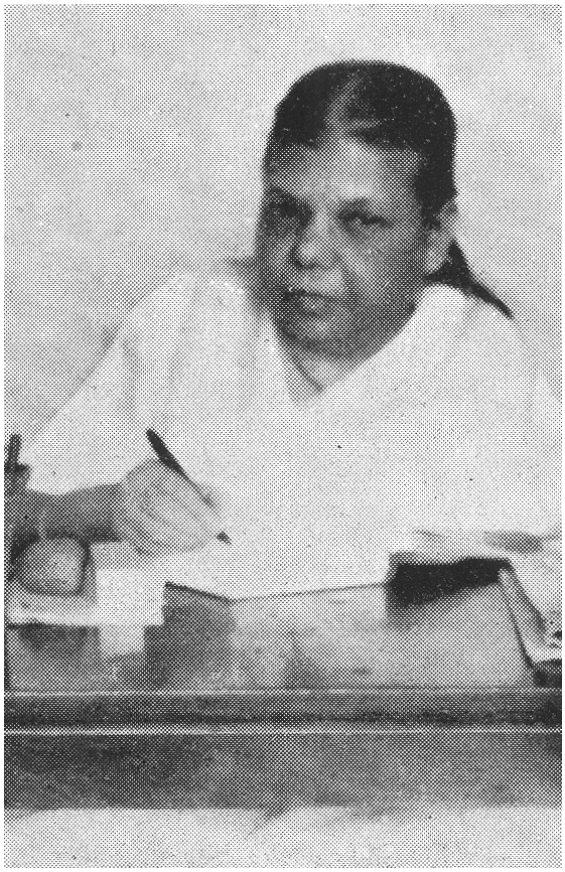

মীরা দেবী

বাণী দেবী

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও ভাস্করপ্রতিম শ্রীবিবেকানন্দের সৃষ্ট পরিমণ্ডলে বাস করছি। এই পবিত্র পরিমণ্ডল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন অনেক নরনারী যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের মনে প্রাণে জেনেছেন— তাঁদের আদর্শ অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করে জীবনকে তাঁদেরই চরণে উৎসর্গ করেছেন। এমন কত ব্যক্তির কথা আমরা বইয়ে পড়ে বা অপরের সান্নিধ্যে জেনেছি। শ্রীযুক্ত মীরা দেবী ও বাণী দেবীও তাঁদের চরণে উৎসর্গীকৃত দুটি স্বর্গীয় কুসুম যাঁরা নীরবে ঠাকুর মায়ের কাজই করে গিয়েছেন। গুণমুগ্ধ কয়েকটি প্রাণ একত্রিত হয়ে এই পুস্তকখানি লিখেছে, যাতে পরবর্তীরা জানতে পারেন তাঁদের মহিমা।

আমি অশীতিপরবৃদ্ধা। আজ আছি, কাল নেই। তাই মনে হচ্ছে আমার জীবনে তাঁদের প্রভাব কী ভাবে একটি জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে মঙ্গলের পথে এগিয়ে দিয়েছিল তা আপনাদের জানাই সংক্ষেপে। আমি মনে করি নেপথ্যে থেকে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস ও ভাবাদর্শে আমাকে সিক্ত করে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন।

আমার ৯ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটাতে আমি নিবেদিতা স্কুলে আসি। বাণী দেবী আমার মাসীমা ছিলেন— তিনিই অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত আমি তাঁদের যারপরণাই কষ্ট দিয়েছি। সুধীরাদেবী আমার দিদিমার সহোদরা ছিলেন ও মীরা দেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই মীরা দেবীও আমাদের পরিবারের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৬৪-তে ফেব্রুয়ারিতে বি টি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরলো। 2nd Class নিয়ে পাশ। চতুর্দ্দিকে খুব হইচই। দুই খণ্ড পূজনীয় সারদা মহারাজের লেখা লীলাপ্রসঙ্গ উপহার দিলেন। আনন্দে জড়িয়ে ধরে আমার মাথা ভিজিয়ে দিলেন। আমার মাসীমা (বাণী দেবী) আস্তে আস্তে বললেন— তুমি

একটা অসাধ্যসাধন করলে। আমি শুধু বললাম— এ সব তোমাদের কাছে শিক্ষায় দীক্ষায় সম্ভব হল। মাসীমাদের সেই উচ্চশির, মাঁয়ের আশীর্বাদ নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে দৃঢ়পায়ে চলা, তাঁদের কথা— 'মেয়েরা সব করতে পারে যা পুরুষেরা পারে'— এ সব আমাকে ঘিরে এমন এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল যে আমার অবস্থায় আমি স্থির থাকতে পারিনি। সুযোগের জন্য ছটফট করতাম। সুযোগ পেতেই বেরিয়েছি ঠিকই কিন্তু বাইরে কোনও যুদ্ধ নয়। মাসীমারা সর্বদা শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ তুলে ধরতেন। মেয়েরা ধীর, স্থির, শান্ত, স্নেহপ্রবণ হবে, ধৈর্য্য ও সহ্যশীলা হবে এবং আপন শক্তিকে সদ্ব্যবহার করে সংসারের ও সকলের উপকার করবে।

মাসীমাদের যে কর্মক্ষমতা ছিল তার প্রমাণ তো সকলের চোখের সামনেই রয়েছে। নারীজাগরণের যে মন্ত্র তাঁদের মধ্যে ছিল তাঁদের ছোঁয়ায় আমাদের মতো সামান্য নারী অনেকেই পেয়েছি ও সেই মতো জীবন গঠন করেছি। তাঁদের বাণী ও আদর্শ চির শাশ্বত যাঁরাই তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন ও আসবেন তাঁদেরই দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করবে অনেককে। ওই সুচি মহীয়সী মহিলার সংস্পর্শে আর জীবন বদলে গেল।

১৯৭৭ সালে ২৩শে ডিসেম্বরে নিউ আলিপুরে শ্রীসারদা আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গুহ'র স্মৃতিচারণায় সেই পুণ্যদিবসের আংশিক বিবরণ—

উৎসব চিত্র

শ্রীসারদা আশ্রমে নবনির্মিত মাতৃমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ২৫ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর উৎসবের শুরু ঐ দিনই প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল, নবনির্মিত মন্দিরটি পুষ্পসজ্জা ও অপূর্ব আলপনায় শোভিত হইয়া এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। মন্দিরদ্বারে অলঙ্কৃত মঙ্গলঘট ও স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী সজ্জিত হইয়া ফলকে ফলকে শোভা পাইতেছিল। ভোর ৩টায় সানাইয়ের সুরে প্রভাত হইল। শ্রীযুক্ত অরুন্ধতী রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা শোভা রায় সুমধুর স্বরে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। পুরাতন ঠাকুর ঘরে মঙ্গলারতি ও নিত্যপূজা হইল।

অশেষ কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরমপূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীগণ এই অনুষ্ঠান উদ্বোধনের জন্য আশ্রম ভূমিতে পদার্পণ করিয়া সকলকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন। নূতন মন্দিরের পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে ছাত্রীনিবাসের ও বিদ্যালয়ের বালিকারা ইউনিফর্ম পরিধান করিয়া পূজনীয় অতিথিবৃন্দকে শ্রদ্ধা জানাইতে ও স্বাগত করিতে শঙ্খ হস্তে তাঁহাদের আসার পথের দুইধারে সারিবদ্ধ ভাবে ধৈর্যের সহিত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। অপর দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট প্যান্ডেলের ভিতর অগণিত ভক্ত নরনারী নিঃশব্দে সেই শুভ-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। প্যান্ডেলের সুবৃহৎ মঞ্চে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমালা শোভিত হইয়া সকলের মনে এক অপার্থিব ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। বক্তাদের বসিবার জায়গা এবং সমগ্র মঞ্চটিও অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণভাবে সজ্জিত ছিল।

সকাল ৭-৪৫ মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী হইতে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ আসিয়া পৌঁছাইলেন। অল্প পরেই বেলুড় মঠ হইতে পরমপূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, স্বামী গীতানন্দজী, স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী হিতানন্দজী ও স্বামী প্রেমরূপানন্দজী আসিয়া পৌঁছাইলেন। বালিকাগণ শঙ্খধ্বনী সহকারে তাঁহাদিগকে অর্ভ্যর্থনা করিল। তাঁহারা নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে আশ্রমবাসিনীগণ একে একে তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। সকাল ৮-১৫ মিনিটে আশ্রমবাসিনীগণ শোভাযাত্রাসহকারে পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে সুসজ্জিত প্রতিকৃতিগুলি ও অন্যান্য বিগ্রহ বক্ষে ধারণ করিয়া নতুন মন্দিরে মঙ্গলবারি সিঞ্চন ও শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি সহ আসিয়া পৌঁছাইলেন। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন চন্দনজল সিঞ্চন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে ফুল খৈ ছড়াইতে ছড়াইতে অন্যজন আসিলেন তাহার পর একজন শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলে এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া দুইজন সুমিষ্ট স্বরে বেদ গান করিতে করিতে চলিলেন। ইহার পর আসিল মঙ্গলঘট। তাহার পশ্চাতেই গোপাল ও গণেশের মূর্তি বক্ষে ধারণ করিয়া এক আশ্রমবাসিনী, শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে পূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ধারণ করিয়া আসিলেন একজন আশ্রমিকা। চামর ব্যজন করিতে করিতে চলিলেন দুইজন।

ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বড়ো সজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া অগ্রসর হইলেন একজন। তাহার পরই শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র অঙ্গকণা রক্ষিত সুসজ্জিত আধার বক্ষে ধারণ করিয়া আসিলেন একজন আশ্রমদাতা। পশ্চাতে শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিতা বড়ো প্রতিকৃতি লইয়া আসিলেন একজন আশ্রমিকা। শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন এই শোভাযাত্রা শোভিত করিল এ বার ইহার পর স্বামীজীর সজ্জিত বড় প্রতিকৃতি আসিল। সবার পশ্চাতে চলিল শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা ও চরণাশ্রিতা শ্রীযুক্তা মীরাদেবী ও বাণীদেবীর প্রতিকৃতি। ইহার পরই শোভাযাত্রার শেষ পর্বে কতিপয় মহিলা ও ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীগণ কীর্তন করিতে করিতে চলিল ধুপ-ধূনা চন্দনের গন্ধ ও কীর্তনের রোল দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া দ্বিতলে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। মনোরম ঠাকুরঘর। সম্মুখে নাটমন্দিরের আকারে বড়ো হলঘর। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তান গানের প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে এক

পার্শ্বে এই আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয় শ্রীযুক্তা মীরাদেবী ও বাণীদেবীর প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে। এক পার্শ্বে এই আশ্রমের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা মীরাদেবী ও বাণীদেবীর প্রতিকৃতি যেন সজীব চোখে সব দেখিতেছেন। ফুলের অসংখ্য মালায় ও নিপুণ আল্পনায় মন্দির সুশোভিত হইয়াছিল। পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর রক্ষিত সুদৃশ্য সজ্জিত সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমায়ের অঙ্গকণা রক্ষিত পবিত্র আধার এবং স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্বহস্তে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন তৎপরে প্রবীণ সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অনেকেই অর্ঘ্য দান করিলেন। ইহার পর পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ আরতি করিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইলেন। সিংহাসনোপরি আরাধ্য দেবদেবী, আসনোপরি ধ্যানস্থ সংঘগুরু সুমধুর স্বরে বেদমন্ত্র গান গুরু ইষ্ট-মন্ত্রের এই ত্রিবেণী সঙ্গম ক্ষণিকের জন্য হইলেও সকলের সম্মুখে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করিল। ধ্যানান্তে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ প্রণাম করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ সহ নীচে আসিয়া সেই সুবৃহৎ সুসজ্জিত প্যান্ডেলে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিল।

তাহারা আসনগ্রহণ করিলে সভাস্থ সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিয়া এই সকল পূণ্যাত্ম সন্ন্যাসীগণের বাণী শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ অনেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তাহা সত্ত্বেও আশ্রমবাসীগণের ও ভক্তজনের আকুল আগ্রহে শীতের সকালে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের নির্দেশে প্রথমে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী বক্তৃতা করিলেন পরে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ অল্প সময়ের জন্য বক্তৃতা দিলেন। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী বলিলেন আমাদের বৃন্দাবন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছিলেন তারই দু-একটি দিয়ে আমি আরম্ভ করছি। যাঁকে আমরা ভগবান বলি, স্বরূপতঃ তিনি নির্গুণ নিরাকার মন বুদ্ধির অতীত আর আমাদের সকলেরই স্বরূপ তিনি। তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে। সৎস্বরূতা চিরকাল তিনি আছেন কোন কালে তাঁর বিনাশ নেই— অমর সত্ত্বা। চিৎস্বরূপ চৈতন্যসত্ত্বা এবং আনন্দস্বরূপ আনন্দময় সত্ত্বা। সেই সত্ত্বা থেকেই বিশ্বের সব কিছু হয়েছে। বেদান্ত যাকে ব্রহ্ম বলেছেন, তন্ত্রে তাকেই নির্গুণা মা বলেছেন। যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ যাকে সগুণ ঈশ্বররূপ মা কালী বলি, নারায়ণ বলি— তিনিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন। আরও বলেছিলেন— মন্দিরের সার্থকতা সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে মানুষ চায় এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে তার ভাব মনে জাগে। মন্দিরের সেই জন্য বিশেষ প্রয়োজন আছে, আরও বলেছিলেন মন্দিরে পটই রাখুন বা মূর্তিই রাখুন ভগবান তাতে প্রকাশিত থাকে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী একদিন আমার সামনেই ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন— ভেবোনা, এটি ছবিমাত্র। এর ভিতরে তিনি রয়েছেন। সব দেখছেন, শুনছেন। এখানে এই সারদা আশ্রমের কর্মীদের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় এখন একটি মন্দির গড়ে উঠেছে। যেখানে আপনারা এসে, আরও অনেকে এসে শান্তি পাবেন। যেখানে এলে মনে ভগবানের ভাব জাগবে। আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি তাঁর কৃপায় আজকে এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল এটির যেন আপনারা সদ্ব্যবহার করতে পারেন। এখানে মার নিত্যপূজা হবে। বিশেষ দৃষ্টি থাকবে তাঁর ইত্যাদি।

পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললেন, 'আমি বেশি কিছু বলতে পারব না। তবু কিছু বলছি— শ্রীশ্রীমা ছাঁচ তৈরি করে দিয়েছেন— আদর্শ জীবনের ছাঁচ। সেই ছাঁচে চরিত্র গঠিত করতে হবে মেয়েদের। মায়ের জীবন আদর্শ ভারতবর্ষে। শুধু ভারতবর্ষে কেন ভারতবর্ষের বাইরেও যত ছড়িয়ে পড়বে ততই মঙ্গল। ব্যক্তির মঙ্গল দেশের মঙ্গল সমস্ত জগতের মঙ্গল। এই জন্য সারদা আশ্রম সারদাসঙ্ঘ এই সব প্রতিষ্ঠান মায়ের জীবনাদর্শ খুব ভালো করে প্রচার করুক। তার চেয়ে বেশি ভালো কাজ কিছু হতে পারে না। ঠাকুর অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু তিনি সংসারে থাকেননি। সেই জন্য গৃহী ভক্তরা হয়তো বলতে পারেন— 'ঠাকুর তো সংসারে থাকেননি। সংসারের ঝামেলা কী রকম তা তো জানতেন না। তিনি তো শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন। তারা যাতে সেটা না বলতে পারে, তাই মা, ঠাকুরের কথাগুলি যে ঠিক ঠিক পালন করা যায়, তা নিজে করে দেখিয়ে ছিলেন।

সেই অশান্তিপূর্ণ সংসারে থেকেও তিনি ঠাকুরের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। অতএব মাকে আদর্শ করে যারা জীবন যাপন করবেন তারা এই সংসারে থেকেও অন্তরে শান্তিসুধার আস্বাদ পাবেন।

আশ্রমমাতা শোভাদেবীর প্রার্থনা

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় দিন। এই দিন বেলুড়মঠের পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের অশেষ কৃপায় নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্যা কন্যা আমাদের পূজনীয়া মাসীমা ও বাণীদির চির আকাঙ্খিত মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছেন।

পরম কল্যাময়ীর কল্যানস্পর্শে বহু ভক্তের প্রচেষ্টায় শত সহস্রা বাধা অতিক্রম করে মন্দিরে আজ সর্বমঙ্গলা মা সারদামণি দেবী অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। আজকের এই শুভদিনে মায়ের শ্রীচরণে আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, মা কৃপা করে সকলের অন্তরে জ্ঞান ভক্তি দিন এবং মাতৃসান্নিধ্যের দিব্য অনুভূতিতে সমবেত ভক্তজনের অন্তর বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত করে তুলুন।

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নাই, এটা যাতে আসে— তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে— সর্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সমগ্র রহস্য।

— স্বামী বিবেকানন্দ

Upanishads 'Appeal to the Youth of Today'

Swami Sunirmalananda

Modern youths are a very interesting phenomenon. When you study their behaviour pattern, when you study their interests in comparison with those of the earlier generations, you find that they have multiple interests and they do not accept anything just because someone has said it. Swami Vivekananda was a young person of this type .He himself exhorted the youth not to believe a thing because someone has said it. 'Find out the truth for yourself 'was his advice. Our young generations therefore are fond of Swamiji; his advice tempered with the Upanishadic realization appeal to them.

The Upanishads, you know, always encourage a questioning mind . We find in the Kathopanishad a very interesting statement. There Yama , the lord of death, tells Nachiketa, who has a tremendously enquiring mind; May I have more and more such students like you , O Nachiketa, who would question me and who have true resolution.

Naishā' tarkena matirā'paneyā'
proktānyenaiva sujnānāya preshtha;
Yām tvamāpah satyadhritih batāsi
tvādrik no bhuyānnaciketah prashtā

[I.ii.9]

So,you see, questioning is very much encouraged in the Upanishads. In no other scriptures we have enough scope for questioning. So the spirit of the Upanishads meets the requirements of the modern youths who have this questioning mind. They want to find out the truth of everything. They seem to say they cannot accept anything and everything just because XYZ said so.

In the pre-monastic life of Swami Vivekananda we see this actually happening when he met Sri Ramakrishna. Narendra straightaway questioned Sri Ramakrishna: 'Have you seed God?' Sri Ramakrishna beautifully and scientifically answered: 'Yes I have seen God more clearly than I see you'. The second part of his reply was more important because he said : 'Not only have I seen God, but you too can see Him'.

Sri Ramakrishna's reply was absolutely scientific. If he said,' I have seen, but you cannot see,' then that could

not be a scientific declaration. But Sri Ramakrishna said, 'I have seen and you too can see.' Narendra, then a young man, in his teens perhaps, endowed with a superb scientific temper, was fully satisfied with Sri Ramakrishna's clear-cut answer. Therefore you find in Swami Vivekananda a typical representative of the modern youth who first questioned and then accepted when he was satisfied with the answer –never accepting anything blindly.

The great German philosopher, Arthur Schopenhauer (1788-1860) said: 'In the whole World there is no study... so beneficial and so elevating as that of the Oupnekhat [Upanishads]. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death!' Referring to Schopenhauer, Swami Vivekananda said later: 'This great German sage foretold that " The world is about to see a revolution in thought. More extensive and more powerful than that which was witnessed by the Renaissance of Greek literatures'' and today his predictions are coming to pass.'

Indeed,we see a tremendous revolution going on today in the thinking world and more the message of the Upanihads. This has been possible because Swamiji has conveyed to us this message in a very profound and practical way. Vivekananda said; This is not just a theoretical Vedanta but a practical one. And the youth of today are in search of something which can give them tremendous energy and strength.

Revered Swami Yatiswarananda titled one of his books—*An Adventure in Religious Life*. It is indeed a beautiful title because religious life is just not a monotonous or humdrum life. It is an adventure. And the modern youth like adventure. Today we find that a blind man climbs Mt. Everest and a physically challenged person travels throughout the world in his specially-made vehicle. All these show that the youths are interested in adventure. This great adventure you find in the message of the Upanishads that declare 'uttishthata jāgrata prāpya varānnibodhata' - 'Arise, awake, and stop not till the goal is reached'. It is a very difficult path to tread no doubt, but those who are adventurous, courageous, have the strength to take this journey, they alone can reach the destination. You find the best example of this indomitable courage in Nachiketa described in the *Kathaponishad*. Nachiketa, a very young boy did not fear the Lord of Death, Yama. He was ready to face Him as his father wanted to give him to Death. His father of course wanted to take back the words he uttered in anger. But Nachiketa was unruffled and said: You are a man of truth. Stick to truth. I will face Yama.

How this courage came? How this strength came? In the Upanishads you find a beautiful word *shraddhā*. Vivekananda said, *shraddhā* is a beautiful word. It does not mean just blind faith; it is a very profound idea or quality which only a really sincere person can have. So before we undertake this spiritual or Upanishadic journey , we must know that it is a great adventure. Of course, everyone does not understand this truth. Some people therefore come to the Ramakrishna Math and say: 'Swami, our son is going astray'. 'Why?' we ask 'Because he has already started reading the Gita and the Upanishads at this young age', they say.

See the fun! They feel if a young person reads the Upanishads and the Vedanta, he has gone astray. Vedanta, they believe, is meant for those who have retired or who are not fit for any work; it is not meant for the younger generations. Well, it is a very strange and wrong notion.

Sometimes people come to me and ask, 'Swami, can you recommend a fine edition of the Upanishads?' 'For what?' I ask.'We are going to present a set of Upanishads to our officer who is going to retire tomorrow', they say. I ask 'What? You mean to say that these Upanishads, the *Gitā*, are meant for people who are about to retire tomorrow?' 'Then for whom they are meant?' They ask. I say: 'They are meant for the younger generations, those who to achieve something in this life, those who have something to give you in return.'

So that is the stage, you see, when one has to read this Vedanta and the *Upanishads*. But curiously enough, if somebody is busy in reading the Vivekananda literature, the *Upanishads*, the *Gitā* and other scripture, people say—'What? You have got this madness right now !' As if this so-called 'madness' has to come after certain age when you will have no energy, no vigour. But the Upanishad always declares that its message is meant for strong, vigorous, sincere people. They alone can understand the implications of the Upanishadic teachings. The *Mundaka Upanishad* (III.ii.4) itself states that this Atman cannot be attained by the weak— 'Nāyamātmā balahinena labhyah' What a powerful declaration ! This Self cannot be attained by one who is weak in spirit, weak in body. Therefore, strength is the message of the Upanishads.

Swami Vivekananda says in one of his utterances that if you squeeze the entire Upanishadic literature, the one word that will come out of it is ' abhih', 'abhih', 'abhih'. To quote Swamiji:

"Strength, strength is what the Upanishads speak to me from every page. This is the one great thing to remember, it has been the one great lesson l have been taught in my life; strength, it says, strength, O man, be not weak. Are there no human weaknesses?- says man. There are, say the Upanishads, but will more weakness heal them, would you try to wash dirt with dirt? Will sin cure sin, weakness cure weakness? Strength, O man, strength, say the Upanishads, stand up and be strong. Ay, it is the only literature in the world where you find the word "Abhih", "fearless", used again and again; in no other scripture in the world is this adjective applied either to God or to man. ...And the more l read the Upanishads, my friends, my countrymen, the more l weep for you, for therein is the great practical application. Strength, strength for us. What we need is strength, who will give us strength? There are thousands to weaken us, and of stories we have had enough. . . . Everything that can weaken us as a race we have had for the last thousand years. . . . Therefore, my friends , as one of your blood, as one that lives and dies with you, let me tell you that we want strength , strength, and every time strength. And the Upanishads are the great mine of strength. Therein lies strength enough to invigorate the whole world; the whole world can be vivified, made strong, energised through them. They will call with trumpet voice upon the weak, the miserable, and the downtrodden of all races, all creeds, and all sects to stand on their feet and be free. Freedom, physical freedom, mental freedom, and spiritual freedom are the watchwords of the Upanishads. Ay, this is the one scripture in the world , of all others, that does not talk of salvation, but of freedom. Be free from the bonds of nature, be free from weakness! And it shows to you that you have this freedom already in you." How beautifully Swami Vivekananda has condensed the message of the Upanishads! Strength, fearlessness and search for Truth--- these are the essential features of the Upanishads. And the modern youth want something which can be approached without fear. Only the Upanishads can give them this life.

Some wrong conceptions

There are wrong conceptions among Westren schoalars who allege that the Upanishads have a pessimistic approach to life, that they discourage man to live a good happy life. But it is not true. The Upanishads always encourage us to be strong, self-confident, sincere and hardworking.They inspire us to enjoy the bliss of a fulfilled life. *The Taittriya Upanishad* can be cited to prove this point. It says: Bhishā asmāt vātah pavate/ Bhishā udeti suryah/ Bhisha asmāt agnih ca lndrah ca/ Mrityuh dhāvati pancamah iti/ Saishā ānandasya mimamsa bhavati/ Yuva syatsadhu - yuva adhyāyakah/ Ashishthah dradhishthah balishthah/ Tasye iyam prithivi sarvā vittasya purnā syāt/ Sah ekah manushah anandah/ Te ye shatam manushah anandah/ (ll,VIII.l)

That is to say, the Bliss of Brahman is inconceivably greater than ordinary human joy which is but an insignificant particle of the former. Imagine the joy of a young man who is good, learned, strongly built, energetic, who possesses the entire wealth of this earth. This is one unit of human joy. Brahmananda (or the Bliss of Brahman which the Upanishads talk about) is billion times greater than the joy of the ideal youth. That the teachings of the Upanishads are not life -negating is also revealed by the second verse of the *lshopanishad* which avers:

Kurvanneveha karmāni jijivishet shatam samāh/
Evam tvayi nānyatheto' sti na karma lipyate nare//

'One should wish to live here for hundred years by doing *karma* in a detached manner. There is no other way'. So, you see, the Upanishad does not recommend that you commit suicide or give up your life. No. It says: Live for hundred years. Live a strong, active, selfless life. Live a happy, fruitful life, a positive life, a life full of vigour and strength.

In the *Taittiriya Upanishad* (I.iv.2) we find the Guru is praying to the supreme Lord thus: May the brahmacharins (students) come to me from all sides in a proper way, men with self—control, courage and strength. Then I will impart knowledge to them.

What a number of beautiful virtues the Rishis expect from the students. Let young men come to me, he says. But what type of young men? Not weaklings, who is good for nothing, but full vigour, stength, and self-control, for they alone can understand the bold message of the Upanishads.

You know the famous incident that took place in Swami Vivekananda's life. A young man came to Swamiji and said, 'Swami, can you teach me the *Bhagavad Gitā*? 'Swamiji looked at him and said: So weak you are! How will you understand the message of the Upanishads? Go and play football outside. Make your biceps a little stronger. Then come to me. Then you can understand the message of the Upanishads in a better way.

Elsewhere he said , 'What l want

is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made.' He also said, '…anything that makes you weak physically, intellectually, and spiritually, reject as poison; there is no life in it, it cannot be true.' That is exactly what the Upanishads echo in its message – 'Nāyamātma balahinena labhyah' – 'This Self cannot be attained by the weak'.

The Upanishads can be taught only by an enlightened strong man. When any person came to Swami Vivekananda saying – 'Swami, I want to renounce everything', Swamiji looked at him and said: First tell me what have you got to renounce? Neither a good physique, nor a good intellect, and there is not even sufficient money in your pocket. What do you think you can renounce? A beggar cannot renounce as he has nothing to give up. First acquire something, then think of renouncing that.

So the Upanishads always encourage us to develop strength. But what type of strength? Not just muscular strength, but along with that, inner strength, spiritual strength. These are the virtues which our modern youths are very much fond of. They want an adventurous life. And you find in the message of the Upanishads a powerful call to be bold and dauntless in the pursuit of truth.

Another important and beautiful trait of the Upanishads is that here you find students are always encouraged to ask questions that would strengthen their spiritual life either as a householder or a monk. In the Vedic times, when students completed their studies at the ashrama of the Guru and were about to go back to worldly life, the teacher would give a beautiful sermon regarding ways of conducting life. He would say, 'Satyam vada/ Dharmam cara/ Svādhyāyāt mā pramadah/ Mātridevo bhava/ Pitridevo bhava/ Acāryadevo bhava/ Atithidevo bhava/… Shraddhaya deyam/ Ashrāddhaya adeyam/ Shriyā deyam/ Hriya deyam/ Bhiya deyam/ Samvida deyam/…' That is, 'Speak the truth. Practise *dharma* or righteousness. Do not deviate from study. Let your mother be a goddess unto you. Let your father be a god unto you. Let your teacher be a god unto you. Let your guest be your god. Whatever you give to others should be given with reverence, not disrespectfully. Give according to your capacity, with modesty, fear and sympathy.' The Vedic Rishis conveyed these profound ideas at the time of the convocation. This convocation address is not like the modern convocation address where you are encouraged to earn more and more money and then you go to America to fulfil your desires.

Practical and useful

Another important aspect of the Upanishads is that it is not just a theory. It is something practical and useful in our day-to-day life. That is why Swami Vivekananda called it 'Practical Vedanta'. That is to say Vedanta is very much practical and workable. A little more than a hundred years ago Vedanta was confined to the forest hermitage and discussed by some highbrow intellectuals. But Swami Vivekanada brought it to the level of common man's understanding and made it Practical Vedanta which everyone could follow. Vedanta, in fact, is very simple, as simple as knowing oneself, but unfortunately dry scholars make them complicated and the result was that average people were unable to understand the message of the Upanishads. It was left to Swami Vivekananda to bring these profound ideas down to the practical level and give them to one and all including the youth.

I tell you an incident. There was a young man who had a very bad habit of tearing whatever paper he got to hand, whether it is a currency note, a promissory note, a newspaper, or anything. He would just tear them to pieces. His parents were naturally very much worried. They confined him to a room where no paper was available. Ultimately they took him to many doctors in Dubai and America, but in vain. They came back disappointed. Lastly they brought him to a psychiatrist. After hearing all about the patient, the doctor said that he would like to talk to their son in private. So the parents waited outside while the doctor discussed with the boy about his problems. After five to ten minutes the boy came out cured! The parents wondered how that miracle could happen! They spoke to the doctor saying that they were extremely happy and thankful that their boy was cured. But they wanted to know how the doctor made it possible without prescribing any medicine or exercise. The doctor said that he just pointed out to their son that he had a bad habit and that he should give it up. Previously no one had pointed it out to him. And the young man indeed gave up the bad habit of tearing all sorts of paper.

Similarly, often we make things complicated when we try to expound our views on the teachings of the Upanishad. Consequently the simplest truths get cloaked in a shroud of logic-chopping so such so that the entire thing becomes frightening and finally we say this Vedanta is not meant for us; it is meant only for the sannyasins and those who stay in the Himalayas. No. Vivekananda brought this message

from the Himalayan heights and put in simple words which he said even a child can digest.

Another quality you find in the Upanishads is that they take you like an affectionate mother from where you are, from the lower level of truth to the highest step by step. They never discourage you that you have done something wrong. They never tell you are a despicable sinner. No, they say you are the children of Immortal Bliss. Vivekananda gave this message in his innumerable lectures in the West. Quoting from the Shvetashvatara Upanished he said in thundering voice,

'Shrinvantu vishve amritasya putrā
āye dhāmani divyāni tasthuh/
Vedahametam purusham mahantam
adityavarnam tamasah parāstat/
Tameva viditva atimrityumeti
nanyah panthā vidyate ayanāvya/'

What a glorious statement from the Upanishad! The Rishi says, he has realized the Truth and we too can realize that. Come on, let us go together to the great adventure. This type of expression you find only in the Upanishads. 'Upanishad' literally means sitting near an enlightened teacher for learning the great truths which loosen our bondage and take us to the destination of freedom. Vivekananda therefore said that man travels not from error to truth, but from lower truth, to the highest truth and the goal of religion is to make man conscious about his divine nature. That realization is the ultimate goal. The Upanishads persistently drum into our ears: Be free, be free, be free. Unfortunately, today's youths give a wrong interpretation of the word 'freedom'. Many of them think freedom implies the freedom of the senses. No, it means freedom from the senses. We have to go beyond the sense level and attain to that highest level.

In its invocation the *Kenopanishad* says, 'Apyāyantu mamāngāni vāk prānascaksuh shrotramatho balamindriyāni ca sarvāni' – 'May my limbs, speech, vital force, eyes, ears, as also strength and all the organs, become well developed'. Buddha first weakened his body and along with that all his senses. But then he realized that with the help of weak limbs and emaciated body he would not be able to attain the highest truth. So he followed the *madhya pantha* – the middle path.

The *Kathopanishad* gives the beautiful example of the horses. The horses, it says, should be strong but at the same time well in control. If the horses are weak you cannot undertake a journey. If they are strong but uncontrolled, then also you cannot reach your destination. The man who has no control over his sense organs will never reach the goal. But the path of one who has controlled his sense organs will be smooth and he will attain the goal without much difficulty.

So the Upanishads always encourage us to have a positive attitude towards life. Unfortunately, some youths are going astray nowadays by thinking that they would get strength from drugs, drinks, etc, and by doing so they are slowly weakening their senses, mind and running the prospect of the whole journey. Many road accidents take place in Hyderabad near the Hussain Tank. Police have found out that it was due to reckless driving by drunken drivers. Likewise many accidents take place at other places. This proves that our senses are to be kept under control by proper training so that we can undertake a beautiful and adventurous journey in life. The Upanishads therefore convey many such great ideas in a very rational, powerful, and convincing way. Vivekananda also says again and again that if modern youths study this Vedantic literature, there will be tremendous qualitative change in their outlook that will finally lead them to real freedom. We all are interested in enjoying freedom but we do not know where we can find it. We think we will get freedom by enjoying unbridled sense pleasures. But we must bear in mind what Yayāti said, 'Na yātu kāmāh Kāmān upabhogena shāmyati/ Havishā Krishnavartmeva bhuya evābhivardhate//' – 'Desire is never satisfied by enjoyment. On the contrary, just as fire is increased when butter is put on fire, desire is always intensified by enjoyment of the senses.'

This article is based on a lecture by Swami Paramarthananda, Adhyaksha, Ramakrishna Math, Hyderabad, delivered at the Ramakrishna Mission Institute of Culture on 9 June 2001.

> Go back to your Upanishads – the Shining, the strengthening, the bright philosophy – and part from all these mysterious things, all these weakening things.
>
> — Swami Vivekananda

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

অধিকন্তু ন দোষায়

প্রব্রাজিকা নির্বাসনাপ্রাণা (প্রাক্তন ছাত্রী)

আমার জীবনে যৎ-সামান্য যা একটু কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, তা সব সময়েই অধিক বিলম্বে। সে কারণ শিক্ষিকার বয়স নিয়ে যেদিন শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হয়ে চপলমতি কিশোরী দলের মাঝে গিয়ে বসলাম, সে দিনের স্মৃতিচারণায় মনে পড়ে, এই বালসুলভ আড্ডা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মনে হয়েছিল, সব আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়ে ক্লাস থেকে ছুটে পালিয়ে আসি আমি আমার অভ্যস্ত জীবনের পরিচিত গণ্ডীর ভেতরে। অনেক কষ্টে, অনেক বিচারে মনকে সেখানে বসিয়ে রাখতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার মন বসে গেল এই উজ্জ্বল কিশোরী কুলের উজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে।

স্কুল জীবনে প্রবেশ করে এতগুলি আনন্দ মুখর সহপাঠিনী পেয়ে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কোথা দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি তিনটি বছর তা বুঝতেও পারিনি কোনদিন স্কুলে জীবনে থাকা কালে। টেষ্ট দিয়ে যে দিন স্কুল থেকে বেড়িয়ে এলাম, সে দিন মনে হয়েছিল, এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল স্কুল জীবন! এই তো সেদিন ভর্ত্তি হোলাম স্কুলে। স্কুলের গণ্ডী বার হয়ে মানুষ প্রবেশ করে বৃহত্তর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিদ্যালাভের সাথে বিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার রসাস্বাদন করা যায় একমাত্র স্কুল জীবনেই। স্কুল জীবনের স্মৃতি চিরদিন তাই সকলের কাছেই মধুময়।

রাজ রজত-জয়ন্তীর এই উজ্জ্বল আলোয় বিদ্যালয়ের গোড়ার কথা মনে পড়ায় প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী পরমপূজ্যা মাসীমা (মীরা দেবী) ও বাণীদির (বাণী দেবী) তেজোদ্দীপ্ত সেই নির্মল মুখচ্ছবি, আর কানে বাজছে তাঁদের সমগ্র জীবন ব্যাপী সুকঠিন সাধনার মূল-মন্ত্র। অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে দেশের মেয়েদের কাছে আলোর জগৎ খুলে দেবার জন্য আজীবন

সংগ্রামী মাসীমা ও বাণীদি জীবনের সায়াহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন এই 'শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়'। তাঁরা যে দেশে সর্ব্বস্তরের মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার মহামন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন জগন্মাতার নির্দ্দেশে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখে গিয়েছেন আমার মত পরিণত বয়সের মেয়েদের কাছে বিদ্যালয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে।

পূজনীয়া মাসীমা, বাণীদির নির্দ্দেশে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে সেখানে দিদিদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, অপরিমেয় সহানুভূতি ও ভালবাসা। আমাকে ক্লাসের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সকল দিদিরা করেছেন আন্তরিক প্রচেষ্টা। বয়সের আধিক্য হেতু প্রশ্নেরও আধিক্য ছিল আমার সকলের অপেক্ষা বেশী। কিন্তু আমার এই দৌরাত্ম্য হাসিমুখে সহ্য করে দিদিরা যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতেন সব সময়। এ বিষয়ে সে সময়ে সকলের বিশেষ সহায়িকা ছিলেন ধীর, শান্ত সংযমী রমাদি।

বিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ তখনকার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পূজনীয়া ঊষাদির আবির্ভাবে সমস্ত বিদ্যালয়ের ধমনীতে যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলে যেত সেই সময়। অতি প্রিয় কন্যা সম ছাত্রীদের মনে অঙ্কের সঙ্গে সুশৃঙ্খল নিয়মের রেখা এঁকে দিতে কাঁটা কম্পাস হাতে নিয়ে দুই বিভাগে গণিতের ক্লাসে ঢুকতেন ঊষাদি ও অনিলাদি। মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের মত স্থির হয়ে যেত সমগ্র ক্লাস তাঁরা ক্লাসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে।

সে সময় ঊষাদির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা সহ-প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রাণুদির সুউচ্চ, সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সকলকে স্মরণ করিয়ে দিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনের কথা। সর্ব্বদিকে শৃঙ্খলা রক্ষার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে রাণুদির ভূমিকা বিহীন সহজ সরল পাঠ দানের কৌশল ছবির মত ফুটিয়ে তুলত পাঠ্য বিষয় ছাত্রীদের চোখের সামনে।

পঁচিশ বছরের পূর্ণ প্রদীপটি জ্বলে ওঠার পূর্ব্বক্ষণে নিভে গেল যে শোভাদির জীবন প্রদীপ, শিশুমনকে জয় করার ছিল বিশেষ দক্ষতা সেই শোভাদির। বিদ্যালয়ের শৈশব কালে অবিভক্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিভাগের কর্মক্ষেত্রে শিশুকূলকে অপার স্নেহে বশীভূত করে তাদের করে তুলতেন পাঠাভিমুখী। মাধ্যমিক বিভাগেও সূচী-শিল্পের ক্লাসে তিনি কাঁচা হাতে ফুটিয়ে তুলতেন নিপুণ শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

স্মৃতির পাতা খুলতে গিয়ে কত চিত্রই না চোখের সামনে ভেসে উঠছে আজ! তখনকার সেই অলঙ্করণ বিহীন শিশুবিদ্যালয়ে এক একটি করে জিনিস আসে, আর সারা বিদ্যালয়ে যেন উৎসবের সাড়া জেগে ওঠে। এমনি ভাবেই একদিন টেবিল থেকে 'টাইমপিস' সরে গিয়ে দেওয়ালে বসল বড় ক্লক, ছোট হাত ঘণ্টার বদলে ঝুলতে লাগল বড় ঘণ্টা। একে একে আসতে লাগল টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি; এলো ফোন, এলো পাখা, পাখা নিয়ে দেখা দিল মহা সমস্যা। মাত্র ২ খানা পাখা, এতগুলি ক্লাস ঘরের মধ্যে কোথায় টাঙ্গান হবে, —বসল মাসীমা বাণীদির ঘরে আলোচনা সভা, আলোচনান্তে স্থির হলো দশম শ্রেণীর মেয়েরা স্কুল ছেড়ে চলে যাবে তাই সর্ব্বপ্রথম তারাই পাবে পাখা। এমনি করে একদিকে, এক একটি প্রয়োজনীয় জিনিস এনে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঊষাদি বিদ্যালয়কে করে তুললেন সুসজ্জিত ও সুশোভিত, আর এক দিকে বিদ্যালয়ের সব দিদিরা মিলে তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সুপ্রশস্ত করতে লাগলেন বিদ্যালয়ের অগ্রগতির পথ।

পুরান সেই দিনের কথায় মনে পড়ে, চেহারায় মাতৃত্বের মাধুর্য্যমাখা গাম্ভীর্য্য নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন গৌরীদি। তাঁর পাঠ্য বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মাতৃ হৃদয়টি মেলে ধরে কথাচ্ছলে খোঁজ নিতেন টিফিনের ঘণ্টায় কে কি খায়? কারও সঙ্গে টিফিন না থাকলে কৌশলে তা জেনে নিয়ে ক্লাস ছেড়ে যাবার সময় দরদ-ঢালা কণ্ঠে বলে যেতেন, ''বন্ধুরা সকলে মিলে এখন টিফিন ভাগ করে খাও।''

দশম শ্রেমীর ভূগোল ক্লাস, — পাঠ চলছে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর গাছপালা উদ্ভিদ প্রভৃতি সম্বন্ধে। প্রসঙ্গক্রমে উঠল খুবানী ফলের কথা। সে ফল, ক্লাসের সব মেয়েরই অজানা। সুতরাং সে ফল কেমন, কৌতূহলী কণ্ঠে সকলে প্রশ্ন করায় পুরান ইলাদি স্মিতমুখে বললেন, কেউ দেখনি তোমরা খুবানী ফল? মেওয়া ফলের দোকানে পাওয়া যায়; আচ্ছা আমি তোমাদের একদিন এনে দেখাব এই ফল।

প্রতীক্ষার অবসান, —পরবর্ত্তী ভূগোল ক্লাস, —কাগজের একটি বড় ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকে ঠোঙ্গাটি টেবিলের উপর রেখে, যথারীতি পাঠ দেওয়া নেওয়া সেরে ক্লাস ছেড়ে যাবার আগে ঠোঙ্গা থেকে একটি খুবানী ফল বার করে সকলকে দেখিয়ে ঠোঙ্গাটি এগিয়ে দিয়ে, ''সকলে ভাগ করে খাও বলে হাসি মুখে দ্রুত পায়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ইলাদি। সমগ্র ক্লাস উল্লাসে মেতে উঠে মুহূর্ত্ত মধ্যে খেয়ে শেষ করে দিল এক ঠোঙ্গা খুবানী। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি টিফিনের ছুটীর ঘণ্টার কলরবে মিশে যাওয়ায় কেউ টেরও পেলনা, কত গভীর স্নেহের পরশ লাভ করল এই ক্লাসের মেয়েরা। আজও দেখি, ইলাদিকে ধীর পায়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু এর পর আর কেউ খুবানী ফল মুখে পুরে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে কিনা তা জানা হয়নি আমার।

চিরশান্ত বিভাদির অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান ক্লাসটি সকলের কাছে ছিল যেন অঙ্কের কোচিং ক্লাস। অঙ্কে সমস্যা দেখা দিলেই ঘিরে ধরা হতো বিভাদিকে। বিভাদিও একের পর এক অঙ্ক কষে— নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেন সকলের সমস্যা সমাধান করে দিয়ে।

সব দিদিদের মাঝ থেকে অকালে হারিয়ে যাওয়া শ্যামলীদির কথা ভোলা যাবে না কোনদিন স্কুল-জীবনের স্মৃতি থেকে। বিদ্যালয়ের কাঠামো তখন বড় হলেও অলঙ্করণে রয়েছে তার প্রচুর অভাব। বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী শ্যামলীদি এসেই পাননি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী। শুধু মুখে বিজ্ঞান বুঝিয়ে তৃপ্তি পান না এই নবীনা বিজ্ঞান-সাধিকা। পাঠ্য বিষয়ের বাস্তব রূপ দেখিয়ে ছাত্রীদের সামনে বিজ্ঞানের স্বরূপ পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর। সেদিনের পাঠ্য বিষয় ছিল 'কলিং বেল'। শ্যামলীদি ক্লাসে এলেন হাতে নিয়ে একটা কলিং বেল। পূর্ব্ব দিনের পাঠ ধরে— যখন বেলটি নিয়ে দেখাতে লাগলেন তার কল-কৌশল, তখন সকলেই বেঞ্চ ছেড়ে টেবিলের চারপাশে ঘিরে ধরল তাঁকে। তিনিও মহানন্দে বেলটি বাজিয়ে বাজিয়ে বোঝাতে লাগলেন কেমন করে শব্দ বেজে

ওঠে যন্ত্রের সাহায্যে। বোঝান পর্ব্ব শেষ হলে শুরু হলো মেয়েদের বেলটি বাজিয়ে দেখার পালা। ক্লাসের এতগুলি আনাড়ী হাতের টিপুনীতে অচিরেই হলো কলিং বেলের কণ্ঠরোধ। ভীত, সন্ত্রস্ত মেয়েরা নামিয়ে রাখল যন্ত্রটি টেবিলের উপর। আর তখন, —সে কি এক অসহায় বেদনামাখা মূর্ত্তি শ্যামলীদির! রাগে, দুঃখে, ব্যথায় মুখ লাল করে আর্ত্তকণ্ঠে শুধু বলে উঠলেন, '' এখন আমি ঊষাদিকে গিয়ে কি বলব? কত করে ঊষাদিকে বলে কিনে আনলাম বেলটি, আর তোমরা একদিনেই শেষ করে দিলে তাকে। আর কিছু এনে দেখাব না তোমাদের কোনদিন।'' শ্যামলীদির অবস্থা দেখে সমস্ত ক্লাস আত্মগ্লানিতে হয়ে রইল নিশ্চুপ।

স্নেহ চিরদিনই গতিশীল। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রঙের প্রতিফলন বোঝাতে কাঁচের প্রিজম হাতে নিয়ে ক্লাসে এলেন শ্যামলীদি। পাঠ্য-বিষয় ছাত্রীদের মনে রসের সঞ্চার করতে শ্যামলীদির ছিল এই ভাবের অদম্য উৎসাহ।

নিত্যকার যাওয়া আসার পথে সেদিন চোখে পড়ল, দোতলার হলঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন নূতন পুরান অনেক দিদি। সবার শেষে বেলাদি চলেছেন ধীর পায়ে নীচের দিকে। একটি মেয়ে ছুটে এসে আবদারের ভঙ্গীতে বেলাদিকে কিছু বলায়, বেলাদি তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তার সঙ্গে আবার ফিরে গেলেন হলঘরে। এই দৃশ্য দেখা মাত্র মনের মধ্যে ভেসে উঠল ২৪ বছর আগেকার বেলাদির ছবি। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে যেমন ভাবে সকলকে ভরিয়ে তুলতেন বেলাদি আরও তেমনি ভাবেই মেয়েদের ডাকে হাসিমুখে সাড়া দিয়ে চলেছেন সর্ব্বজনপ্রিয় সেই বেলাদি। কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ছাত্রীদের মাঝে বেলাদি রয়েছেন চির নবীন, চির-সজীব!

২৫ বছরের পথ পরিক্রমায় এই বিদ্যালয় জীবন ইতিহাসে হয়েছে কত পট পরিবর্তন। আমরা বেরিয়ে এলাম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে; তারপরই শিক্ষা-জগতে হলো আমূল পবিবর্তন। এল হায়ার সেকেন্ডারীর যুগ। এই বিদ্যালয় নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে হলো বহুমুখী বিদ্যালয়। ঊষাদির অদম্য প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে মাথা তুলে দাঁড়াল সায়েন্স বিল্ডিং। মূল্যবান যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজান হলো ল্যাবরেটরী। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রী ধরে না। সকলেই হতে চায় বিজ্ঞানী। কিন্তু হায়! সব প্রচেষ্টা সরিয়ে দিয়ে অচিরেই ফিরে এলো আবার মাধ্যমিক। শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারী নীতির বহুবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন পরিচালনার জগতেও হয়েছে কত রূপ পরিবর্ত্তন। বিধাতার নির্ব্বন্ধে জাগতিক-কার্য্য শেষ করে শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা বাণীদি মাতৃধামে মহাপ্রয়াণ করায়; সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন পূজনীয়া ঊষাদি। ঊষাদির শূন্য আসনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে এলেন রেবাদি। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে বজ্রমুষ্টিতে হালটি ধরে রেবাদি তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বিদ্যালয়টিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

অতীতের পৃষ্ঠা খুলে লিখতে বসে, লেখার কলেবর ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে নানান কথার ভীড়ে। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রী হয়ে প্রবেশ করে আমি অনেক পেয়েছি— স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি সকলের কাছ থেকে। কিন্তু তার উপর অধিকন্তু যা পেয়েছি, তা অনন্য হয়ে আছে আমার বিদ্যালয় জীবনের ইতিহাসে। বিদ্যালয় জীবনে থাকাকালে ছাত্রীর প্রাপ্য মর্য্যাদা, ভালবাসা সকলেই পেয়ে থাকে স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু এই স্বাভাবিক লাভের সঙ্গে ছাত্রীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর চরণপদ্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজার অধিকার লাভ আমার এ নগণ্য জীবনমাঝে এক পরম সৌভাগ্য লাভ।

চলমান জীবন পথে, মাঝে মাঝে যখন স্মরণে আসে আমার বিদ্যালয় জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির কথা, তখন মনে হয়, এই অধিক লাভটুকুই জীবনের পরম পাথেয় হওয়ায় আমার জীবন ধন্য হয়েছে এই সারদাপীঠের বেদীমূলে।

> যারা ভাবে যে, কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

শ্রীশ্রীসারদা মন্দির দ্বারে

জ্যোতির্ম্ময়ী সরকার

মহাকাল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবরূপে কবে এই জীবনের বিশ্ব-পরিক্রমা সুরু হইয়াছিল মনে নাই। কত তরঙ্গভঙ্গ ও আবর্ত্তের মধ্য দিয়া এই জীবনের রূপায়ন চলিয়াছে এই ব্যক্ত জগতে, তাহা এই স্মৃতির পটে ভাসিয়া ওঠে না। কবে হইতে এই জীবন বোধে ''আমিত্বের'' উন্মেষ তাহা কে বলিতে পারে। কবে কোন বিচিত্র গতিপথে কতদিকে কি ভাবে এই পথ-চলার পরিসমাপ্তি তাহাও জানিনা। সব কিছুই যেন বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু হারায় নাই। কোন দিন ধ্রুবাস্মৃতি জাগরিতা হইলে সব কিছুই প্রয়োজন মত জানিতে পারিব; এ বিশ্বাস হইয়াছে।

এই বারের মত এই যুগে পৃথিবীতে আসিয়াছি এইটুকুই মাত্র বলিতে পারি। ভাঙ্গাগড়া, ঘাতপ্রতিঘাত, সুখ-দুঃখের বহু অভিজ্ঞতা হইতেছে। কোনও এক রহস্যময় উপায়ে ইহারই মধ্য দিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে। পথনির্দ্দেশও পরিষ্কার হইতেছে প্রতিটি পদক্ষেপে।

এমনই ভাবে একদিন পাইলাম আমি যেন শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। শ্রীগুরু-কৃপা ইহার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা চরণে আমাকে সমর্পন করিয়া দিয়াছিলেন। সে বহুকালের কথা। কিন্তু আমার যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপার অমৃতস্পর্শের ধারায় অভিষিক্ত হইয়া জীবনকে সার্থকভাবে গড়িয়া তোলা। সর্ব্বক্ষণ এই কথাই অনুভব করি। শ্রীগুরুকৃপা আমাকে সেই ভাবেই ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিতেছেন। ঘটনাচক্রে আমি একদিন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র শিষ্যা পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী ঁমীরা দেবী ও ঁবাণী দেবীর সঙ্গে পরিচিতা হইয়াম। তাঁহারা আমাকে সুগভীর স্নেহে তাঁহাদের নিবিড় সান্নিধ্যে টানিয়া লইলেন। ক্রমেই অনুভব করিতে লাগিলাম মাতৃকৃপার স্বরূপ। তাহার গভীরতা অতলস্পর্শী, প্রসার ও বিস্তার আদিঅন্তহীন। তাঁহাদের মাধ্যমেই শ্রীসারদা আশ্রমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে বহুবৎসরের কথা।

কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে একটি পল্লী ছিল নিউ আলিপুর নামে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বসতি ছিল বিরল। ইহারই একটি অংশে আমাদের বসত বাটিটি নির্ম্মিত হয়। সেই বাটিতেই সেই হইতে আছি। শ্রদ্ধেয়া ঁবাণীদি একদিন বলিলেন, ''মাঠাকুরণকে একটি নিজস্ব বাড়িতে বসাব। সকলে জমির খোঁজ করুন।'' তখন তাঁহারা ভবানীপুরে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। নানাদিকে চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই অনেকখানি জায়গা পড়িয়াছিল মিলিটারিদের দখলে। ভাঙ্গা ট্যাংক ও যুদ্ধের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সমেত সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া নাতিউচ্চ ঘন জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছিল। একদিন সেইজমিই পছন্দ করিলেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ। আশ্চর্য্য যোগাযোগ! আমরা ঘরে বসিয়াই সব লক্ষ্য করিতাম। কোন এক রহস্যময় ইচ্ছায় আমরাও কোনও কোনও কাজে যুক্ত হইয়া পড়িলাম। ক্রমে আশ্রম অন্তর্গত বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবনটি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু যেরকম আকাঙ্ক্ষা তাহা করিতে তো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাহা কোথা হইতে আসিবে? ত্যাগব্রত ধারিণী সন্ন্যাসিনী মায়েদের ভাণ্ডার তো শূন্য। ঁমীরা দেবী ও ঁবাণী দেবীর স্থির বিশ্বাস শ্রীশ্রীমায়ের কাজ, অর্থ তিনিই সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহাই হইল। যিনি আসিয়া অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে হাল ধরিলেন এবং এই লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হইতে

লাগিল আর আমরা বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে সব দেখিতে লাগিলাম, সেই বিশেষ শ্রদ্ধেয়া মহিলা এইসব ব্যাপারে হাল ধরিয়া আছেন আজও। ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রাম ক্লান্ত এই মাতৃসমা মহীয়সী মহিলা, কি তাঁহার পার্থিব পরিচয় যথাসময়ে জানিবে সকলে। মনে শুধু জাগিয়া ওঠে মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট ও তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া মাতৃচরণে মনপ্রাণ নিবেদন করিয়া নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে যিনি সেবিকা রূপে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, অসাধ্য সাধন করিতেছেন তিনি একজন গৃহস্থাশ্রমী।

দুই এক বৎসরের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদালয় ও ছাত্রী ভবনটি নির্ম্মিত হইল অতি সুচারু ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। আশ্রমের বিদ্যালয় ভবন তো হইল। এইবার প্রতিষ্ঠাত্রী দুইজনের জীবনের স্বপ্ন— শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা অবলম্বনে মেয়েদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে বর্ত্তমান যুগকে মনে রাখিয়া। তাহাও আরম্ভ হইল ছাত্রী নিবাসের কয়েকটি বালিকাকে লইয়া অতি অনাড়ম্বর ভাবে। তখন কেহ তাহা বুঝিতেই পারিল না। আশ্রম ও বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইল কয়েকটি সন্ন্যাসিনী ও দুই তিনটি ব্রহ্মচারিণীর পরিচালনায়। ভবিষ্যতের কর্ম্মভার সবই থাকিবে মহিলাগণের হাতে। এই আশ্রম ও বিদ্যালয় হইবে ধর্ম্মভিত্তিক। সেই অনুসারেই আইন বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া Constitution রচিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছিল। চলিতে লাগিল এই বিরাট কর্ম্মকাণ্ড। আত্মপ্রচারের ধুমধাড়াক্কা নাই, আত্মবিজ্ঞপ্তির দৃষ্টিকটু প্রচেষ্টা নাই। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে নিবেদিত প্রাণ কয়েকটি মহিলার নীরব তপস্যা। তাঁহারই পূজার উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল কঠোর কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঁমীরাদেবী ও ঁবাণীদেবীকে বলিয়াছিলাম, আমি তাঁহাদের আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী মনে করি নিজেকে; দরজায় বসিয়া অনেক দেখিতেছি অনেক পাইতেছি জীবন গঠনের অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা। তাঁহারা আপত্তি করেন নাই। বলিয়াছিলেন— ''তুমি আমাদের 'দারোয়ান'—অনেক দেখিতেছ অনেক বুঝিতেছ।'' তাঁহাদের স্নেহমাখা এই কথা কটি মনের গভীর গাঁথিয়া গেল। ইহার গুরুত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা আজও করি। মাতৃকৃপার আলোকে নিজের জীবন সম্বন্ধে আচ্ছন্নতা, অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূরীভূত হইতেছে। আত্মতত্ত্বে বিশ্লেষণ সহজ হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ্যে পৌঁছিবার শক্তি আমার মত নগণ্য মানুষেরও লাভ হইতে পারে এ বিশ্বাস জাগিতেছে। যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া এই আশ্রম ও বিদ্যালয় হইতে আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করিতেছি তাঁহারা সকলেই আমার নমস্য।

আজ সেই শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়য়ের পঁচিশ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব আরম্ভ হইল। অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের আঘাত আসিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের বাধাবিপত্তি ও বেদনাময় সংঘাত আজও আসে। এই ব্রতধারিণীগণ স্থির দৃঢ় পদে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণতা দানের প্রতিজ্ঞায় আত্মবিশ্বাস ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া ধীরে সাবধানে অগ্রসর হইতেছেন। দ্বারে বসিয়া আমি তাহাই দেখিয়া চলিয়াছি, ও কিছু শিখিবার চেষ্টা করিতেছি।

এইবার জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শ্রীশ্রীমা হাতে ধরিয়া যেন লইয়া আসিতেছেন সারাটা পথ অতি যত্নে অতি স্নেহে কখনও রুদ্রাণীরূপেও দেখা দিয়াছেন আমাকেই সংশোধন করিবার জন্য। তাই তো তিনি আমাদের 'মা' সত্যকারের 'মা'। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, এই তিনেরই অনুশীলন মা দেখাইতেছেন এই আশ্রম ও তৎ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। পরম চৈতন্য রূপিনী মহাশক্তি স্বরূপিনী শক্তি আনন্দ বিধায়িনী শ্রীশ্রীমা 'সারদা মহাসরস্বতী'। তিনি বিশ্বের বিদ্যালয়ে আমাদের প্রবেশাধিকার দিয়াচ্ছেন। যাহাকিছু জানিবার জানিতে পারিব, যতটুকু করিবার শক্তি ঠিকই আসিবে। অফুরন্ত স্নেহ প্রেম ঢালিয়া দিতেছেন। যত অভাব সব ঘুচিয়া যাইবে। পূর্ণতার আস্বাদ পাইয়া তাঁহারই হইয়া যাইবে আমাদের সত্ত্বা।

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ইতিহাস কালের পটে নির্ভুল ভাবে লিখিত হইয়া যাইতেছে সকলের অলক্ষ্যে। যাহার যতটুকু দেখিবার সে ততটুকুই দেখিবে, যে ভাবে বুঝিবার সেই ভাবেই বুঝিবে। যে কাজ চলিতেছে তাহার অপরিমেয় প্রভাব জনে জনে অনুভব করিবে। ভবিষ্যতের মানুষের জন্য তাহা রহিল।

আজ শুভদিনে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শ্রীমায়ের পদতলে প্রণত হই এবং প্রার্থনা করি 'মা আমাদের ''মানুষ'' কর।' মৃত্যুঞ্জয়ী মাতৃনামের মহামন্ত্রে ঋংকৃত হউক আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র আধার। ধন্য হই আমরা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

> এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা। পিছনে তাকিও না। কে পড়ল দেখতে যেয়ো না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এই ভাবেই আমরা এগিয়ে যাব— একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান অধিকার করবে।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের উন্নতি— ধর্মে আঘাত না করে

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

ভারতের যা কিছু উন্নতিবিধান করতে হবে তা ধর্মে আঘাত না করে— স্বামী বিবেকানন্দের এ কথাটি আজকের যুগে আমাদের চিন্তিত করে তোলে। স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক আমরা। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের রাষ্ট্রের ভাবনা। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি সর্বাগ্রে আমাদের বুঝতে হবে, আর তার সঙ্গে ভারতের জীবন ও চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য কি তা জানতে হবে।

সুদীর্ঘ একষট্টি বছরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা ভারতীয় জীবনলক্ষ্য এবং লক্ষ্যাভিমুখী জীবনধারার ক্রমবর্ধমান পরিণতি কী হতে পারে তা আমরা বুঝে দেখিনি। ভারতের জীবন ও চিন্তাধারার যে বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আগামী সহস্রযুগেও যা থাকবে, তার আরও উৎকর্ষ-সাধিত হলে ভারতই ভাবীকালে সমগ্র পৃথিবীর জীবন ও ভাবনায় নায়কত্ব গ্রহণ করবে এ কথা স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি' নামক গ্রন্থে অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন—''পশ্চিম অধুনা প্রবল হইলেও সত্যকার 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত নয়। 'স্বারাজ্য' কেবলমাত্র রাজনীতি বা অর্থনীতিক্ষেত্রে হইলেও চলিবে না, আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য— যে স্বারাজ্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, মানসিক (Cultural) এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যথার্থভাবে, পূর্ণভাবে আনিয়া দিবে, অথচ সে নিজে এ সকল একপেশে আংশিত স্বাধীনতার চাইতে বড় এবং অংশগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ, এবং প্রত্যেকটার প্রকৃতির নিয়ামক। আমাদের দেহে মুখ্যপ্রাণ যে আসন অধিকার করিয়া আছে আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য সেই আসন অধিকার করিবে। অবয়বগুলির নিজের নিজের আলাদা 'প্রাণ' আছে; কিন্তু সকলের নিয়ামক (organiser) রূপে একজন কেহ তাহাদের ওপরে না থাকিলে তাহারা কেহই পূর্ণ ও চরিতার্থ হয় না, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধও সুসমঞ্জস হয় না। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে— ''স যাবদাদিত্য উত্তর ত উদেতা দক্ষিণতো হস্তমেতা দ্বিস্তাবর্দধং স্বারাজ্যং পর্যেতা''— এই আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য (Spiritual autonomy) এমন একটা জিনিষ যেটা থাকিলে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিকও শিক্ষাদীক্ষাগত স্বারাজ্য যথার্থভাবে ও মাত্রায় থাকে, আর যেটা না থাকিলে, তাদের ভাব ও মাত্রা দুই ই অসত্য হয়, যেমন সলভেন্মি প্রভৃতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনেকে ভাবিতেছেন, এবং পরস্পর পরস্পরের সাধক না হইয়া অনেকক্ষেত্রে বাধক হইয়া দাঁড়ায়।'' ইতিহাস ও অভিব্যক্তি— পৃঃ ৩৬৬ (স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ)

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে একটা জাগরণের ঢেউ এসেছে। প্রাচ্যে কোন কোন দেশ বেশী জেগেছে, কোন দেশ জাগবার মুখে। যে সকল দেশে জাগরণের সাড়া এসেছে তাদের পক্ষে সাবধানতাও দরকার। পশ্চিমের ধাঁচে সাজসজ্জা যতই হোক না কেন, অস্ত্র শস্ত্র যতই রক্ষিত হোক, ভারতের পক্ষে অপর জাতির অনুকরণ কখনই শুভ নয়। কোন অর্থনৈতিক সম্পদের বিনিময়ে ভারতবর্ষ তার বৈশিষ্ট্য বিকিয়ে দিতে

পারেনা। বহুযুগব্যাপী যে তপস্যার মূলধন ভারতে আছে, তাকেই প্রধানতঃ ভিত্তি করে, কিছু পশ্চিমের ধরণ গ্রহণ করা চলে। জাতীয় আদর্শটি ভারতের অক্ষুণ্ণ থাকলে একদিন ভারতই প্রতীচীর কর্ণধার হতে পারবে।

আজ সেই ভারতের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের যোগসূত্রটি যেন নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিমের ধাঁচে সবটাই করতে হবে এই ভ্রান্তির একটা যুগ চলেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে, প্রাণের যথার্থ শান্তি ও আনন্দের সন্ধান দেবার জন্য এই ভারতভূমিকেই পৌরহিত্য করতে হবে বিশ্বের যজ্ঞশালায়।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বল্লেন— তা বস্তুতঃ ভারতে যথার্থ জাতীয়তাবাদ। মানুষের অন্তর্বহি দুটি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের নতুন পন্থা নির্ধারণ নীতি। ভারতের জীবন লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রের উন্নতি এই জীবন লক্ষ্যকে কেন্দ্রবিন্দু করেই করতে হবে। তাই স্বামীজী বলছেন— ধর্ম বিন্দুমাত্র আঘাত না করে উন্নতির কথা ভাবতে হবে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই এতদিনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং আজও এ সংস্কৃতি সজীব ও সমৃদ্ধ। বেদান্তের মূল তত্ত্বই ভারতের জীবনবোধের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন— 'All philosophical Speculation came to an end when' 'তত্ত্বমসি' was discovered. সব দার্শনিক তত্ত্ববিকার শেষ হয়ে গেল যেদিন 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব ঋষিরা আবিষ্কার করলেন। আর তো নতুন কিছু হতে পারে না— 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'— জীব ব্রহ্মই আর কিছু হয় না। কিন্তু জীবের মধ্যে এ বোধের অভাব কেন? সে অচেতন বলে, তাকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতিগুলিকে যুগোপযোগী করে ধর্মের ভেতর থেকে বহু শতাব্দীর আগাছা দূর করতে হবে। সুদীর্ঘকালের পরবশ জাতি আমরা। ধর্ম বলতে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান বুঝি, কতকগুলি বাহ্য নিয়মনীতি অনুসরণ করা বুঝি, ধর্ম বলতে যে সনাতন দিব্যসত্তার উন্মেষ বা বিকাশ তা আমরা জানি না। মানুষ এ দিব্য সত্তার অধিকারী — 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— বলে ঋষিকুল তাকে সম্বোধন করলেন। তাই স্বামীজীর মতে শরীর সুস্থ রেখে, মনের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থরতা দূর করে, চরিত্রবলের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ তার নিজের অধ্যাত্ম সত্তা উপলব্ধি করবে— যেটা তাকে দেবে বিশ্বের সকলের সঙ্গে একাগ্রতা অর্থাৎ বিশ্বাত্মৈক্য বুদ্ধি— আত্মা সর্বানুস্যূত— আমার অন্তরে যিনি বিরাজিত তিনিই সর্বভূতে আছেন— এই ভাবনা। তাই মানুষকে বাঁচতে হলে দেহের পুষ্টি চাই, দেহের পুষ্টির জন্য সমাজ চাই, স্বদেশ চাই, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশও চাই। প্রত্যেকটি স্তরের সমঞ্জসীভূত সাধনার নামই অনুশীলন ধর্ম। তাই স্বামীজীর ধর্ম কর্মাত্মক।

স্বামীজী বলছেন— 'ধর্মবিষয়ে চিরদিন আমরা ভারতবাসী পাশ্চাত্যের গুরুস্থানীয় থাকিব এবং তাহারা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে। ধর্ম জিনিষটা তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখিতে বসিবে, সেদিন এই অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচিয়া যাইবে।

''জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা অধিক পরমতসহিষ্ণু। হিন্দুদের সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর তাহার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা এবং পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার উপাদান সমূহ হিন্দুগিদের শান্ত সমাহিত গুণাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধরণের মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে— যাহারা জগতের পূর্বাপর যে কোন মানুষ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইবে।'' বাণী ও রচনা— ৩য় খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ।

আজ সমাজের সর্বস্তরে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তার মূল কারণ সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, ও আদর্শবান মানুষের অভাব। একটি জাতি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সব সারগুলি নিয়ে একটি সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত, ভারতীয় নাগরিকরূপে পরিণত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ঋষির জীবনলক্ষ্য তার কাছে স্থির থাকবে, আর তার সঙ্গে কর্মকুশলতা, বৈজ্ঞানিক নানাবিধ উৎকর্ষ সাধনযুক্ত হবে। একটি ছাত্র যদি শরীরকে সুস্থ সবল রেখে অধ্যয়ন করে, চরিত্রবলে বলীয়ান হয়— নানা প্রলোভনে উদ্ভ্রান্ত না হয়ে নিজ কর্তব্য কর্মে সচেতন থাকে এবং বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম নিঃস্বার্থভাবে করতে চেষ্টা করে, তবে তার অন্তরাত্মা জাগ্রত হবেই। পাঠ্যাবস্থা থেকে যদি নিজের মাকে, দেশমাতৃকাকে অবজ্ঞা করে, অন্ধ কুসংস্কারে সকলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মনে করে এবং নিজ অন্তরের কোন সন্ধানই না জানে, তাকে আমরা উচ্চশিক্ষিত মানুষ বলবো না বিভ্রান্ত নাগরিক বলবো? —শুধু পুঁথির বিদ্যায় পারদর্শিতা নয়, শুধু অর্থোপার্জনের ক্ষমতা নয়— ভারতীয় জীবন নীতি অনুসরণ করে তাকে জীবনে অনুশীলন করতে হবে, কারণ রীতিনীতি গুলি আমাদের শাস্ত্র, আর শাস্ত্রের শব্দরাশি অনন্ত, অপৌরুষেয় বেদ। নীতি আগে ব্যক্তি পরে;— যে ব্যক্তি নীতি অনুশীলনে জীবন গঠন করেছেন তিনি আমাদের কাছে মহাপুরুষ। এমন বহু মহাপুরুষের জীবনাবলী নিয়ে আমাদের হিন্দুধর্ম এত দীর্ঘকাল ধরে, বলশালী হয়েছে। হিন্দুর ঘরে বংশপরম্পরাক্রমে গুণাবলী নিয়ে শিশু জন্মায়।

অতএব বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলি অতি সহজ ভাষায় ও ভাবে শিশুকাল থেকে নবপ্রজন্মের কাছে দিতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন— ''তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ় ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে সেগুলিকে হিন্দুজীবনের মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে— তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে।'' (বাণী ও রচনা ৫ খণ্ড— স্বামী বিবেকানন্দ)

আজ আমরা আদর্শ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রগতিশীলতার অর্থ যদি অপর জাতির অনুকরণ ও উচ্ছৃঙ্খল

জীবনযাপন হয়, তবে তা ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী কখনই নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি আমরা ঠিক ঠিক বুঝবো যখন হিন্দুর বেদান্ত তত্ত্বটি আমাদের জীবনে অনুশীলিত হবে। বেদান্ত তত্ত্বটি কর্মে পরিণত না হলে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতায় পর্যবেসিত হবে। সনাতন হিন্দু ধর্মই শিখিয়েছে জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপমাত্র। ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষভাব আপনা থেকেই ঘুচে যাবে। সকল সম্প্রদায় এই পুণ্যভূমি ভারতে স্বীয় ধর্মানুসরণ পূর্বক শান্তিতে বাস করবে।

পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ দিতে হবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, আচরণবিধি যুগোপযোগী করতে হবে, তবেই আদর্শ নাগরিক গড়ে উঠবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করে উপসংহার করি— ''মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী, সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। ভারতে এ সত্য অনুভবতত্ত্ব। ভারতে সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। চিন্ময় ভারতে এই হলো প্রকৃত পরিচয়। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করেনি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়নি। এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্রযোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে, সত্য করে, জেনেছে।'' তাই বিশ্বকবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও যেন অন্তর থেকে বলতে পারি—

''প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পূণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থত্যজি সর্ব সুখ দুঃখে।
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।।

> Bring light to the poor, and bring more light of the rich, for they require it more than the poor. Bring light to the ignorant, and more light to the educated, for the vanities of the education of our time are tremendous.
>
> — Swami Vivekananda

‘Complete Works of Swami Vivekananda’ থেকে গৃহীত

Letters of Swami Vivekananda

U.S.A
20th May, 1894

My dear Sharat,

I am in receipt of your letter and am glad to learn that Shashi is all right. Now I tell you a curious fact. Whenever anyone of you is sick, let him himself or anyone of you visualise him in your mind, and mentally say and strongly imagine that he is all right. That will cure him quickly. You can do it even without his knowledge, and even with thousands of miles between you. Remember it and do not be ill any more. You have received the money by this time. If you all like, you can give to Gopal R. 300 from the amount I sent for the Math. I have no more to send now. I have to look after Madras now.

I cannot understand why Sanyal is so miserable on account of his daughters’ marriage. After all, he is going to drag his daughters through the dirty Samara (world) which he himself wants to escape! I can have but one opinion of that- condemnation! I hate the very name of marriage, in regard to a boy or a girl. Do you mean to say that I have to help in putting someone into bondage, you fool! If my brother Mohin marries, I will throw him off. I am very decided about that…

Yours in love
Vivekananda

HIGH VIEW, CAVERSHAM,
READING,
27th April, 1896

Dear _____,

…Let me write something for you all. it is not for gaining personal authority that I do this, but for your good and for fulfilling the purpose for which the Lord came. He gave me the charge of you all, and you shall contribute to the great well-being of the world- though most of you are not yet aware of it- this is the special reason of my writing to you. It will be a great pity if any feeling of jealousy or egotism gain ground amongst you. Is it possible for those to establish cordial relations on earth who cannot cordially live with one another for any length of time? No doubt it is an evil to be bound by laws, but it is necessary at the immature stage to be guided by rules; in other words, as the Master used to say, the sapling must be hedged round, and so on. Secondly, it is quite natural for idle minds to indulge in gossip. And faction-mongering and so forth. Hence I jot down the following hints if you follow them, you will undoubtedly prosper, but if you don't do so, then there is a danger of all our labours coming to naught.

First let me write about the management of the Math:

1. For the purposes of the Math please hire a commodious house or garden, where everyone may have a small room to himself. There must be a spacious hall where the books may be kept, and a smaller room for meeting the visitors. If possible, there should be another big hall in the house where every day study of the scriptures and religious discourses will be held for the public.

2. Anyone wishing to visit anybody in the Math should see him only and depart, without troubling others.

3. By turns someone should be present in the hall for a few hours every day for the public, so that they may get satisfactory replies to what they come to ask.

4. Everyone must keep to his room and except on special business must not go to others' rooms. Anyone who wishes may go to the Library and read, but it should be strictly forbidden to smoke there or talk with others. The reading should be silent.

5. It shall be wholly forbidden to huddle together in a room and chat the whole day away, with any number of outsiders coming and joining in the hubbub.

6. Only those that are seekers after religion may come and peacefully wait in the Visitors' Hall, and when they have seen the particular persons they want, they should depart. Or, if they have any general question to ask, they should refer to the person in charge of that function for the day and leave.

7. Tale-bearing. Caballing, or reporting scandals about others should be altogether eschewed.

8. A small room should serve as the office. The Secretary should live in the room, which should contain paper, ink, and other materials for letter-writing. He should keep an account of the income and expenditure. All correspondence should come to him, and he should deliver all letters unopened to their addressees. Books and pamphlets should be sent to the Library.

9. There will be small room for smoking, which should not be indulged in outside this room

10. He who wants to indulge in invectives or show temper must do so outside the boundaries of the Math. This should not be deviated from even by an inch.

The Governing Body

1. Every year a President should be elected by a majority of votes. The next year, another, and so on.

2. For this year make Brahmananda the President and likewise make another the Secretary, and elect a third man for superintending the worship, etc, as well as the arrangement of food.

3. The Secretary shall have another function, viz to keep water over the general health. Regarding this, I have three instructions to give:

(i) In every room for each man there shall be a Nair Charpoy, mattress, etc. Everyone must keep his room clean.

(ii) All arrangements must be made to provide clear and pure water for drinking and cooking purposes, for it is a deadly sin to cook sacramental food in impure or unclean water.

(iii) Give everyone two ochre cloaks of the type that you have made for Saradananda, and see that clothing is kept clean.

4. Anyone wishing to be a Sannyasin should be admitted as a Brahmacharin first. He should live one year at the Math and one year outside, after which he may be initiated into sannyasa.

5. Make over charge of the worship to one of these Brahmacharins, and change them now and then.

Departments

There shall be the following departments in the Math:

I. Study. II. Propaganda. III. Religious Practice.

1. Study- The object of this department is to provide books and teachers for those who want to study. Every morning and evening the teachers should be ready for them.

2. Propaganda- Within the Math and abroad. The preachers in the Math should teach the enquirers by reading out scriptures to them and by means of question-classes. The preachers abroad will preach from village to village and try to start Maths like the above in different places.

3. Religious Practice- This department will try to provide those who want to practise with the requisites for this. But it should not be allowed that because one has taken to religious practice he will prevent others from study or preaching. Anyone infringing this rule shall be immediately asked to clear out, and this is imperative.

The preachers at home should give lessons on devotion, knowledge, Yoga, and work by turns; for this, the days and hours should be fixed, and the routine hung up at the door of the class-room. That is to say, a seeker after devotion may not present himself on the day fixed for knowledge and feel wounded thereby; and so on.

None of you are fit for the Vamachara form of practice. Therefore this should on no account be practised at the Math. Anyone demurring to this must step out of this Order. This form of practice must never even by mentioned in the Math. Ruin shall seize the wicked man, both here and hereafter, who would introduce vile Vamachara into His fold!

Some General Remarks

1. If any woman comes to have a talk with a Sannyasin, she should do it in the Visitors' Hall. No woman shall be allowed to enter any other room- except the Worship-room.

2. No Sannyasin shall be allowed to reside in the Women's Math. Anyone refusing to obey this rule shall be expelled from the Math. "Better an empty fold than a wicked herd."

3. Men of evil character shall be rigorously kept out. On no pretence shall their shadow even cross the threshold of my room. If anyone amongst you become wicked, turn him out at once, whoever he be. We want no black sheep. The Lord will bring lots of good people.

4. Any woman can come to the class-room (or preaching hall) during class time or preaching hour, but must leave the place directly when that period is over.

5. Never show temper or harbour jealousy. Or backbite another in secret. It would be the height of cruelty and hard-heartedness to take note of others' shortcomings instead of rectifying one's own.

6. There should be fixed hour for meals. Everyone must have a seat and a low dining table. He will sit on the former and put his plate on the latter, as is the custom in Rajputana.

The Office-bearers

All the office-bearers you should elect by ballot, as was the mandate of Lord Buddha. That is to say, one should propose that such and such should be the President this year; and all should write on bits of paper "yes" or "no" and put them in a pitcher. If the "year" have a majority, he should be elected President, and so on. Though you should elect office-bearers in this way, yet I suggest that this year Brahmananda should be President, Nirmalananda, Secretary and Treasurer, Sadananda, Librarian, and Ramakrishnananda, Abhedananda, Turiyananda, and Trigunatitananda should take charge of the teaching and preaching work by turns, and so on.

It is no doubt a good idea that Trigunatita has of starting a magazine. But I shall consent to it if only you can work jointly.

About doctrines and so forth I have to say only this, that if anyone accepts, Paramahamsa Deva as Avatara, etc., it is all right; if he doesn't do so, it is just the same. The truth about it is that in point of character, Paramashamsa Deva beats all previous record; and as regards teaching, he was more liberal, more original, and more progressive than all his predecessors. In other words, the older Teachers were rather one-sided, while the teaching of this new Incarnation or Teacher is that the best point of Yoga, devotion, knowledge, and work must be combined now so as to form a new society… The older ones were no doubt good, but this is the new religion of this age- the synthesis of Yoga, knowledge, devotion, and work- the propagation of knowledge and devotion to all, down to the very lowest, without distinction of age or sex. The previous Incarnations were all right, but they have been synthesised in the person of Ramakrishna. For the ordinary man and the beginner, steady devotion (nishtha) to an ideal is of paramount importance. That

is to say, teach them that all great Personalities should be duly honoured, but homage should be paid now to Ramakrishna. There can be no vigour without steady devotion. Without it one cannot preach with the intensity of a Mahavira (Hanuman). Besides, the previous ones have become rather old. Now we have a new India, with its new God, new religion, and new Vedas. When, O Lord, shall our land be free from this eternal dwelling upon the past? Well, a little bigotry also is a necessity. But we must harbour no antagonistic feelings towards others.

If you consider it wise to be guided by my ideas and if you follow these rules, then I shall supply you all necessary funds. …Moreover, please show this letter to Gour-Ma, Yogin-Ma and others, and through them establish a Women's Math. Let Gour-Ma be the President there for one year, and so on. But none of you shall be allowed to visit the place. They will manage their own affairs. They will not have to work at your dictation. I shall supply all necessary expenses for that work also.

May the Lord guide you in the right direction! Two persons went to see the Load Jagannatha. One of them beheld the Deity- while the other saw some trash that was haunting his mind! My friends, many have no doubt served the Master, but whenever anyone would be disposed to consider himself an extraordinary personage, he should think that although he has associated with Shri Ramakrishna, he has seen only the trash that was uppermost in his mind! Were it not so, he would manifest the results. The Master himself used to quote. "They would sing and dance in the name of the Load but come to grief in the end." The root of that degeneration egotism- to think that one is just as great as any other, indeed! "He used to love me too!" -one would plead. Alas, Nick Bottom, would you then be thus translated? Would such a man envy or quarrel with another and degrade himself? Bear in mind that through His grace lots of men will be turned out with the nobility of gods- ay, wherever His mercy would drop… Obedience is the first duty. Well, just do with alacrity what I ask you to. Let me see how you carry out these few small things. Then gradually great things will come to pass.

Yours
Vivekananda

P.S. please read the contents of this letter to all and let me know whether you consider suggestions worth carrying out. Please tell Brahmananda that he who is the servant of all is their true master. He never becomes a leader in whose love there is a consideration of high or low. He whose love knows no end, and never stops to consider high or low, has the whole world lying at his feet.

.....

Switzerland,
August, 1896

Dear Swami Kripananda (Leon Landsberg)

Be you holy and, above all, sincere and do not for a moment give up your trust in the Lord and you will see the light. Whatever is truth will remain for ever; whatever is not, none can preserve. We are helped in being born in a time when everything is quickly searched out. Whatever others think or do, lower not your standard of purity, morality, and love of God; above all, beware of all secret organizations. No one who loved God need fear any jugglery. Holiness is the highest and divinest power in earth and in heaven. "Truth alone triumphs, not untruth. Through truth alone is opened the way to God." Do not care for a moment who joins hands with you or not, be sure that you touch the hand of the Lord. That is enough…

I went to the glacier of Monte Rosa yesterday and gathered a few hardy flowers growing almost in the midst of eternal snow. I send you one in this letter hoping that you will attain to a similar spiritual hardihood amidst all the snow and ice of this earthly life…

Your dream was very, very beautiful. In dream our souls read a layer of our mind which we do not read in our waking hours, and however unsubstantial imagination may be, it is behind the imagination that all unknown psychic truths lie. Take heart. We will try to do what we can for the good of humanity- the rest depends upon the Lord…

Well, do not be anxious, do not be in a hurry. Slow, persistent and silent work does everything. The Lord is great. We will succeed, my boy. We must. Blessed be His name!

Here in America are no Ashramas. Would there was one! How would I like it, and what an amount of good it would do to this country!

Mira Debi- How I Met Her

Subhadra Haksar

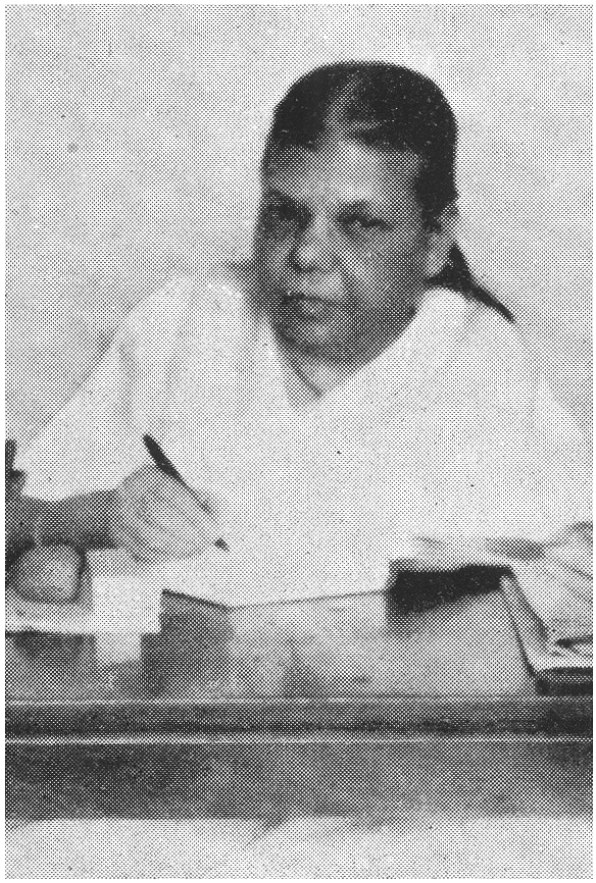

The year 1954 was a memorable year. The centenary of Sri Sri Sarada Debi was celebrated throughout the length and breadth of this country as well as many other countries. I was permitted by the then General Secretary of Sri Ramakrishna Math and Mission Swami Madhabananda Maharaj, who was also the Secretary of the Holy Mother Birth Centenary Committee, to organize a Women Devotees conference. I was further permitted to set up a Sub-Committee for this purpose with myself as the convenor. As this was to be an All Womens' Programme in every sense of the word, I was free to choose members on the Sub-committee, the only consideration being that the person concerned was truly devoted to the ideology of Sri Ramakrishna and Sri Sarada Debi.

I knew Mother Charushila Debi of Ananda Asram, I had also heard of Durgapuri Mata though never met her, I knew the sisters of Nivedita Girls' School. But that was not enough. I wanted to find out those who had personally known Sri Sri Ma, had met her, talked with her and were Mira Debi and Bani Debi. I had no personal knowledge of the Ashrama as such, neither of the inmates. Dr. Roma Chowdhury had been invited to be a member of the Sub-Committee which she had accepted. I enquired of her and she suggested that we should invite Bani Debi to be a member of the Sub-Committee. Mira Debi, she said was not well; also, she expressed doubts whether our invitation would be accepted. In this she was however proved incorrect. Bani Debi accepted our invitation to be a member of the Sub-Committee. Even then I had not met Mira Debi.

Three days before the conference opened we had a meeting of the Reception Committee, at the camp itself, to finalise last minute arrangements. I was in the midst of noting down some suggestions made by the members when suddenly there seemed to be a hush. Looking up I saw an elderly lady, tall and fair, smiling countenance and clad in white approaching. Then some one said, "See Mira Debi has come." So this was Mira Debi! I got up to receive her and believe me I was completely won over. It was like meeting, after a long long time someone your very own.

After the conference was over Mira Debi asked me to become a member and also I think Vice-President of the Ashrama. I felt honoured and accepted. Such was the beginning of my relationship with Mira Debi.

The Ashrama then was located in a rented house

on Lansdowne Road. I used to visit the Asrama occasionally and also sometimes attend a study circle conducted there. My interest was to learn about Sri Ma as much as I could from Mira Debi who had known and seen her. So far my knowledge of Sri Ma was from the two books I had read ('Life' in English & 'Mayer Khata' in Bengali) & also a little I heard from one or two elder Sadhus of the R. K. order.

From this little I had formed a sort of picture of my own but it was not clear. I wanted to know much, much more about her, how she lived, talked and laughed; so many ordinary things which are the daily incidents of one's life. From Miradi I learned many things, heard of a few incidents. Her way of narrating was so vivid, so real. After all, this was all her personal experience and for me it was wonderful. The picture of the Mother which was hazy became clear and in my mind's eye I could see her- a very loving human mother, moving about amongst her family of innumerable children, caring for, feeding and reassuring them.

The more I thought of this the more I wondered at the personality of Miradi. How could she be so understanding, and full of human insight, so patient & so loving; glowing with an inner wisdom yet at times simple like a little girl laughing at little simple childish jokes! I was impressed by her courage and frank approach. There was a dignity which surrounded her- after all was she not the Queen's (Rajrajeswari's) daughter! She had experienced much suffering but she remained undaunted through passing trials, her faith in Mother was fire. She knew she would never be forsaken for her conscience was clear. She truly believed in the diginity and capability of women as preached by Swami Vivekananda and would not have any male interference in women's affairs, "Only a woman will understand another woman's problem fully, never a man." Mira Debi inspired trust and confidence. You knew that you would never be let down. I always returned a happy person after meeting her. The Ashrama was truly the "Mother's" House. You felt her presence of love and assurance, comfort and compassion. This is how I felt and I am sure many others like me had the same feeling.

All this happened twenty eight years ago but the events are so fresh, as if it all happened the other day. The first meeting was imprinted in my heart for ever.

One evening when I went to the Ashrama I found her dejected and unhappy. Something very unusual indeed. She told me then that the house-rent of the Ashrama was being paid by an American devotee who had written to express inability to continue the same for long; also, remarking that the devotees there (that is in Calcutta) should also participate in looking after the well-being of the Ashrama. Mira Debi was deeply hurt at this remark. It was against her nature to beg. After listening to her I suggested that it would be in the interest to the Ashrama to expand its activities. Mira Debi was very keen to start a school, but the question was of 'funds', I assure her that funds for a good cause, specially in the city of Calcutta should be no problem. I also asked her to write back to the ageing American devotee (who proved to be a true friend) that he should no longer inconvenience himself by sending money for the Ashrama which will manage with the co-operation of friends here. Meanwhile I assured her of doing my best, also, that there were many like me who would certainly help. But the first thing was to find a suitable piece of land, shift to a cheaper place (the monthly rent of the building then was about 500/-) and then collect funds.

How the Ashrama was shifted to New Alipore, land was purchased, the school was started twenty five years ago and how much voluntary support and co-operation was received is a story everyone knows. The story of the Sarada Ashrama Balika Vidyalaya is also the story of Sri Ma's miracle! One such beautiful instrument was Mira Debi herself.

> Bring light to the poor, and bring more light to the rich, for they require it more than the poor. Bring light to the ignorant, and more light to the educated, for the vanities of the education of our time are tremendous.
>
> — Swami Vivekananda

কবি ও সন্ন্যাসীর শিক্ষাভাবনা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উভয়েই 'যুগন্ধর' পুরুষ। উভয়েই দার্শনিক ও ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে নিবেদিত প্রাণ। উভয়েই দরিদ্র, অবহেলিত ও অস্পৃশ্যদের প্রতি মমতাপরায়ণ অর্থাৎ উভয়েই মানবপ্রেমিক। মুক্তিকামী মানুষের কাছে একজনের জীবন ও অপরজনের কাব্য—জীবন পাথেয়। তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে উভয়ের জীবন ও বাণী সংগ্রামের হাতিয়ার ও প্রেরণা। যুবশক্তিকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত করতে উভয়ের অবদান অবশ্য স্মরণীয়। মাটির কাছাকাছি মানুষের ভাবনা উভয়ের জীবনে লক্ষ্য করা যায়। অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র মানুষগুলির মুখের দিকে চেয়েই কবি লিখেছেন, ''অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু...।'' সন্ন্যাসীর মুখেও শুনতে পাই, ''মূর্খ, নিরীহ এই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন জাতির মানুষগুলোকে একটু জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ মাথায় একটু বিদ্যাদান ও পেটে একটু রুটি দিলে এই জাতি নিজেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সমর্থ হবে।'' উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন এই তত্ত্বে যে, একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষার মানের উপর। তাই উভয়েই শিক্ষাকে সর্বজনীন করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। এই দুজন মনীষীই

শিক্ষাকে নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা করে গেছেন তা এখনও পর্যন্ত এই দেশের পক্ষে তো বটেই যে কোনো প্রগতিশীল জাতির কাছেই গ্রহণযোগ্য।

কবি ও সন্ন্যাসী স্বদেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, লাভ করেছেন অনেক অভিজ্ঞতা। স্বামীজি পরিব্রাজক অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গ লাভ করেছেন— ভারতকে দর্শন করেছেন নিজের চোখ দিয়ে। ভারতের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অস্পৃশ্যতা, ধর্মের নামে ব্যভিচার ইত্যাদি দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং এর থেকে জাতির পরিত্রাণের পথ কী তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এর থেকে মুক্তির পথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ''ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে করিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? শিক্ষা— এই জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন।''

বিগত শতাধিক বছর ধরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ভারতে এখনও ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি সামান্য রদবদল করে চলে আসছে একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হলো ডিগ্রি ও অন্নসংস্থান। গুণগত তেমন প্রভেদ ধরা যায় না তবে পরিমাণগত পার্থক্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন প্রাচীন মুনি-ঋষিরা। একমাত্র সৎ শিক্ষাই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে শিক্ষানীতি নির্ধারণে, নিয়ন্ত্রণে ও প্রণয়নে যাঁরা পুরোভাগে থাকবেন তাঁদের একটা স্বতন্ত্র জীবনের অধিকারী হওয়া চাই। তাই স্বামীজি আশ্রমিক শিক্ষা অর্থাৎ প্রাচীন গুরুকুল প্রথাটির বহুল প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''আমার বিশ্বাস গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনোরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না।... একটা জ্বলন্ত Character-এর কাছে ছেলেবেলা থেকে থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না।... আমাদের দেশে কেবল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার...। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।... আর সে জন্যই 'গুরুগৃহবাসম্' ইত্যাদি চাই।'' রবীন্দ্রনাথও আশ্রমবাস বা গুরুকুলপ্রথা— শিক্ষার এই প্রাচীন আদর্শটির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। যদিও হিন্দুধর্মের এই 'গুরুবাদ'-এ তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না তবুও আমরা জানি যে শান্তিনিকেতনে তিনি 'গুরুদেব' নামেই পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন আদর্শটির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন বলেই তিনি ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শে প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতন, যা পরবর্তীকালে সমগ্র পৃথিবীতে একটি শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত লাভ করে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, ''বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল। দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপনার সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানব চিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান।''

শিক্ষার অর্থ বলতে গিয়ে স্বামীজী যে শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, ''শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ।'' অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থিত যে অনন্ত সম্ভাবনা তার প্রকাশই শিক্ষা অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির চরমতম বিকাশই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্বামীজি বলেছেন, ''যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা।''

ব্রহ্মচর্যকে শিক্ষার বিশেষ সহায়ক বলে স্বামীজি অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''...সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই দেখিতে পায় যে কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধর্মাভাব চরিত্রবল ও মানসিক তেজ সব চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন সেই সেই ধর্ম সম্প্রদায়েই ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য আছে। ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি, মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারে না।'' ''একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়— শ্রুতিধর-স্মৃতিধর হয়।'' ব্রহ্মচর্য একাগ্রতার সহায়ক ও অসীম শক্তিদায়ক যা বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ''জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।'' অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা অন্তরের বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রকাশে ব্রহ্মচর্যের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার ও অনুমোদন করেন। অবশ্য স্বামীজীর 'গুরুগৃহবাসম্' ও রবীন্দ্রনাথের 'তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরু'র মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। স্বামীজী বলতে চেয়েছেন সন্ন্যাসী দ্বারা পরিচালিত আশ্রমই গুরুগৃহবাসম্ আর কবির তপোবনের কেন্দ্রস্থলে যে গুরু তিনি সন্ন্যাসী নন। তাঁর ভাষায়, ''একদিন তপোবন ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরান কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ...যে কালে এই আশ্রম সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু উহা নিশ্চয় যে এই সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মত তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।'' গুরু গৃহীই হন আর সন্ন্যাসীই হন বিদ্যা আদান-প্রদানের পরিবেশটুকু স্বামীজি ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের দ্বারাই

সমাদৃত। বৈষয়িকতা ও বিলাসিতা বর্জিত সরল, স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের শিক্ষার উপর একটা প্রভাব যে অনস্বীকার্য তা উভয়েই স্বীকার করেন।

শিক্ষার মৌলিকত্ব নিয়ে কবি ও সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি একই প্রকার। স্বামীজির ভাষায়, ''বিশ্বাস করিতে হইবে যে প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধার স্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু মুখস্থ বা অনুকরণ করলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয় না। নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রাখা ও জাতীয় জীবন স্রোতকে অবরুদ্ধ না করাও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।'' কবিও এই মৌলিকতার অভাব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনা শক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। ...আমরা নকল করি, নজির খুঁজি এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোন না কোন মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানবিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্দ্ধাবশত বেড়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে খর্বতা আছে তাহা কোন মতেই স্বীকার্য নহে।'' আধুনিক শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী'র মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে উভয়েই বেশ সচেতন ছিলেন। স্বামীজী বলেছেন, ''প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না, ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। ...ভিতরে মৌলিক চিন্তাযুক্ত একটি মানুষও পাওয়া যায় না।... কেবল চূড়ান্ত কেরানী গড়া কল বইত নয়।'' শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা জনজীবনের উন্নতির কথা উভয়েই চিন্তা করেছেন। সন্ন্যাসী বলেন, ''...সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি যাহারা কূটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে।''

কবি কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে একই সুর, ''সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে। ...আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।'' ''সা শিক্ষা যা বিমুক্তয়ে''—অজ্ঞতার আবরণ অপসারণ হলেই জ্ঞানসূর্য উদিত হয়। এই অজ্ঞতা থেকে মানুষ মুক্তি পায় শিক্ষা দ্বারাই।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষা আমাদের জাতীয় ভাবের বিরোধী। এই প্রসঙ্গে কবি ও সন্ন্যাসী একই মত পোষণ করেন। সন্ন্যাসী বলেছেন, ''...আজকাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষিত যে সকল ব্যক্তি দেখিতে পাই তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। ...পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে— তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই। সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদ হজম হইয়া সামঞ্জস্যহীন হইয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান নয়।'' কবি বলেন, ''এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল কামরার দীপের মত। কামরাটা উজ্জ্বল কিন্তু যে যোজন পথ গাড়ী চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়ীটাই যেন সত্য। আর প্রাণ বেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।''

এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক করা সম্ভব হয়নি। সেই তখনকার দিনেই শিক্ষা-দীক্ষা হতে বঞ্চিত মানুষের জন্য স্বামীজীর বেদনার কথা জানা যায়। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ এই বঞ্চিত শ্রেণীর দিকে ফিরেও চান না। তিনি বলেন, ''যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেশিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে বিদ্যা অর্জন করিয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া উহাদের কথা একটিবারও চিন্তা করিবার অবসর পায় না— তাহাদিগকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করি।'' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল 'এনলাইটেনড' আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকী দেশটাতে লাগল সূর্যগ্রহণ।

মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই শিক্ষা, নিজেকে জানাই ধর্ম। ''ধর্মকে আমি শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়াই মনে করি।'' স্বামীজির শিক্ষাভাবনায় ধর্মের একটি বিরাট ভূমিকা আছে। এই 'ধর্ম' কোনো অনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। তিনি বলেন, ''যাহাতে তাহারা নীতি পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হয় এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকায় তুলিয়া রাখ। ধর্মের যাহা সার্বজনীন সাধারণ ভাব তাহা শিখাইবে।'' কবির ধর্ম তাঁহার নিজের ভাষায়, ''আমার ধর্ম কী তা আজও আমি সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে। অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনে মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব— কিছু অলস শান্তি ও সৌন্দর্য রসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয় একথা নিশ্চয় জানি।'' ''এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন কণ্ঠে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। ডাকিয়া বলিতে হবে 'যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে পথ কুক্কুরের মতো।' '' স্বামীজী বার বার বলেছেন, ''ওঠো, জাগো, উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'' শিক্ষায় এই ধর্মই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন কবি ও সন্ন্যাসী উভয়েই।

লোক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষার উভয়েই ছিলেন সমমতাবলম্বী ও উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এখনও তার প্রমাণ। স্বামীজি তাঁর জীবিত অবস্থায় একটিমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন, বর্তমানে তা

নিবেদিতা গার্লস স্কুল বলে পরিচিত। কিন্তু স্বামীজির আদর্শ নিয়ে সারা ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে যার মধ্যে স্বামীজির সার্বিক শিক্ষা-ভাবনা বাস্তবে কিছুটা রূপায়িত হচ্ছে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা স্বামীজি বলেছেন, অন্যদিকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের বহুল প্রচেষ্টা কবির মধ্যে দেখা যায়।

কবি ও সন্ন্যাসী বিশ্ববরেণ্য। স্বামীজি বলতেন, ''আমি কী শুধু ভারতের। আমি সারা বিশ্বের।'' কবির বাণী শুনি, ''আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি, আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।'' কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে উভয়ের পারস্পরিক সংযোগ না ঘটলেও শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তা ও চেতনা প্রায় সমপর্যায়ের।

> যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না,
> অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না,
> আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে যুক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা

স্বামী ঋতানন্দ

ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রতিভূ স্বামী বিবেকানন্দ। রেনেসাঁসের তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল : যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদারতা। বাস্তবিক এই বিশিষ্টতার ভিত্তিস্বরূপ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন। তাঁর বাণী ও জীবনের মধ্যে উক্ত তিনটি বিশেষত্ব যেন ওতপ্রোত ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তার প্রথম কারণ— বেদান্তই, একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ— জগতের যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে কেবল এর উপদেশাবলীর সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হয়েছে, তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।... তৃতীয় কারণ— এর অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা।''[১]

জড়বিজ্ঞানের প্রশ্নাতীত উত্থানের সমকালেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমন এবং বেদান্তের তত্ত্বসমূহকে আলোচনা করা। বেদান্তের তত্ত্ব তাঁর মতে 'the Science of the Soul' —আত্মার বিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যেখানে জয় জয়কার সেই লন্ডনে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানযোগ আলোচনায় স্বামীজী বিজ্ঞানীদের রক্ষণশীলনতা (Scientific orthodoxy) সম্পর্কে বলেন ঃ টিন্ডেল, হাক্সলী অথবা ডারউইন যা-ই বলুক মানুষে তা নির্বিচারে গ্রহণ করে থাকে। তিনি বলেন ঃ ''ইউরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম— অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ।''[২]

অন্যত্র স্বামীজী বলেছেন ঃ ''আমরা এখন চাই এই (শঙ্করের) প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের হৃদয়— এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হোক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও তাতে থাকুক, তা যুক্তিমূলক হোক। আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাতে হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হবে। তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করবে। এইটিই ভবিষ্যতের ধর্ম হবে। আর যদি আমরা সেটি ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে, সেটি সর্বকালে ও সর্বাবস্থার উপযোগী হবে। ... আধুনিক বিজ্ঞানকে এই পথেই আসতে হবে— এখনই প্রায় এই পথে এসে পড়েছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে তিনি উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্তন করছেন? —

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।।'
(কঠোপনিষদ্ ২.২.৯)

যেমন, অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে, তদ্রুপ সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, আবার তিনি জগতের বাইরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে তা কি আপনারা বুঝছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে দর্শনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতি আলোচনা করতে করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখন

উভয়ে একস্থানে পৌঁছাচ্ছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছাচ্ছি— যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছাচ্ছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ— জগতের যা কিছু আছে তিনি সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের গতি কখনই বন্ধনের দিতে হতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হবে কেন? কারণ নীতিই মুক্তির এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।''[৩]

আমরা জানি, যুক্তিবাদ মানে কার্যকরণ শৃঙ্খলা ও প্রকৃতির একরূপতা-অনুসন্ধান। স্বামীজী বলেছেন— একটি শিশুকেও বেদান্ত শেখানো যেতে পারে— এটি তাঁর জীবনব্রত। সৃষ্টির মূলে রয়েছে একত্ব। এই একত্ব থেকেই বৈচিত্রের বিভাজন। ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি। বিশেষ থেকে সামান্যীকরণ। অনুলোম থেকে বিলোম— সবই সেই একত্বের আভাস বা ইঙ্গিত। যেখানে একত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে দর্শনের কূটবিচারের করণ— জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং প্রমাণ, প্রমাতা ও প্রমেয়র অবলোপ। বেদান্ত যে ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করে তা হল— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ (শাস্ত্র), অর্থাপপত্তি ও অনুপলব্ধি। শব্দ বা শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য পাঁচটি প্রমাণই লৌকিক বা জাগতিক বিষয়ের প্রমাণ। ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে যে লৌকিক বিষয় ছাড়াও অলৌকিক বিষয় আছে এবং তার প্রমাণের মাপকাঠি শব্দ বা শাস্ত্র। এই তত্ত্বের আবিষ্কার ও স্বীকৃতি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

বৈদিক ঋষিদের বিশ্লেষণী মনোভাব ছিল। হিন্দুজাতির অনুসন্ধিৎসা জগৎ সৃষ্টির পিছনে যুক্তিবাদী কারণকে খুঁজে পেয়েছে। 'নাসতো সৎ জায়তে'— অসৎ থেকে সৎ জন্মাতে পারে না— অভাব থেকে ভাবের সৃষ্টি অসম্ভব। এই অনুসন্ধিৎসা জন্ম দিল 'সাহসী এক বিশ্লেষণী মনোভাবকে' এবং সেটিই উন্নীত হল যথার্থ এক বিজ্ঞানে। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে যুক্তিবাদী বেদান্তী জগৎসৃষ্টিকর্তা ভগবানকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে আত্মপ্রকাশক এক শক্তিকেই জগৎ সৃষ্টির পিছনে কারণরূপে খুঁজে পেয়েছেন। স্বামীজীর ভাষায়ঃ ''এই বিশ্লেষণশক্তি এবং নির্ভীক কবিকল্পনা, যা ঐ শক্তিকে প্রেরণা দিত— এই দুটি অভ্যন্তরীণ কারণই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর, ঐ দুটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্যজাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়স্তর থেকে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল এবং এটি এই জাতির দার্শনিক চিন্তাধারার গোপন রহস্য।'[৪]

স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু দর্শনের সব মত-পথের মধ্যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন তাই তিনি একদিকে যেমন নির্গুণ-নিরাকার জগদতীত ব্রহ্মাসত্তাকে স্বীকার করেছেন আবার সর্বানুস্যূত ব্রহ্মকে সগুণ-সাকাররূপেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্য-বিভাজন একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। জীব ও জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ পৃথক দুটি বস্তু নয়— এক ব্রহ্মই। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছেঃ

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।। (মুণ্ডক ১.১.৭)

অর্থাৎ মাকড়সা যেরূপ নিজ শরীর থেকে সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধিসমূহ জাত হয় এবং সজীব পুরুষ শরীর থেকে (বিজাতীয়) কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, সেরকম অক্ষর থেকে এই সংসার মণ্ডলে নিখিলবস্তু উৎপন্ন হয়।

স্বামীজীর মতে, আচার্য শঙ্করই প্রথণ দেশ-কাল নিমিত্তকে মায়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।[৫]

সর্বজনীন নীতিই হল সত্য। তাতে কারোরই একচেটিয়া অধিকার নেই। স্বামীজীর মতে নিউটন, গ্যালেলিও যেমন পদার্থ বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, অবতার পুরুষগণও তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঋষি।''[৬]

স্বামীজী লিখেছেন ঃ 'প্রশ্ন হল — ...অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করছে, ধর্মকেও কি আত্ম সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য নিতে হবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হবে? আমার মতে তা-ই হওয়া উচিত। আমি এ-ও মনে করি, যত শীঘ্র তা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে— সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার মাত্র ছিল; যত শীঘ্র তা লোপ হায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটির বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতর যা-কিছু খাদ আছে, সে-সবই দূরীভূত হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু ধর্মের যা সারভাগ, তা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়-গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হবে শুধু তাই নয়, বরং আও বেশী জোরালো হবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো অভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নেই, কিন্তু ধর্মের তা আছে।''

''যে সব ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে কোন যুক্তিসম্মত তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগিতা অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়, তাঁরা যেন কতকটা স্ববিরোধী কাজ করে থাকেন। ...(পরস্পর বিবদমান দুই ধর্মের) মীমাংসা হবে কীভাবে? গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর বিবদমান গ্রন্থগুলি বিচারক হতে পারে না। কাজেই এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এই-সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন কিছু একটা আছে। একটা কিছু আছে, যা জগতে যত নীতিশাস্ত্র আছে, সেগুলি অপেক্ষা উচ্চতর; একটা কিছু আছে, যা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করে বিচার করে দেখাতে পারে। আমরা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বিচারের জন্য আবেদন নিয়ে আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই।''[৭]

স্বামীজীর মতে যুক্তির প্রথম নিয়ম হল— বিশেষ (Particular) সামান্যের (General) মাধ্যমে এবং সামান্য সর্বজনিন (Universal) মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়। মুণ্ডকোপনিষদে আমরা পাই গৃহস্থগ্রণী শৌনক যথাশাস্ত্র

অঙ্গিরার কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ ''কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি''— অর্থাৎ, হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটি সুবিদিত হলে এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়?

দ্বিতীয় নিয়ম হল— ব্যাখ্যাটি বস্তু বা তত্ত্বের ভেতর থেকে আসবে বাইরে থেকে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ ''কোন পদার্থবিদের বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তাঁদের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য এই সব দৈত্য দানবাদির কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা; এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করতে চাই। দেখা যায়; ধর্মগুলির মধ্যে এর অভাব রয়েছে এবং সেইজন্য ধর্মগুলি ভেঙে শতধা হচ্ছে।''[৮]

রাজযোগ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন ঃ ''রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। এটি আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রয়েছে; তেমনি মানুষের ভিতরেই ঐ অভাব মোচন করার শক্তিও রয়েছে; যখন যেখানে কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝতে হবে এই অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার থেকেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হচ্ছে, কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়। অপ্রাকৃত পুরুষের ধারণা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে জাগ্রত করতে পারে বটে, কিন্তু এতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হয়ে থাকে, এর ফলে স্বাধীনতা চলে যায়, ভয় ও কুসংস্কার এসে হৃদয় অধিকার করে, ঐভাব শেষপর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে— মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই, প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। সূক্ষ্মকে সেরূপ করা যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করলে সূক্ষ্মতর অনুভূতি অর্জিত হতে থাকে।''[৯]

বেদান্ত মতে মায়া হল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অনির্বচনীয়। স্বামীজী বলেছেন ঃ ''মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নয়; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলছে, মায়া তারই বর্ণনামাত্র অর্থাৎ এটাই বলা যে, বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়ে আমরা চলছি।''[১০]

মায়া প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ঃ 'দেশ কাল ও নিমিত্তকে আমরা মায়া বলে থাকি... সাধারণত যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, মায়া সেরূপ ভ্রম নয়। মায়া সৎ, আবার সৎ নয়। মায়া সৎ, কারণ তার পশ্চাতে প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান, তাই মায়াকে প্রকৃত সত্তার আভাস প্রদান করে... অতএব মায়া হল কূটাভাস— সৎ অথচ সৎ নয়, ভ্রম অথচ ভ্রম নয়।''[১১]

একশো বছরের বেশী আগে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বামীজী বলছেন ঃ ''এদিকে আবার আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাগুলি হতে এ-কথায় প্রমাণ ক্রমশ বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুত সূক্ষ্মতর সত্তাই সত্য, যা স্থূল, তা দৃশ্যমান। ...যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, তিনি যে কেবল স্রষ্টা— তাই নয়, সৃষ্ট কার্যও তিনি। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।''[১২]

বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ ''বিজ্ঞানের প্রমাণে জেনেছি— দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র।'' ও ''আমরা একই সময়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টি।''

স্বামীজী বলেছেন ঃ ''বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করছেন, যা হতে অন্য কিছুর সাহায্যব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত কারণ, আবার সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান কারণ সবই।''

স্বামীজীর আশা ঃ ''বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করবে।'' কারণ— ''চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম— একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। ঐটি বুঝতে গেলে আমাদের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে হবে।''

মিল, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শুষ্ক বিচারপূর্ণ যুক্তিবাদ নরেন্দ্রনাথের প্রাণের তৃষ্ণাকে পূরণ করতে পারেনি। তাই সত্যানুসন্ধানের জন্য পাগলপারা হয়ে বহু ধর্মবেত্তাদের কাছে গিয়েও বিফল মনোরথ হবার পর তিনি আশ্চর্যবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভে ঈশ্বর সম্পর্কে সুবিজ্ঞাত এক যথার্থ সাধককে পেয়েছিলেন। সে ঘটনা তাঁর নিজের ভাষায় ঃ ''আমি এই ব্যক্তির কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। তাঁকে একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হল, কিছু অসাধারণত্ব দেখলাম না। অতি সরল ভাষায় কথা বলছিলেন, আমি ভাবলাম এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্মাচর্য হতে পারেন? আমি সারাজীবন অপরকে যা জিজ্ঞেস করেছি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'মশায়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন? তিনি উত্তর দিলেন— হ্যাঁ।' 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সামনে দেখছি, তাঁকেও সেরূপ দেখি, বরং আরো উজ্জ্বল স্পষ্টতর। উজ্জ্বলতর রূপে দেখি।' আমি একেবারে মুগ্ধ হলাম।''

নরেন্দ্রনাথের পশ্চিমী বস্তু বিজ্ঞান ও তার বিশ্লেষণী প্রয়োগ সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞান ও দর্শন পড়েছিলেন এবং পশ্চিমের চিকিৎসার বিষয় পাঠ করে বুঝতে পেরেছিলেন স্নায়ুতন্ত্রের কথা। বিশেষ করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

একবার মাইশোরের মহারাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''স্বামীজী, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'' স্বামীজী এই উত্তরে জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সম্পদরাজি হল তার দর্শনে ও আধ্যাত্মিকতায়, এখন প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান সম্পন্ধে ধারণার।

স্বামীজী উপদেশানুসারে আলোয়ারের অনেক যুবক সংস্কৃত-শিক্ষায় মনোযোগী হয়েছিল। সময়ে সময়ে স্বামীজীই তাদের শেখাতেন। তিনি বলতেন, ''সংস্কৃত পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা কর; আর সব জিনিসটা যথাযথ ভাবে দেখতে ও বলতে শেখ। পড় আর খাট, যাতে করে আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নূতন করে গড়তে পার।''

স্বামীজীর খেতড়ীতে প্রায় তিন মাস অবস্থানের সুযোগে রাজা অজিত সিংহ তাঁর নিকট পদার্থ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং নক্ষত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ গৃহে স্বামীজী

একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছিলেন তাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত ছিল। একটি দূরবীক্ষণও ঐ উচ্চ গৃহের ছাদে স্থাপিত হয়েছিল এবং গ্রহ নক্ষত্রাবলোকনে গুরুশিষ্য এমনই মেতে যেতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকত না।''

জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বাজীজীর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে— যখন তিনি অখ্যাত সন্ন্যাসী— বিনা পরিচয়পত্রে আমেরিকা যাচ্ছেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে। স্বামীজীর জীবনীগুলি পড়ে মনে হয়, স্বামীজী বুঝি বোম্বাই থেকে ৩১ মে, ১৮৯৩ তারিখে 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে উঠে, সেই জাহাজে করেই আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিলেন, যদিও স্বামীজী স্বয়ং ১০ জুলাই, ১৮৯৩-এর চিঠিতে জাপানের কোবি বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। স্বামী চেতনানন্দ আশ্বিন, ১৩৮০, উদ্বোধনে, এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে ('বিবেকানন্দ ঃ বম্বে থেকে বঙ্কুবর') — ''ডেইলি নিউজ অ্যাডভারটাইজার, ভ্যাঙ্কুবর'' পত্রিকার ২৬ জুলাই, ১৮৯৩-এর উদ্ধৃতি করে দেখিয়েছেন, স্বামীজী ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় ভ্যাঙ্কুবর পৌঁছান 'এমপ্রেস অব ইন্ডিয়া' জাহাজ যোগে। ঐ সংবাদপত্র থেকেই দেখা যায়, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে মিঃ এস বিবস্কানন্দ্র ও স-ভৃত্য মিঃ টাটাও ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা যাত্রাপথেই যে টাটার পরিচয় হয়েছিল। সে-সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ ''ইয়কোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে ভ্যাঙ্কুবারে চলিয়া যান। ...সুপ্রদিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' কিন্তু টাটা যে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নানারূপ আপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন। সে সময়ে টাটার জাপানী দেশলাই একচেটিয়া ছিল।''

জামসেদজী টাটা যে স্বামীজীর সঙ্গে পাঁছ বছর আগেকার প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা স্মরণ করেছিলেন, তা ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৮, তারিখে স্বামীজীকে লেখা তাঁর পত্র থেকে দেখা যায়। পত্রটি এই ঃ

''প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ—

আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীপূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ন্যাসীসুলভ ত্যাগের আদর্শের পুনর্জাগরণ, ঐ আদর্শকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

''ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। মনে হয়, যদি ত্যাগব্রতী মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বরর জীবন যাপন করে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে— তাহলে তার অপেক্ষা ভাবাদর্শের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর, এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন। আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধ হয় শুরুতে এ-ব্যাপারে জনসাধারণতে উদ্দীপিত করার জন্য অগ্নিময় বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভালো করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করব।

শ্রদ্ধানত হে প্রিয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত,

জামদেদজী এন টাটা।''

বিজ্ঞান ও ধর্ম— উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য একত্ব আবিষ্কার। স্বামীজীর মতে ঃ ''একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয় তখন তার অগ্রগতি থেমে যাবে। কারণ ঐ বিজ্ঞান নিজের লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। যেমন রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যা থেকে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে, তা হলে তা চরম উন্নতি লাভ করল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করতে পারে, অন্যান্য শক্তি যার রূপান্তর মাত্র, তা হলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হল। ধর্ম বিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করেছে, যখন তাঁকে আবিষ্কার করেছে যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা— অন্যান্য আত্মা যাঁর ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্ম-বিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। এটিই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

''সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরার 'সৃষ্টি' না বলে 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করছেন। হিন্দু যুগযুগ ধরে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সে-ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হওয়ার উপক্রম দেখে তার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।''

অন্যত্র স্বামীজী লিখেছেন ঃ ''আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি।''

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে নিউইয়র্ক শহরে মেধা ও প্রতিভায় অনন্য দুই ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটেছিল। একজন ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এবং অপরজন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম অগ্রণী বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা। নিকোলা টেসলা নিউয়ইয়র্কে বিবেকানন্দের বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে আসতেন এবং সম্ভবত তিনি একাধিক আসরেই এসেছিলেন। বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা এবং গভীর অনুসন্ধিৎসার ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় রয়েছে নিকোলা টেসলাকে লেখা তাঁর চিঠিতে। তা ছাড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ ইটি স্টার্ডিকে লেখা চিঠিতে নিকোলা টেসলার উপর নিজের বক্তৃতার প্রভাবের কথা স্বামীজী জানিয়েছিলেন ঃ ''মিঃ

টেসলা বেদান্ত-মত অনুযায়ী প্রাণ, আকাশ ও কল্প-এর তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মতে, আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে একমাত্র এই মতবাদই মনোযোগের যোগ্য। আকাশ এবং প্রাণও আবার বিশ্বব্যাপী মহৎ অর্থাৎ সর্বপরিব্যাপ্ত মন— নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট। মিঃ টেসলার ধারণা তিনি অঙ্কের মাধ্যমে দেখতে পারবেন যে, জড় ও শক্তিকে শেষপর্যন্ত অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। গণিতের এই নূতন প্রদর্শনটি চাক্ষুষ করার জন্য আগামী সপ্তাহে তাঁর কাছে আমার যাওয়ার কথা। এটি যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে বেদান্তমত দৃঢ়তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

তারিখবিহীন নিম্নোক্ত চিঠিটি বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে লিখেছিলেন টেসলাকে। তার সামান্য অংশেই প্রমাণ মেলে স্বামীজীর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা।

প্রিয় মহাশয়,

এটা যদি আপনার কাছ থেকে অত্যধিক প্রত্যাশা না হয়, তাহলে দয়া করে Conservation of Energy-র তত্ত্ব এবং বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা কয়েক ছত্র লিখে আমায় জানাবেন। আধুনিক বিজ্ঞানে কি এমন কোন তত্ত্ব আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, there is a sphere of electricity beyond the sphere of light? Electric vibration কি finer than those of light? একটিকে অপরটিতে transfer করা সম্ভব?

স্বামীজীই প্রথম সন্ন্যাসী যিনি পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার সমৃদ্ধি, দরিদ্রের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি, নারীদের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক ঐক্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তৃপ্তিবোধ করেছেন। স্বামীজী লক্ষ করেছেন পাশ্চাত্যের উন্নতির পিছনে ছিল বিজ্ঞান এবং মুক্ত সামাজিক-রাজনীতিক মনোভাবের প্রভাব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র হিন্দু রক্ষণশীল সমাজকে কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে পারবে। তাই স্বামীজী নির্দ্বিধায় বলেছেন যে বাইরের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদান-প্রদান যেদিন থেকে বন্ধ হল ভারতবর্ষকে সেদিন থেকেই যে যখন চাইল পদানত করল।

১৮৯৭-এর ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের দিন এবং ৫ মে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে উল্লিখিত হল ঃ

''মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্যে তাঁর জীবনে প্রতিপাদিত হয়েছে, তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সে-সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে, সে-বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

''মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল, তা জনসমাজে প্রবর্তন।

''ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাতে তারা দেশ-দেশান্তরে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারেন, তার উপায়-অবলম্বন।''

পরিশেষে একথা স্পষ্টতার সঙ্গে বলা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ নিজে কেবল যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন তা নয়, অনাগতকালের মানুষের কাছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও কর্মকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে রামকৃষ্ণ সংঘ সৃষ্টি করলেন তাদের কর্মপ্রণালী ও আদর্শের মধ্যে চিরকালের জন্য এই আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রবেশ করিয়ে সমগ্র ভাবান্দোলনটিকেই এক অতি আধুনিক প্রগতিশীল মাত্রাভিমুখীন করে গেলেন।

A. R. Reinocourt তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Eye of Shira'-তে দেখিয়েছেন কী ভাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা ও আধুনিক পদার্থবিদ্যা একটি জায়গায় মিলিত হয়েছে ঃ ''From its modern awakening with Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda eastern mysticism has begun to adopt its revelations to the entirely different culture framework provided by science and technology, without in any way sacrificing what is valid in the traditional understanding of the phenomenon itself.''

Mr. Reinocourt সর্বশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ''After Vivekananda's interpretations of Vedanta in the language of modern science 'Indian mysticism has evolved… as the science of physics itself leading towards an 'inevitable convergence of the two'.

তথ্যসূচি

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৪০৮, পৃ ৫৬
২। ঐ, ২য় খণ্ড, ১৪০৭, পৃ ৭৮
৩। ঐ, পৃ ৭৮-৭৯
৪। ঐ, ৫ম খণ্ড, ১৪০৮, পৃ ৩০০
৫। ঐ, পৃ ১৮৪
৬। ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬, পৃ ২০৫
৭। ঐ, পৃ ৯৫-৯৬
৮। ঐ, পৃ ৯৮
৯। ঐ, ১ম খণ্ড, ১৪০৭ পৃ ১৬৩-১৬৪
১০। ঐ, ২য় খণ্ড, ১৪০৭, পৃ ৯
১১। ঐ, ১০ম খণ্ড, ১৪০৮, পৃ ১৫৮-১৫৯
১২। ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৬, পৃ ১০২, ঐ, ২য় খণ্ড, ১৪০৭, পৃ ২৩৩

Do not spend your energy in talking but meditate in silence; and do not let the rush of the outside world disturb you. When your mind is in the highest state, you are unconscious of it. Accumulate power in silence and become a dynamo of spirituality.

— Swami Vivekananda

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

শুভ সূচনা

রেবা দেবী (প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা)

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়।।

সুদূর অতীতের ঋষিমুখ-নিঃসৃত এই প্রার্থনা শুধু একটি মাত্র ঋষির প্রার্থনা নয়, এ প্রার্থনা সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের চিরন্তন প্রাণের প্রার্থনা। কাল-প্রবাহ যখনই মানুষ ভুলেছে তার এই প্রাণের প্রার্থনা, তখনই ভগবান যুগোপযোগীভাবে আবির্ভূত হয়ে মানবমনে জাগিয়ে তুলেছেন অনির্ব্বান আলোর পথে যাবার ঐকান্তিক আকাঙ্খা।

চলমান কালের জটিল আবর্ত্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনই এক দুর্যোগপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে তমসাবৃত সমাজ-জীবনে চিরন্তন প্রাণের আলো জ্বালাতে ত্রিধারায় ধরার বুকে নেমে এলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। করুণাবতার ভগবান, পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকতার অন্ধকূপে নিমজ্জমান জাতিকে দেখালেন অমৃত লোকের পথ, নিজ শক্তি স্বরূপিনী সারদা দেবীকে দিলেন নারীশক্তিকে স্বরূপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ভার; আর বিশ্বআলোড়নকারী বিশ্ববিবেককে দিলেন বিশ্বমানবকে জাগ্রত করার দায়।

যুগমাতা মা সারদা যুগের ভার বহন করে তৎকালীন দেশের সর্ব্বত্র নারীজাতির লাঞ্ছনার কারণ 'অজ্ঞতা' এই সত্যটি উপলব্ধি করে নারীমনের অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করতে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেবার জন্য তাঁর শিক্ষিতা কন্যাগণকে করেছেন অনুরোধ আর যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ দেশকে প্রবুদ্ধ করার মন্ত্রে বলেছেন, —'জাতীয় জীবনে চাই শিক্ষার বিস্তার'।

জগন্মাতার ইচ্ছায়, স্বামীজীর আহ্বানে দেশের নারীসমাজের উন্নতিকল্পে তৎকালে কতিপয় নারীমনে জেগেছিল দুর্ব্বার আকর্ষণ। এই আকর্ষণের টানেই সংসারের ভোগসুখ পদদলিত করে স্বামীজী-প্রদর্শিত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দুই কৃপাধন্যা কন্যা পরম পূজ্যা মীরা দেবী ও বাণী দেবী। স্বামীজী পরিকল্পিত কর্মক্ষেত্রে জীবন— যৌবনের সমগ্র সাধনা ঢেলে দিয়ে একটি শিক্ষামন্দিরকে বর্ত্তমানের আদর্শ বিদ্যামন্দিরে উন্নীত করে মাতৃ-ইচ্ছায় যথা সময়ে একান্তে সরে এসে মাতৃধ্যানে আত্মলীন করে দিয়েছিলেন মাতৃগতপ্রাণা এই দুই বজ্রকঠিন সন্ন্যাসিনী। ধ্যানের অতল গভীরে মগ্ন হলেও এই দুই শিক্ষাব্রতধারিনীর প্রাণের তন্ত্রীতে সর্ব্বদা বেজে চলেছিল বিশ্ববিবেকের সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ, — 'দেশকে জাগাতে চাই— শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা'। শিক্ষামন্ত্রে উদ্দীপ্তা ধ্যানোত্থিতা এই দুই সন্ন্যাসিনীর ধ্যানলব্ধ রূপের প্রকাশ এই 'শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়'।

এই প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথায় মনের মনি কোঠায় উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়েছে ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারি কল্পতরু দিবসটির কথা। নিউআলিপুরের এন্ ব্লকে ৫৪৬ নং প্লটে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নিয়োগী মহাশয়ের বাড়ীর একতলার উত্তরপূর্ব্ব কোণের ঘরটিতে শ্রী শ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সাজিয়ে পূজার আসনে বসলেন মাসীমা (মীরা

দেবী), আর ধ্যানের আসন নিলেন বানীদি (বাণী দেবী)। দুই আসনে দুই দেহ স্থির নিষ্পন্দ। ধ্যানের প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র পরিমণ্ডলে, দুই আত্মা একাত্ম হয়ে ধ্যানের গভীরে করছেন মাতৃ আরাধনা আর সেই দিব্য ভাবের দ্যোতনায় সকলেরই মন তখন হয়ে উঠছে অন্তর্মুখী। এই দিব্য ভাবময় পরিবেশে প্রথমে ভাবের পূজা সম্পন্ন করে সমগ্র মন প্রাণ ঢেলে মাসীমা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা। এই পূজা আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনার পূজা নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তরে আঁকা আছে এ পূজার দিব্য ভাবঘন আনন্দপূর্ণ পরিবেশ। পূজান্তে মাসীমা সকলকে একসাথে দেওয়ালেন পুষ্পাঞ্জলি। এই ভাবে এক-মন, এক-প্রাণ, একভাবময় আবেশের মধ্যে আশীর্ব্বাদ উপলব্ধি করে মাসীমা, বানীদি এই দিনটিতে করলেন শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের শুভ প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

পরদিন ২রা জানুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্ম তিথি দিবসে শুরু হলো ছাত্রী ভর্ত্তির কাজ। প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী অমিতা ব্যানার্জ্জীকে শিশুশ্রেণীতে (Infant Class) ভর্ত্তি করালেন মাসীমা, বানীদি দুজনে মিলে। সেই দিনই ভর্ত্তি হলো শ্রীমতী শিবানী ভট্টাচার্য, বনানী চ্যাটার্জ্জী, সুমিতা মুখার্জ্জী, কাজল রায় ও গোপা সোম। প্রথম দিনের ছাত্রী সংখ্যা এই ৬ জন। জানুয়ারী মাসে ভর্ত্তি হয়েছিল মোট ৩০ জন ছাত্রী। ২রা জানুয়ারী ছাত্রী ভর্ত্তির কাজ আরম্ভ হয়েছিল বলে ঐ দিনটিই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে প্রথমাবধি।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকার্য্যে অকুণ্ঠ সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নিয়োগী মহাশয় বিনা ভাড়ায় তাঁর বসত বাড়ীর একতলাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করার জন্য। প্রতিষ্ঠা দিবসের পর থেকে ১ বৎসর ৩ মাস বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হয়েছিল এই বাড়ীতে। এ জন্য এই বিদ্যালয় চিরদিন ঋণী থাকবে এই মহানুভব দম্পতির কাছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিভিন্নমুখী সাফল্য ও কৃতিত্বের সংবাদ আজও আনন্দমুখর ও উৎসাহ মণ্ডিত করে তোলে বিদ্যানুরাগী এই প্রাণময় পুরষটিকে।

বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন কার্য শুরু হয় ৭ই জানুয়ারী। বিদ্যালয়ের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও আশ্রম অধ্যক্ষা শ্রদ্ধেয়া মীরা দেবী প্রবীণ বয়সে আবার সানন্দে গ্রহণ করলেন শিক্ষিকার গুরুদায়িত্ব। প্রথমা সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া বানী দেবী, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঊষা দেবী, অনিলা দেবী, অধুনা স্বর্গতা শোভা দেবী ও রেবা দেবী শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় ভক্তগৃহ থেকে মাসীমা এনেছিলেন রাণুদি (শ্রীমতী বিজয়া সেন) ও সুলেখা বক্সীকে। এঁরা দুজনে যেন আশ্রমেরই অঙ্গ। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার এরপর নিয়ে আসা হলো শ্রীমতী বেলা ঘোষকে। শ্রীমতী রেখা, যূথিকা ও গীতা প্রভৃতি কয়েকজন কলেজের ছাত্রীও কিছুদিন শিক্ষা কার্য্যে সাহায্য দান করেন। স্বর্গীয়া অনুপমা চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সাধনা গুহ, শ্রীমতী ভবানী সরকার, শ্রীমতী শোভা রায় প্রভৃতি ভক্ত মহিলাগণ সমাজ সেবা হিসাবে কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্যে সহায়তা দান করেন।

বিদ্যালয়ের কার্য্য চালু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই স্তবের লাইনে মাসীমা (মীরা দেবী) বানীদি (বানী দেবী) ঊষাদি, শোভাদি, অনিলাদি ও আমরা সকলে দাঁড়াতাম এবং মেয়েদের সঙ্গে সমানভাবে সবাই স্তব গাইতাম। সে স্তবের সুর ছিল কত সুন্দর! মাসীমা, বানীদি, ঊষাদি, অনিলাদি সকলে ভাল গাইতে পারতেন। তার মধ্যে মাসীমা ও ঊষাদির দরাজ গলার উদাত্ত স্বরলহরী সর্ব্বোপরি মাসীমা, বানীদির ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এক ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি করত এই স্তবের লাইনে।

নিউ আলিপুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে ৮০/১এ ল্যান্স ডাউন রোডের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত শ্রীসারদা আশ্রম থেকে স্বর্গীয় হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের একটি Pick up Van কিছু দিন আশ্রমের শিক্ষিকা ও ছাত্রীগণকে নিউআলিপুরে পৌঁছিয়ে দিত। সে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন। মাসীমা, বানীদির সঙ্গে এই আসা যাওয়ার কালে সকলে যেন মেতে উঠত উৎসব আনন্দে। সে দিনের আনন্দ আজ আর পাইনা খুঁজে কোথাও। ১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ্চ নিয়োগী মহাশয়ের বাটির দোতলাটি ভাড়া নিয়ে ল্যান্স-ডাউন রোড থেকে শ্রীসারদা আশ্রম উঠে আসে নিউ আলিপুরে। স্থানাভাবে এই সময় দোতলার বারাণ্ডাতেও নেওয়া হতো ২/১টি ক্লাস।

সবে মাত্র স্কুল চালু হয়েছে; সাজসজ্জা বলতে তখন কিছুই নেই। মাত্র তিনখানি ঘর। প্রতি ঘরে ২/৩ টি করে ক্লাস চলছে। মাঝে মাঝে বারাণ্ডাতেও ক্লাস বসতো। বারাণ্ডার একপাশে করণিকের অভাবে ঊষাদিই করতেন করণিকের কাজ। সিঁড়ির তলায় ছোট্ট একটু জায়গা চট দিয়ে ঘিরে তখন হয়েছে শিক্ষিকা গৃহ (Teachers' Common Room)। স্ত্রী শিক্ষা বিভাগের প্রধানা পরিদর্শিকা (Chief Inspectress of Women's Education) স্বর্গতা মনোরমা বসু সেই সময় একদিন এলেন বিদ্যালয় পরিদর্শনে। তখন সবে মাত্র স্তব আরম্ভ হয়েছে। তিনি এসে ঐ স্তবের লাইনের কাছে দাঁড়ালেন, স্তব শুনে ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এই ভাবময় পরিবেশটি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। মাসীমা, বাণীদির সঙ্গে কথা বলে, ঊষাদির রাখা হিসাব ও খাতাপত্র দেখে তিনি এতই খুশী হ'লেন যে এই পরিদর্শনেই তিনি আড়ম্বরহীন এই ছোট্ট স্কুলটিকে স্বীকৃতি (Recognition) দিলেন। তবে লিখিতভাবে সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া গেল ১/৪/৫৮ তারিখে।

বিদ্যালয় স্থাপনের কিছু পূর্ব্বে, মাতৃকৃপায় ও মাসীমা, বাণীদির দৃঢ় ইচ্ছায় ভিক্ষালব্ধ অর্থে ১৪ কাঠার মত জমি কেনা হয়েছিল নিউ আলিপুরের 'ও' ব্লকে। এই কার্য্যে স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ সরকার এবং স্বর্গীয় রতন মোহন চ্যাটার্জী মহাশয়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে আরও কিছু জমি কিনে বর্ত্তমান আশ্রম, স্কুল ও ছাত্রীভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় ২ বিঘারও কিছু বেশী জমির উপর। জমি সংগ্রহের ব্যাপারে স্বর্গীয় ললিত মোহন বক্সী মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছে এই বিদ্যালয়।

জমি সংগ্রহের পর শুরু হলো বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ। মাতৃচরণে সমর্পিত প্রাণ নিঃসম্বল ৫টি কন্যা মায়েরই নাম

সম্বল করে ঝাঁপ দিলেন এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। মাতৃকৃপায় তখন সহায়িকারূপে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজুর কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার। টাকার জন্য একদিকে অফিসে ঘুরছেন ঊষাদি ফাইলের স্তূপ বুকে নিয়ে আর একদিকে সুভদ্রাদি নানা ট্রাষ্ট ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নীরবে দান করে যাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে। তাঁর অতুলনীয় দানের কথা বলতে গিয়ে মাসীমা একদিন বলেছিলেন, ''সুভদ্রা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সেবক সুরেশ মিত্রের স্থান গ্রহণ করেছে শ্রীসারদা আশ্রমে।'' কাজ এগিয়ে চলে মাসীমা, বাণীদি ও ঊষাদির জীবনপাতী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ঊষাদি সারাদিন ঘোরেন, কখন টাকার জন্য, কখন সিমেন্ট, লোহার জন্য নানান জায়গায়, আর মাসীমা, বাণীদি এন্ ব্লকের বাড়ী থেকে দুবেলা এসে ভিত খোঁড়া থেকে তিন তলার গাঁথুনী পর্য্যন্ত সব কিছুর তদারকী করেন ঘুরে ঘুরে আর প্রতিটি ইঁটের গাঁথুনিতে যেন বীজমন্ত্র জপে দিয়ে যান তাঁদের আদর্শকে সফল করার জন্য এবং প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানান শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় এই বিদ্যামন্দিরে।

এই কার্য্যোপলক্ষে মাসীমা একাধিক দিন বলেছেন, —''অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি, স্পষ্ট অনুভব করেছি, শ্রীশ্রীমা চাইছেন, এইটা হোক; তাই আজ এ স্কুল হয়েছে।'' আবার বলেছেন, ''শ্রীশ্রীমা নিজে পুজো করে নিবেদিতা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এ স্কুলের বেলায়ও দেখছি, সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে।'' মা বলেছিলেন,—''আমাদের দেশের মেয়েদের বড় দুঃখ মা, তোমরা কেবল তাদের চোখটা ফুটিয়ে দাও।'' ''এটি মায়ের আদেশ, তাইতো আবার এই প্রাণপাতি সংগ্রাম।''

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৬৫ সালে বাণীদির বিশেষ উক্তিটি। এই সময় খুবই অসুস্থ অবস্থায় কথা প্রসঙ্গে বাণীদি একদিন বলেছিলেন, ''আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, আমার যা হয় হোক্ তবু যে আদর্শের জন্য প্রাণপাত করলাম তা যেন সার্থক হয়। তাই বোধ হয় আজ দেহের এই অবস্থা। দেখ্, কোন একটা বড় জিনিস গড়ে তুলতে হলে, দু একটা জীবন শেষ করে দিতে হয়, না হলে কোন বড় জিনিস গড়ে উঠতে পারে না।'' কথাগুলো মনে করিয়ে দেয় দধীচি মুনির অস্থি প্রদানের কথা। বাণীদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,— ''কি আপনার আদর্শ?'' শারীরিক অসুস্থতা ভুলে গিয়ে বাণীদি তৎক্ষণাৎ উঠে বসে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন, —''প্রাচ্যের আদর্শ পরিপূর্ণ বজায় রেখে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা মেয়েদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের কর্মের আদর্শ। এ আদর্শ যেন বজায় থাকে এবং এ আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের কাজ যেন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে এই প্রার্থনাই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে জানাচ্ছি অবিরত।'' কথা কটি শুনে মনে হল, জীবনের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর আদর্শে যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই আদর্শের জন্য এঁরা সারাজীবন সংগ্রাম করে চলেছেন অবিচ্ছিন্নভাবে। শুধু এই একটি মাত্র বিদ্যালয়ের জন্য নয়, অপর একটি বিদ্যালয়ের গঠন কার্য্যের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় দান করে সেখানে রেখে এসেছেন তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। আজ এই জীবন-সায়াহ্নে অন্তর্যামী দেবতার কাছে জীবনের বিনিময়ে চাইছেন সেই আদর্শেরই জয়। কী অবিচল সুগভীর এঁদের আদর্শ নিষ্ঠা!

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে সময়ের তালে পা ফেলে এসে গেল ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট— স্বাধীনতা দিবস। বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণের কাজ তখন বেশ কিছুটা অগ্রসর হলেও নীচের হলঘরটির ছাদ তখনও ঢালাই হয়নি এবং মেঝেও ছিল কাঁচা। মাসীমা, বাণীদি ঐ হলঘরটিকেই বেছে নিলেন স্বাধীনতা দিবস পালনের ক্ষেত্ররূপে কারণ বিদ্যালয়ের মাঠের জমি তখনও আশ্রমের অধিকারে আসেনি। ১৫ই আগস্ট প্রাতঃকালে মাসীমা, বাণীদি দুজনে মিলে পরম উৎসাহে পতাকা উত্তোলন করে প্রথম পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন এক উজ্জ্বল আনন্দময় পরিবেশে। এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী সরকার। পতাকা উত্তোলন করে মাসীমা বলেছিলেন,— 'তোমরা জেনে রেখো, আজ আমি শুধু স্বাধীনতার পতাকা তুলিনি, শ্রীশ্রীমাকে সামনে বসিয়ে মায়ের ইচ্ছানুসারে মায়ের হয়ে আমি সমগ্র নারীজাতির স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিলাম। তোমরা কিন্তু এ পতাকাকে কখনও অবমাননা করো না। নারীজাতির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা যেন লাঞ্ছিত না হয়। এ জন্য নারীজাতিকেও অবশ্য তাঁদের মর্য্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মেয়েদের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ এমন হবে যা সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সকলে তাঁদের সমীহ করে চলবে।''

আশ্রম প্রসঙ্গে বাণীদি একদিন বলেছিলেন, ''পবিত্রতার আদর্শ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে। পবিত্রতা কি, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। পবিত্রতাকে আদর্শ করে চলতে হবে, সত্যকে ধরে থাকতে হবে, আর নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। যে মেয়ে, পবিত্রতাকে আদর্শ করে চলবে, সত্যকে ধরে থাকবে এবং নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপরই থাকবে।''

মাসীমা, বাণীদির চলার পথের নীতি— পবিত্রতা, সত্য ও নারীর স্বাতন্ত্র্য এই প্রতিষ্ঠানে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল একটি বিশেষ সংবিধান রচনার। এই সংবিধান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয় ও সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এ কার্য্যে সহায়তার জন্য এগিয়ে এলেন, স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন প্রধানা পরিদর্শিকা এবং লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পরম শ্রদ্ধেয়া স্বর্গীয়া সুনীতিবালা গুপ্তা। তিনি ছিলেন তখন শ্রীসারদা আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির সভানেত্রী। তাঁর সুগভীর চিন্তা ও বিচক্ষণতায় রচিত হলো একটি বিশেষ সংবিধানের খসড়া। কিন্তু খসড়াটি সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন না পাওয়ায় খসড়াটির কিছু অংশ পরিবর্ত্তন করে বর্ত্তমান সংবিধানের রূপ দেওয়া হয়। তবে বিদ্যালয় ও সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা

পরিচালিত হবে এবং আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতির সম্পাদিকাই বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিতেও সম্পাদিকা হবেন, এ প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উভয়েই মেনে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ভবানীশঙ্কর চৌধুরী ও সমরেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছে এই প্রতিষ্ঠান।

এ দিকে নির্ম্মীয়মান বিদ্যালয় ভবনের কাজ কিছুটা বাসোপযোগী অবস্থায় আসায় ১৯৫৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথি দিবসে বিদ্যালয় ভবনে গৃহ-প্রবেশ ও গৃহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ দিন সকালে শ্রদ্ধেয়া ডঃ রমা চৌধুরীর সঙ্গে নূতন বাড়িতে আসার সময় মাসীমা চোখের জলে সিক্ত হয়ে রমাদিকে বলেছিলেন, ''তোমরা সকলে বল, শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।'' গৃহপ্রবেশের দিন সকলের কল্যাণার্থে যাগ-যজ্ঞ, পূজা হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি বিধিপূর্ব্বক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। চারজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত গৃহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য এবং ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা কার্য্য সম্পন্ন করেন। দোতলার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘর দুটিতে এই সকল পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিদ্যালয়টি ১/৪/৫৮ তারিখে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্ত্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। পরের দিন ২/৪/৫৮ তারিখে বিদ্যালয় নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ দিন হতেই এই ভবনে শিক্ষাদান কার্য্য চলতে থাকে। বিদ্যালয়ের কার্য্য নূতন ভবনে চালু হবার কিছুদিন পূর্ব্ব হতেই মাসীমা, বাণীদি এই নূতন বাড়ীর একতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে বাস করছিলেন সব কিছু দেখা শোনার সুবিধার জন্য। ১৯৫৮ সালেরই ২০শে মে, ২রা বৈশাখ আশ্রম ও ছাত্রীভবন নিয়োগী মহাশয়ের বাড়ী হতে সম্পূর্ণভাবে উঠে আসে এই নূতন বাড়ীতে। তিন তলার ছাত্রীভবনের ২৪ নং ঘরটি ঠাকুরঘররূপে সজ্জিত হয়। ২৭ নং ঘরটি মাসীমা, বাণীদির বাসগৃহ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। এই ২৭ নং ঘরেই মাসীমা বাণীদি বাস করে গিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

বিদ্যালয় ভবনের প্রতিষ্ঠা ও গৃহ প্রবেশের পর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব পালিত হয় ১৯৫৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। এইসঙ্গে তিনদিনব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মমহোৎসব পালিত হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন তদানীন্তন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং সভার পৌরাহিত্য করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীসারদা আশ্রম এবং শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ও মনোজ্ঞ লিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

মাতৃকৃপায় বিদ্যালয়টি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে ও ১/৬/৬১ তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ১/১/৬৩ তারিখ হতে বহুমুখী বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হয়। শিক্ষা-জগতে ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে ১৯৭৭ সাল থেকে এ বিদ্যালয় আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্থানাভাবই এর প্রধান কারণ।

বিগত ২৫ বৎসরে এ বিদ্যালয় মাসীমা বাণীদির আদর্শ কতটা রূপায়িত করতে পেরেছে জানি না, তবে যখন দেখি ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শিশুগুলি কেউ বা অঞ্জলি ভরে কেউ বা একটি কি দুটি ফুল হাতে নিয়ে ওদেরই প্রার্থনাগৃহে ফুলে ফুলে ঢেকে দিচ্ছে মাতৃচরণ, প্রশ্ন করে যখন ওদেরই ছোট্ট মুখে শুনতে পাই— ''মা সারদা সরস্বতী'' ''মা আমাদের বিদ্যা দেবেন'' ''এটি মায়ের মন্দির কিনা তাই এখানে নোংরা ফেলতে নেই''; আবার যখন দেখি বহু ছাত্রী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার মুখে নতমস্তকে প্রবেশদ্বারের ধূলি মস্তকে ধারণ করছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় ওরা বুঝি বা বিদ্যালয়কে মাতৃমন্দির এবং মাতৃপূজার স্থান রূপেই গ্রহণ করেছে মনে প্রাণে। তাই বিদ্যালয় সংলগ্ন ছোট উদ্যানের ফুল ওদের কাছে মাতৃপূজার উপচার। তাই নবাগত কোন শিশু বৃক্ষ হাতে ভূমিতে পতিত কোন ফুলে হাত দিলে অমনি ''দিদি ও মায়ের পূজার ফুলে হাত দিয়েছে'' বলে অভিযুক্ত হয় শিশু ছাত্রীদের আদালতে। যেন কত বড় অপরাধে অপরাধী সেই শিশু। এই যে শ্রদ্ধা, এই যে কর্ম্মের সঙ্গে উপাসনাকে এক করে দেখবার ক্ষুদ্র প্রয়াস এটিই তো প্রাচ্য আদর্শের বীজমন্ত্র। এর কি কোন প্রভাব থাকবে না ওদের ভবিষ্যৎ জীবনে? শিক্ষার মানের দিক থেকে এই বিদ্যালয় যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিশেষ আস্থাভাজন বিদ্যালয়রূপে স্থান করে নিয়েছে দক্ষিণ কলিকাতার সমাজে তা আজ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এ সবই শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ, মাসীমা বাণীদির দৃঢ় সঙ্কল্প, সকলের শুভ ইচ্ছা এবং শিক্ষিকাগণের একনিষ্ঠ প্রয়াসের ফল।

২৫ বছরের সাধনা-পূত এই বিদ্যালয় অঙ্গনে মহাসরস্বতী স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা স্বরূপে আবির্ভূতা হয়ে এ উৎসব আয়োজনকে সার্থক করে তুলুন এবং বিবিধ ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের আদর্শ রক্ষার ও সুনাম বৃদ্ধির শক্তি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করুন এই প্রার্থনাই আজ সমবেত ভাবে জানাই আমরা সর্ব্বংসহা জ্ঞানদায়িনী মা সারদার অভয় চরণে।

> Every duty is holy, and devotion to duty is the highest form of worship of God. By doing well the duty which is in our hands now, we make ourselves stronger, and improving our strength in this manner step by step, we may even reach a state in which it shall be our privilege to the most coveted and honoured duties in life and in society.
>
> — Swami Vivekananda

The Leader

Swami Ishatmananda

The word leader is known to all; but not everybody realizes the importance and significance of the word. Besides, the qualities that make for a true leader are very rare. The survival, growth, and progress of every society depend largely on its leaders. And every society every collection of living beings, be it a group, clan, class, herd, or horde- inevitably has a leader. If a leader is weak, indecisive, or short-sighted, the group he or she is leading is bound to be destroyed- be it human society, or a society of beasts, birds, or insects. If a leader is courageous, intelligent, and decisive, the people under him will surely succeed in all respects; likewise among other beings.

The word leader immediately brings to mind the image of a king or statesman, politician or general, boss or strongman. But human life is very complex, and in its different stages is guided, motivated, and governed by different leaders. The life of an individual begins in a family; the head of the family is the leader there. If he or she lacks in leadership qualities, all the members of the family suffer. The decision of the head of the family is often destiny for the other members of the family. If the family head decides that education is unnecessary for the family's younger members, then those younger members are destined to lead illiterate lives. Similarly, a student begins to grow in an educational institution; the principal is the leader there. If the principal is bereft of leadership qualities, the student's growth is arrested.

The head of a family, the principal of an institution, the chief of a village; such people, whom we usually do not consider as leaders, are our real leaders. If they fail to perform as true leaders- knowingly or unknowingly- they bring about a tremendous loss of human resources.

Who is a Leader?

Leaders fall into four categories, differentiated by the kind of work they do and the effect they have on others: (i) temporary, (ii) semi-permanent, (iii) permanent and (iv) eternal.

Temporary Leader: Those who influence and guide a small group of people in a particular situation for a limited period of time may be termed temporary leaders.

In the wake of accidents and natural calamities like floods and earthquakes, there may be an individual who meets the challenges of the occasion and leads, guides, or organizes people. He or she may or may not have the qualities which are required of other types of leaders, but

is generally obeyed by the people, and is able to effect good results.

Semi-permanent leader: Those who guide and govern a small group of people for a period of time and influence them for good or bad, thereby making a mark on society, are semi-permanent leaders.

The head of a family, institution, or village; the abbot of a monastery, the CEO of a company, a military commander, an MLA, a chief minister of a state, and even a prime minister or a king of a small kingdom are examples of semi-permanent leaders.

Semi-permanent leaders ought to have leadership qualities. Lacking these, their decisions and guidance will be marred by mistake and follies, and thus people under their leadership will suffer. In a small, and sometimes a big way, semi-permanent leaders may make or mar human society.

Permanent leader: Those who lead a whole nation or population, whose influence and teachings are followed from generation to generation in that nation or population, who also sometimes inspire other nations, and who create history and remain enshrined in it, can be called permanent leaders. Kings like Ashoka and Akbar, military leaders like Napoleon, political revolutionaries like Lenin, statesmen like Abraham Lincoln, and politico-spiritual leaders like Mahatma Gandhi are permanent leaders.

Permanent leaders possess tremendous personal power and charisma and thereby influence their followers. In times of trial and tribulation, their followers neither doubt their leader nor question his or her personality. The important leadership qualities that we discuss below are absolutely essential for the making of good permanent leader.

Many thinkers of present-day India lament the partition of the country, the problem of Kashmir, the creation of states on the basis of language, different laws for different communities, inefficient education policies, criminality of Indian law-makers, and other difficulties and tragedies faced by the Indian people. The point is clear; decisions of its leaders, past and present, are affecting the nation today. Some decisions taken long back will continue to affect the nation for generations to come. Hitler's leadership of Germany brought suffering to the whole world, a misery which has not yet seen its end.

Therefore, a democratic Country like India needs to be very careful in choosing and accepting its leaders.

Eternal leader: Enlightened souls, great philosophers, seers- those who inspire not only a race or a nation, but the whole of humanity, whose leadership transcends all castes, creeds, and linguistic and cultural barriers, and does not remain confined to any geographical boundary, because they govern through unselfish love- are eternal leaders. Though they are born at different places, in different times, wear different dress, and speak in different languages, yet their ideals are one: Be good yourself and do good to others.

The problems of the world come not from these 'lights of humanity' but from their followers. Most of the time, the catholic teachings of these great ones are misunderstood and misinterpreted by their over-enthusiastic followers. Ironically, their message of love is often spread through hatred and violence.

Media as Leader

In a remote part of India, where a television is virtually the only connection with the rest of the world a group of young students insulted and abused their principal for a petty reason: he had arranged every thing for them for a picnic. 'In a government institution, how could the in-charge take a sudden decision like that?' They said, The principal stood his ground. Infuriated, the students slapped the gentleman in front of others. The principal felt so humiliated that he wanted to commit suicide. Only timely intervention of the local people and police saved his life.

When the students were asked why they did this, they replied, 'Why, the students of Bombay also do things like this!'

'Bombay students? How do you know?'

'We have seen it in such-and-such movie.'

A day or two before this incident, a well-known figure who is labelled in media circles as a 'cultural ambassador of India' was vehemently advocating freedom of cinema, and denounced the cinema censor board. 'Let people select what they like to see!' he said. Freedom is good: but are we, the people to whom freedom of choice is given, capable of exercising that freedom responsibly?

In present-day society the media is very powerful, and has emerged as a kind of semi-permanent leader. The people working in the media- cinema, television, radio, and print- must exercise responsibility concomitant with the media's position as a semi-permanent leader of society.

Since the whole of humanity is affected by the interpretation or guidance of the apostles, messengers, and disciples of the great souls, they too need to have all the qualities of a leader- else they, the exponents, the so called torch-bearers of a particular

faith, may transform nectar into poison.

Qualities of the Successful Leader

Ancient Indian thinkers gave a lot of importance to leaders and leadership. A bad leader means not merely a single bad person, but a bad fate for many.

Vidura Niti: A king's basic duties

• A king should wish for the prosperity of all and should never set his heart on the misery of his subjects.
• A king should look after people who have fallen into adversity and who are in distress.
• A king should show kindness to all creatures.
• A king should never impede the growth and development of agriculture and economic activity in his kingdom
• A king should always do that which is for the good of all creatures.
• A king should always be ready to protect those dependent on him
• A virtuous king is never indifferent to even the minutes suffering of his subjects.
• A virtuous king enlists the confidence of his devoted subordinates by zealously looking after their welfare.
• A king who renounces lust and anger, who bestows wealth upon proper recipients, and who is discriminative, learned, and active is regarded as an authority by all men.
• A king who desires the highest success in all matters connected with worldly profit should, from the very beginning, practise virtue. Prosperity takes its birth in good deeds.

What a king must avoid

• The friendship of the sinful has to be avoided.
• Misuse of wealth, harshness of speech, and extreme severity of punishment will ruin even firmly established monarchs.
• Evil-minded kings, due to lack of sense-control, are destroyed by lust for expanding their territory.
• A king's prosperity built on mere crookedness is destined to be destroyed.
• A king should never make a person his minister without examining him well. During examination a king should reject those who are ungrateful, shameless, who have wicked dispositions, and who don't give others their due.

Vidura, the step-brother and learned minister of king Dhritarashtra, has explained the most important qualities a leader should have, and has also spoken at length on leadership and administration. Vidura's advice and utterances are known as 'Vidura Niti'. The Vidura Niti is a small section of eight chapers (33 to 40) of the 'Udyoga Parva' of the great Indian epic Mahabharata.

Vidura prescribes the following values for a ruler to be a perfect leader: simplicity, purity, contentment, truthfulness, self-restraint, patience, honesty, charity, steadiness, humility, faith, exertion, forbearance, sweetness in speech, and good company.

Kautilya, another famous thinker on leadership and statesmanship in ancient India, emphasizes that the foundation of an organization is its financial strength, its economy. No good organization or country can run effectively without having its economy in good condition. According to Kautilya, the objective of any king is to create, expand, protect, and enjoy wealth. A leader should know that spending wealth in the proper manner is as important as earning it. In his famous book Arthashastra (Economics), he tells the king. 'Be ever active in management of the economy, because the root of wealth is economic activity; inactivity brings material distress. Without any active policy, both current prosperity and future gains are destroyed.'

According to Kautilya, a good leader should know how to handle the masses and people with different temperaments, attitudes, and thinking capacity. Understanding people is the most important quality of a leader. Kautilya felt that a king or a leader should know the secrets of administration, which according to him include (i) Sama, counselling; (ii) Dana, offering gifts; (iii) danda, punishment; and (iv) bheda, separation.

Sri K V Rao, in his research on the 'Sundarakanda' of the Ramayana, found that all the best qualities of a leader are present in Mahavir Hanuman; (i) motivation, (ii) communication, (iii) determination, (iv) sharp intellect, (v) excellence at work, (vi) courage, (vii) commitment, (viii) mind control, (ix) self-confidence, and (x) integrity or trustworthiness.

Swami Vivekananda on Leadership

Swami Vivekananda, one of the greatest thinkers modern India has produced, is very specific about the qualities of a leader. According to him, the position of a leader is not for enjoyment but for sacrifice. He says, 'It is a very difficult task to take on the role of a leader- One must be Dashoshya Dash- a servant of servants, and must accommodate a thousand minds. There must not be a shade of jealousy or selfishness, then you are leader.'1

There are two types of administration: by fear and force, and by love and

loyalty. History shows that most leaders prefer the first method: by fear and force. But Swami Vivekananda advocates the second method of administration. In his opinion, 'The best leader, however, is one who "leads like the baby". The baby, though apparently depending on everyone, is the king of the household. At least, to my thinking, that is the secret [to being the best leader]' (8.428).

The administrator who wants to rule through love and loyalty needs a perfect character. He or she must be impersonal, equal to all, and above all, unselfish. Such a leader should draw love and respect equally from his or her followers. According to Swamiji. 'There is no allegiance possible where there is no character in the leader, and perfect purity ensures the most lasting allegiance and confidence' (6.135).

In a letter to Sister Nivedita, he divulges the secret of his leadership: 'I see persons giving me almost the whole of their love. But I must not give anyone the whole of mine in return, for that day the work would be ruined. Yet there are some who will look for such a return, not having the breadth of the impersonal view. It is absolutely necessary to the work that I should have the enthusiastic love of as many as possible, while I myself remain entirely impersonal. Otherwise jealousy and quarrels would break up everything. A leader must be impersonal. I am sure you understand this. I do not mean that one should be a brute, making use of the devotion of others for his own ends, and laughing in his sleeve meanwhile. What I mean is what I am, intensely personal in my love, but having the power to pluck out my own heart with my own hand. If it, becomes necessary, "for the good of many, for the welfare of many." As Buddha said' (8.429).

Pitfalls to Effective Leadership

One day in the office of a secretary to the Government of India, a very senior IAS officer and a few other high-ranking officers— assistant secretaries, directors, and so on— were drinking tea and chatting after their official work. Suddenly one gentleman displayed a newspaper and, pointing to the picture of a present-day national leader, said, 'He has been judged first in a popularity assessment by securing 47 per cent of the votes (of the readers of that particular newspaper).' The senior IAS officer looked at the paper with disgust, and shrugged and snorted.

His body language clearly revealed his dislike. He then looked at me and asked, 'Swamiji, why can we Indians not become good leaders and administrators? Though from 1947 we have travelled a long way, and statistics show that great progress has been made within these few years, yet we have lost our values and all self-respect. Why? What is your opinion about the degradation of leadership quality, degradation of moral values, and how we can overcome these?'

This shrug, this snort, these questions, can be seen and heard everywhere in India. This widespread disrespect for leaders is not a healthy sign.

There was a time when the world was mad to discover India. Adventurous people sailed over rough uncharted oceans to reach her shores. In prosperity, in wealth, in education, in spirituality, in every respect India was a beacon light. Pre-independence India leaders and masses joined the freedom movement not for post or position but as a sacred duty. They fought against the British not with a selfish motive but with a seal for sacrifice. Why then do we find few such people or little of these qualities among our present-day leaders? What happened to our leaders once they began to rule the country?

Swami Vivekananda gives the answer to this question in two short words: 'Slave mentality'.

What is slave mentality? Swamiji writes, ' "I won't let anyone rise!" that jealousy, that absence of conjoint action is the very nature of enslaved nation. …Our fellows in this respect are the enfranchised negroes of this country [USA]- if but one amongst them rises to greatness, all the others would at once set themselves against him and try to level him down' (6.286).

Indians were excluded from positions of national leadership for nearly eight hundred years. For forty generations we lived and worked under the ruling rod of foreign monarchs. Prevented from thinking any original thought, never doing any work according to our free will, subjugated, and dependent on the ruling masters, we slowly developed a slave mentality in our temperament and character. A slave under a tyrant master is humble and obedient; but when the slave becomes the master, he supersedes his master in tyranny. Mean-mindedness, jealousy, hatred, backbiting, short-sightedness, feeling inferior, and above all, selfishness are the signs of a slave.

When those with slave mentality become leaders, they will not allow anyone better than themselves in their administration. Shackled by an inferiority complex, they will always prefer that their subordinates be more unworthy than they. They obstruct the life and growth of anyone having personality, intelligence, self-respect, and other leadership qualities. This leads to an administration filled with sycophants.

Swami Vivekananda explains, 'Here in India, everybody wants to become a leader, and there is nobody to obey. Everyone should learn to obey before he can command. There is no end to our jealousies; and the more important the Hindu, the more jealous he is. Until this absence of jealousy and obedience to leaders are learnt by the Hindu, there will be no power or organisation' (5.216).

Reforming Leaders Character

India is a vast country, a sub-continent with a wonderful variety of languages, religions, cultures, and climate. But with all this apparent diversity, she is one—even from the days of the Mahabharata. Krishna and Arjuna visited the north-east states like Assam, Arunachal, and Manipur, Arjuna married a Naga girl, Krishna's nephew came all the way from Gujarat to Assam to marry a beautiful princess of Assam. India was always united in her diversity.

One who would be a member of the Indian Parliament must be dedicated to the unity of India, know her history and geography, and have a fair knowledge of her social structure. He or she must visit different parts of India before standing for election, to gather first-hand experience of Indian social life. He or she must serve society for a minimum of ten years as a voluntary social worker, thus gaining competence to become a law-maker of India. Swami Vivekananda's words can be a guiding principle for all leaders: 'Three things are necessary to make every man great, every nation great : 1. Conviction of the powers of goodness 2. Absence of jealousy and suspicion. 3. Helping all who are trying to be and do good' (8.299).

We know how a misguided leader, after gaining power, can create permanent and serious problems for the whole nation. Thus we must choose our leaders carefully, not out of emotion but exercising our power of discrimination. Merely leaving one's antisocial activities and joining the national mainstream, or receiving education in some foreign land, is not sufficient qualification for becoming a leader. One who would lead should first prove his or her capability and integrity through social service. A capable leader means a prosperous nation.

If we love our motherland, India, we must be united to shake off the terrible jealousy from our character. Let us take this vow, repeating Swami Vivekananda's powerful words: 'At any cost, any price, any sacrifice, we must never allow that to creep in among ourselves' (6.286).

Reference

1. The Complete Works of Swami Vivekananda, 9 Vols (Calcutta : Advaita Ashrama, I-8, 1989; 9, 1997), 6.284.

> Throughout the history of mankind, if any motive power has been more potent than another is the lives of all great men and women, it is that of faith in themselves. Born with the consciousness that they were to be great, they became great.
>
> — Swami Vivekananda

ঠাকুরের নরেন

(নরেন যে ঠাকুরের মাথার মণি তা তিনি বিভিন্ন আলাপচারিতায় প্রকাশ করেছেন এবং সে সকল অমূল্য ভাবের কথা *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে* এবং *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে* উল্লেখ পাওয়া যায়। চল সকলে, সেই অসাধারণ ভাবসমুদ্রে আমরাও করি অবগাহন ক্ষণকালের জন্য।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নির্বাচিত কথোপকথন এবং স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিবিধ মূল্যবান উদ্ধৃতির সঞ্চয়ণ।)

১। শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— নরেন্দ্র, ভবনাথ রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল— কাপ্তেন ভালো জায়গায় বসতে বললে— তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না— পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এক বিদ্বান। মায়ামোহ নাই। —যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভালো আধার। একাধারে অনেক গুণ; গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে! এ দিকে জিতেন্দ্রিয়, —বলেছে বিয়ে কোরবো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারী মিল— যেন স্ত্রী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশি আসে না। সে ভালো। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম)

২। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরও সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই— তায় কি এসে যায়। ঠাকুরের ভালোবাসা যেন আরও উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়ে নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, "মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মনে আছি (রাই)!" (নরেন্দ্রের প্রতি)— "যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভালো লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচিতরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য)। অন্য খাবার পড়লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা— সমাধি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন ও বলিতেছেন, "হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন? কী আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ওই দেখ বহির্জগতের হুঁশ চলিয়া যাইতেছে। এরই নাম বুঝি অর্ধবাহ্যদশা— যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়াছিল। এখনও নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত— যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন— আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। অ্যাতো গা টেপা বা পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা করছেন, না শক্তি সঞ্চার করছেন?

(কথামৃত ১ম)

৩। "নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। "এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই।

''এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

''অন্যেরা কলসী, ঘটি, এসব হতে পারে, নরেন্দ্র জালা।

''ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী! যেমন হালদারপুকুর।

''মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ— পোনা, কাঠি বাটা, এই সব।

''খুব আধার, —অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

''নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধর্‌লে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়, —মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।

''নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব, ওকে তাই অন্যদিকে বস্‌তে দিই!

''নরেন্দ্র সভায় থাক্‌লে আমার বল।

(কথামৃত, ৪র্থ)

৪। শরীর গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্বন্ধে কত কথা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এরূপে পরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, ''তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কালে নিঃশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিঃশ্বাস পড়িলে অল্পায়ু হয়।''

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

৫। কাশীপুরে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খ্রি.), এক দিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন— ''নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।'' (কথামৃত, তয়)

''এই ছেলেটিকে (স্বামী বিবেকানন্দ তখন General Assembly কলেজে পড়েন। বয়স হবে ১৯/২০) দেখছো এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না— এরা কামিনী-কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।''

''বেদে আছে হোমা পাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই সে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে, আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্চে, আর শরীর মাটিতে লাগলে একবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মা'র দিকে, ঊর্ধ্বদিকে, চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুচে উঠে যায়।'' (কথামৃত ৫ম)

৬। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন— ''গিরিশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিললো।'' নরেন্দ্র— আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ— কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখছিস্?

কিছুদিন পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন— ''আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি বোধ হয়?''

নরেন্দ্র বললেন, ''অন্যের মত শুনে আমি কিছু করব না; আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই বলব।'' (কথামৃত)

৭। এক সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটী তলে আহ্বানপূর্বক বলিয়াছিলেন, ''দ্যাখ, তপস্যা প্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেককাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐ সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐ সকল প্রদান করি; কারণ, মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্যকালে ঐ সকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি— কি বলিস্?'' ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দেবীশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়ন গোচর করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে ঐ সকল বিভূতি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ''মহাশয়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বর লাভ বিষয়ে সহায়তা হইবে কি?'' ঠাকুর বলিলেন, ''সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বর লাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য করিতে

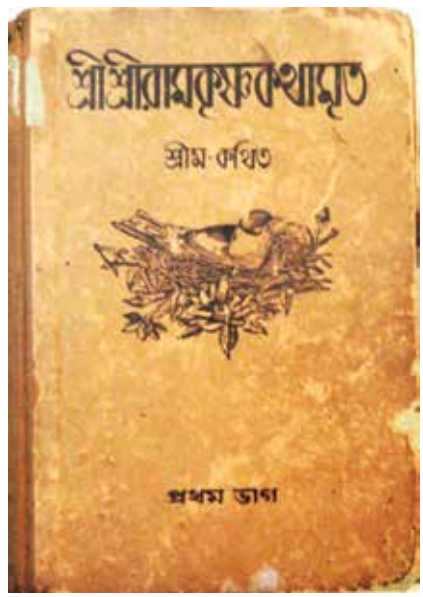

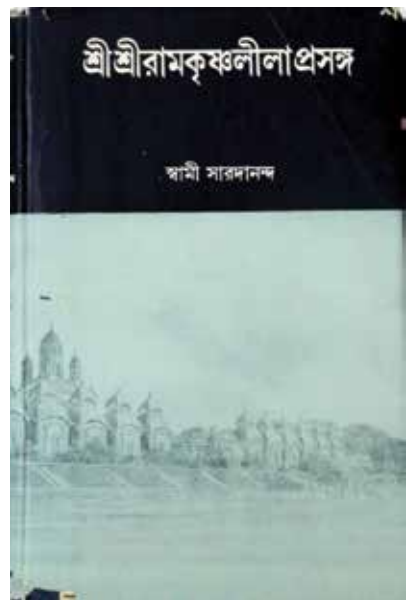

প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।'' নরেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, ''মহাশয়, আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বর লাভ হউক, পরে ঐ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতিসকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি, তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে যে!'' ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতিসকল সত্য-সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্ত ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত— কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগের জানা আছে। (লীলাপ্রসঙ্গ)

৮। গুরুভ্রাতাগণের নিকট নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ

''সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতর সাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই— একথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসার ত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐ দিন কলকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম— ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মতো গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম। তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়িতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই!

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না— ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক!' —বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে, পুনরায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন! (লীলাপ্রসঙ্গ)

৯। নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, (তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরূপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন) তাহা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

(গ্রন্থকার)

''গান ('মন চল নিজ নিকেতনে', 'যাবে কি হে দিন আমার) তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল। উত্তরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল; সুতরাং উহার ভিতর ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারান্দায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!' —ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মতো আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবেনর দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!

''আমি তো তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ— না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও।' —বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বকর সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

''বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মতো কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া

মনে হইল সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাগিদের সহিত যেমন কথা কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন' —তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া ঐরূপ বলিতেছেড় না, সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁঙার ইতঃপূর্বের আচরণের সহিত ঐ সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া এবারক্রম্বিপ্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে-সকল অর্ধোন্মাদের (monomaniac) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদিত হইল এবং দৃঢ় নিশ্চয় করিলাম, ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐ জন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।'' (লীলাপ্রসঙ্গ)

১০।লীলাপ্রসঙ্গ: একদা রামদয়ালবাবুকে ঠাকুর বলেন— ''দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো, সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাঁকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।''

১১। লীলাপ্রসঙ্গ: যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্মচারীকে বলেন, উপস্থিত যুবকদের দেখিয়ে— ''এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাস করিয়াছে। শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না। —যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে কইতে, আবার তেমনি ধর্ম বিষয়ে! সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না! —আমার নরেন্দ্রের ভিতর একটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ— ঢং ঢং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি। যেন চোখ-কান টিপে কোন রকমে দু-তিনটে পাস করেছে, ব্যস, এই পর্যন্ত— ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে-খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়। সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়— যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?''

১২। নরেন্দ্রনাথ— ''আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। বলিতাম— পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পর হরিণ হইয়াছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত। বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর আমার ঐ সকল কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন 'ঠিক বলেছিস; তাই তো রে, তাহলে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না।' দারুণ বিমর্ষ হইয়া ঠাকুর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না, মা বললেন— তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' ঐরূপে আমি ইতঃপূর্বে যত কথা বুঝাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক কথায় সেই দিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।''

(লীলাপ্রসঙ্গ)

> নিন্দাবাদ একেবারে দূর করো। তোমাদের মুখ বন্ধ হোক, হৃদয় খুলে যাক। এই দেশের এবং সমগ্র জগতের পরিত্রাণ করো। তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবতে হবে, সমস্ত ভার তোমারই ওপর।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

মনীষীদের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দপঞ্চকম্' স্তোত্রে বলেছেন— 'এই জগতে অনিত্য বস্তুরাজি হইতে নিত্য বস্তুতে পৃথক করিয়া যে বিবেকী লীলাছলে সেই নিত্য বস্তুতে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভাবে পবিত্র চিত্তকে সমাহিত করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি'।১ 'বিবেক সম্ভূত আনন্দে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, যিনি বিবেকানন্দের আনন্দিত। বিবেক জ্যোতিতে যিনি রমনীয় রূপশালী, সেই বিবেকীকে আমি সর্বদা নমস্কার করি।'২ 'যাঁহার স্বরূপ সত্য ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিরবকাশ নিত্য সুখ প্রদান করে, সেই আনন্দস্বরূপ মূর্তিধারীকে আমি নমস্কার করি।'৩ 'সূর্য যেরূপ গভীর অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষ্ণু যেরূপ দুর্বৃত্তদিগকে বিনাশ করেন, সেইরূপ যাঁহার নয়নাভিরাম রূপ বিশ্বজনের ত্রিতাপ বিদূরিত করে'।৪ 'নরহিতার্থ অবতীর্ণ সেই আচার্য প্রবর, পরম পবিত্র, জগৎপালক, আনন্দময়, যোগিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দকে আমি নমস্কার করি'।৫

এই পঞ্চপ্রদীপের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রণাম মন্ত্র রচিত হয়েছে:

নমঃ শ্রীমতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।
— শ্রীমন সন্ন্যাসিরাজ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ত্রিতাপহারি। সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার।

টলস্টয় তাঁকে অভিধা দিয়েছিলেন বর্তমান ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে। রোমা রোঁলার চোখে তিনি আজন্ম সম্রাট। সুভাষচন্দ্র বসুর বিচারে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক। শ্রী অরবিন্দের উপলব্ধিতে তিনিই জাতীয়-জীবন ধ্যানকর্তা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি ভারত-প্রতীক। কবিগুরু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই বলে— 'যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সব কিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই'। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন— 'শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত'। তাঁর যুগে করুণাময় তথাগত শুনিয়েছিলেন— ভালো হও এবং ভালো কাজ কর। মানবতাবাদী শোনালেন— মানুষ হও এবং মানুষ তৈরি কর। গৌতম বুদ্ধের মৈত্রীর বাণীই তো নতুন ভাবে উদ্‌গীত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামীজী শোনালেন, আমাদের চারদিকে যারা আছেন— সেই বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম পুজো হবে। —এই সব মানুষ ও প্রাণী— এরাই আমাদের ভগবান, এবং আমাদের সর্ব প্রথম উপাস্য আমাদের স্বদেশবাসী বিবেকানন্দের এই বোধি একমাত্র পূর্বজ তথাগতেই তুলনীয়। কিংবা বিবেকানন্দেই তো নতুন বুদ্ধ। স্বামীজীর জীবনের স্বর্ণময়তা ও বিচিত্রগামিতাকে সামনে রেখে তাঁর পুণ্য জন্ম দিবসে (১২ই জানুয়ারী) আমরা আমাদের হৃদয়মথিত শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই কতিপয় মনীষীদের দৃষ্টিতে।

পঞ্চপ্রদীপের আলোকে বিবেক-বন্দনার উদ্দেশ্যে আমরা পাঁচজন ভারতীয়কে বেছে নিয়েছি যাঁদের দৃষ্টিতে স্বামীজীর বিশাল চরিত্রের কিছুটা আভাষ পেতে পারি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ

ঊনবিংশ শতকের মধ্য গগনে আমরা দুই জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাই— একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং অপরজন হন স্বামী বিবেকানন্দ। এই দু'জন মনীষীর বয়সের ব্যবধান, মাত্র দুই বৎসর। রবীন্দ্রনাথ বয়সে দু'বছরের বড়ো ছিলেন। বাল্যবয়সে দু'জনই উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ ভাবধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। যদিও বাল্যবয়সে এই দু'জন ব্যক্তিত্বের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা খুব কমই ছিল।

কাব্যশক্তির বিচারে কবি রবীন্দ্রনাথ যে গগনচুম্বী শিখরে পৌঁছেছিলেন— এ কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মাত্র ৩৯ বৎসরের পরমায়ু নিয়ে বিবেকানন্দ যে কাব্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে আজও অননুকরণীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির সংলাপে মৃত্যু ও নিষ্ঠুরতার যে ছবি এঁকেছেন তাতে এই সংশ্লেষণের পরিচয় নেই। তবে বিবেকানন্দ যে রুদ্ররূপের বর্ণনায় কতটা সিদ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে। যেমন—

'মেরুতটে হিমানী পর্বত / যোজন যোজন যে বিস্তার / অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশ / শত শত বিজলি প্রকাশ।... / শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্তিও ভাস্কর। গলে চূড়া শিখর গহ্বর।'

বিবেকানন্দের কবি ভাবনার সর্বোচ্চ সীমা যে কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলা ভাষায় লেখা নয়। কিন্তু তার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক বিরল ও বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এর কোনও তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যই দুষ্কর। এটি হল তার 'Kali The Mother' কবিতা। সমগ্র অনুবাদটি নিম্নরূপ:

'নিঃশ্বেসে নিবেছে তারা দল। মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে পূর্ণ্য বায়ু বেগ। লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে, মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে। সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা। উঠে কেউ গিরিচূড়া জিনি; নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিদে দামিনা, প্রকাশিছে দিকে দিকে তার— মৃত্যুর কালিমা মাখা গায় লক্ষ লক্ষ দায়ার শরীর। — দুঃখরাশি জগতে দড়ায়, বারালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে; তোর ভীমচরণ নিক্ষেফ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে। কালী, তুই প্রলয় রূপিনী। আয় গো মা। আয় মোর পাশে। সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, —মৃত্যুরে সে বাঁধে বাহু পাশে, —কাল-নৃত্য করে উপভোগ, —মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

(মৃত্যুরূপা মাতা— কবি সত্যেন্দ্রনাথ অনূদিত)

ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য থেকে জানা

যায়, প্রেরণার অগ্নিদাহে জ্বলতে জ্বলতে বিবেকানন্দ কবিতাটি রচনা করেন এবং এই রচনাটি শেষ করার পর আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের আতঙ্ক বিস্ফারিত কাব্যও এই প্রলয়ভীষণ কবিতার কাছে 'বর্ণহীন না হতে পারে, কিন্তু তার সহধর্মী— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই কবিতা যিনি লিখতে পারেন, তিনিই বলতে পারেন— 'আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালোবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালোবাসি, দুঃখকে দুঃখ বলে ভালোবাসি'। (জনগণের অধিকার)

বিবেকানন্দ শুধু ধ্যানা সাধক ও ভাবতন্ময় কবি ছিলেন না। জীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে সংসারের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। কখনও তিক্ত অভিজ্ঞতাও কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাই তিনি মানুষকে জড়প্রায় হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যে যত অনুভূতিপ্রবণ, সংসারে তার জীবনে তত আঘাত নেমে আসে, বাইরে ও ভেতরে মানুষের পার্থক্য অর্থাৎ আত্মগোপন করার প্রকৃতি তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি বলেছেন ''হও জড়প্রায়; অতি নীচ, ঘুমে মধু, অন্তরে গরল/ সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ তবে পাবে এ সংসারে স্থান!— / যত উচ্চে তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়। / হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক। এ জগতে নাহি তব স্থান।''

বোঝা যায় কেন সুভাষচন্দ্র বার বার এই অংশের আবৃত্তি করতেন। এ সব সত্ত্বেও বিবেকানন্দ পলায়নবাদী নন। পৃথিবী থেকে পালাবার কোনও পথ নেই—

''ক্ষমাহীন শোনো বিহঙ্গমে— এ যে নহে পথ পালাবার।'' মানুষ বিহঙ্গমের মতোই পক্ষ বিস্তার করে সুদূরে আকাশ বিহার করতে চায়। কিন্তু সে পক্ষহীন। এটাই তার ট্রাজেডি। তবে কোন পথে মানুষ দুঃখজনের মন্ত্র খুঁজে পাবে? তার উত্তরও তিনি পেয়েছেন—

'শোনো বলি মরমের কথা। জেনেছি জীবনে সত্যগরব: ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম— প্রেম, প্রেম এই মাত্র ধন।''

একজন কবির কাছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা তাঁর আপন হৃদয় উন্মোচন। এর পরিচয় আমরা পাই 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির মধ্যে।

'গাই গীত শুনাতে তোমায় / ভাল মন্দ নাহি গণি / নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।... / ছেলে খেলা করি তব সনে, / কভু ক্রোধ করি তোমা নারে,— / যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, / শিয়রে দাঁড়াতে তুমি রেতে, / নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি / এ কবিতা শেষ হয়েছে এক আকুল আত্মনিবেদনের সুস্নিগ্ধতায়— / প্রভু তুমি। প্রাণসখা তুমি মোর... / বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।'

কবিতাটির শেষাংশে কবি বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।কত কালের কত স্মৃতি, স্মৃতিরঞ্জিত মর্মছেড়া কত চিত্র। এর মধ্যে সমাদৃত। আঘাতে সংঘাতে ধ্বংস। চারিদিকের হীনতায় পর্যুদস্ত আমাদের মন এই বেদনা দাহন থেকে দূরে সরে যেতে চায়। অথচ, তা যাওয়া যায় না। সেই বেদনার মুহূর্তে কবির শিয়রে কে যেন দাঁড়াতেন। যাঁরা মনে করেছেন একটি এই তুমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ— তাঁরা ভুল করেননি, কিন্তু এখানে একটি মানুষের কথা নেই। এই মৌনমুখ। অশ্রু ছল ছল আঁখির মধ্যে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহময়ী মায়ের উৎকণ্ঠা। সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা, আপন অসহায়তার মর্মপীড়া মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে স্বজন-সমাজ থেকে বহু দূরে আকাশের একটি তারার দিকে তাকিয়ে মধুসূদনের মনে পড়েছিল মায়ের অশ্রু ছলছল আমি। বেদনার্ত হৃদয়ের প্রতিভাসে এ কবিতা

অনন্য হয়ে উঠেছে। ভালোবাসার জনের করুণ আকুতি। সব আকুতি এসে মিশেছে প্রভুর কাছে। তাই প্রভু ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর প্রাণসমা হয়ে উঠেছিল। এই অংশের আর্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের আশ্চর্য ভারসাম্য রয়েছে।

মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে কবিরূপে বিবেকানন্দকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। যিনি কখনও আত্মশ্লাঘা করেন না, তিনি নিজ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণবাণী এবং তাঁর কণ্ঠে সরস্বতী বিরাজিত। তিনি যদি কবি না হন, তবে কবি কে?

বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

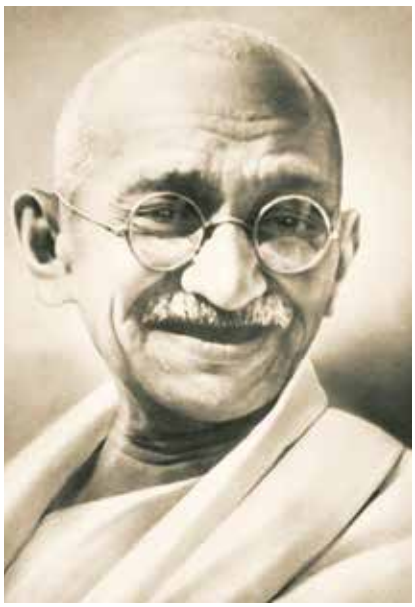

ভারত-আত্মার আর একটি ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী বলেছেন— 'তাঁর (বিবেকানন্দের) রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে। হে যুবকবৃন্দ। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরীর ত্যাগ করেছেন— সেই পুণ্যভূমির কিছু মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্যহাতে ফিরে যেও না— তোমাদের কাছে এই আমার আবেদন।'

বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। তিনি চেয়েছিলেন, যুবসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে; আর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে। স্বামীজী কোনও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি। কিন্তু যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মধ্যেই একটা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অন্তত বঙ্গভূমির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আধ্যাত্মিক জনক হিসেবে সম্মানিত হবার যোগ্য। ...তিনি ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন...।

স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ— তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী। সেই জন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'শক্তি শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন', —স্বামীজী এই কথাই বার বার বলেছেন। ...তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য— সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ। জাতির ও মানব সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। 'আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।' স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা। এ কথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ভাবে ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। 'আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হতেন— অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম।' যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব। একথা বলাই বাহুল্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে আমরা পেয়েছিলাম এক মহান শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আচার্য শংকরের পরেই নিজ মহিমায় এক কীর্তিমান পুরুষ। তিনি বলেছেন— 'যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত ভারত তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের

বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতিযত্নে গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, স্বামীজী তাঁহার আদেশ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিবেন। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আড সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ কে ছিলেন? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। আর বিবেকানন্দ— মহাদেবের নয়ন নিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ। কিন্তু তাঁর পেছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে প্রস্তুত বিবেকানন্দ। মহাদেব স্বয়ং এবং ব্রহ্মা ও বিশ্বাতীত ওম্।

বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে পাই— ঠিক জানি না কী রূপে। বলতে পারি না কী রূপে। বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমন কিছু যা সিংহপ্রতীম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত; যা সমুদ্রের; যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ওই দেখ, বিবেকানন্দ এখনও জেগে মাতৃমর্মে। মাতৃ-সন্তানদের মর্মলোকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

'ভারতরত্ন' বিভূষিত ভারতবর্ষের দার্শনিক— রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ স্বামীজী সম্পর্কে বলেন: 'যদি বিবেকানন্দের কোন বাণী এখন আমাদের স্মরণ করতে হয়, তা হল আমাদের আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার জন্য তাঁর সেই আহ্বান।'

মানুষের মধ্যে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ নিহিত আছে। মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ। মানুষ অদ্বিতীয়, অপূর্ব। জগতে কোন সমস্যা বা বিপদই অবশ্যম্ভাবী কিংবা অনিবার্য নয়। মানুষ আমরা চরম বিপদ এবং অক্ষমতার সম্মুখীন হলেও তাকে কাটিয়ে আসতে পারি। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা ফের আশা না হারাই। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে সাহস।

পরিশেষে, কাজী নজরুল ইসলামের বিবেক-বন্দনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে—

''জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী।

জয় তরুণযোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী।।

যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম, তুমি তেজস্বী তাপস পরম।

ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী।।

মদগর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী।

শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।।

নব-ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ;

জীবে-ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি।।''

> Purity, patience and perseverance are the three essentials to success, and above all, love.
>
> — Swami Vivekananda

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের প্রথম দিনে শিক্ষিকাগণের নিকট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা সন্ন্যাসিনী মীরা দেবী প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষিকাগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিরস্মরণীয় পথ নির্দেশ

৭-১-১৯৫৭ সাল
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

আজ আমরা যে কাজে অগ্রসর হচ্ছি, তা হচ্ছে ইষ্টলাভের উপায়। গোলাপ-মা (শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গিনী) বলতেন, ''কুমারীর মধ্যেই জগদ্মাতার বেশী প্রকাশ''। এই জন্যই দুর্গাপূজার সময় অনেক স্থানে কুমারীপূজা হয়ে থাকে। তাই মেয়েদের ভগবতী জ্ঞানে পাঠদানের মধ্য দিয়ে সেবা করে সেই জগদ্মাতারই সেবা-পূজা করছ মনে করে, খুব স্থির হয়ে, ঠাণ্ডা মেজাজে তাদের পড়াবে। তোমরা, তাদের পড়িয়ে খুব একটা বড় কাজ করছো একথা কখনও মনে করো না। তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) কাজ কখনও পড়ে থাকে না। স্বামীজী বলতেন, তিনি (ঈশ্বর) ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধুলো থেকে শত শত বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন। কাজেই এদের সেবার সুযোগ পেয়ে তোমরা ধন্য হচ্ছো এটাই সব সময় মনে রাখবে। স্বয়ং ভগবান, গীতায় বলেছেন, নিষ্কামকর্ম ভগবান লাভের একটি বিশেষ পথ। সুতরাং এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারলে আমাদের ইষ্টলাভের পথ সুগম হবে। দান তিন প্রকার,— অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান। জ্ঞানদান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। অবতার পুরুষ এবং বিশেষ শক্তি সম্পন্ন মহামানবেরা অবতীর্ণ হন ধরার মানবকে জ্ঞান দানের জন্য। এ যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানেরা এসেছিলেন মানুষকে জ্ঞান দানের জন্য। বিদ্যাদানই মধ্যম প্রকারের দান, এইটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। গ্রহীতা না থাকলে দান করা যায় না। সেজন্য দানের সুযোগ পাওয়াও কম কথা নয়। তোমাদের আদর্শ হবে শ্রীশ্রীমা, সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিশ্চিনা এবং সুধীরাদির

জীবন এবং তাঁদের কাজ। শ্রীশ্রীমাকে মাথার উপর রেখে, সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিশ্চিনা এবং সুধীরাদির আদর্শকে অনুসরণ করে তোমরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলবে। তোমাদের কর্ম বিদ্যদান। সাক্ষাৎ ভগবতীর সেবা মনে করে এই কর্মকে গ্রহণ করলে নিশ্চয় এই কর্ম হয়ে তোমাদের ইষ্টলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করে নিবেদিতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ স্কুল করার ব্যাপারে বহুরকম পরীক্ষা করে দেখেছি, স্পষ্ট অনুভব করেছি, শ্রীশ্রীমা চাইছেন এইটি হোক,—তাই আজ এই স্কুল। এই স্কুল সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, সেজন্য মায়ের পূজা করছ মনে করে তোমরা সকলে আজ থেকে এ কাজে ব্রতী হও।

প্রথম দিনের ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে কোমলমতি নবীনা ছাত্রীদিগের নিকট বিদ্যালয় অর্থে কি বোঝায় এবং বিদ্যালাভের সহজ উপায় সম্বন্ধে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী বাণী দেবীর মন্ত্রসম কয়েকটি কথা।

৭-১-১৯৫৭ সাল

বেলা ১১টা ২০ মিনিট

'স্কুল' অর্থ কি জান? 'স্কুল' মানে হচ্ছে বিদ্যামন্দির। মন্দিরে যেমন ঠাকুরের পূজার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্ত এবং স্থির হয়ে করতে হয় এখানেও তেমনি শান্ত ও স্থির হয়ে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়াশুনা করতে হবে। ঠাকুরের কাজে যেমন কোন প্রকার ফাঁকি দিলে ঠাকুর রাগ করেন, পড়াশুনার কাজেও ফাঁকি দিলে সরস্বতী দেবী অসন্তুষ্ট হন। আর সর্বদাই কথা কম বলবে। যা বুঝতে পারবে না দিদিমণিদের জিজ্ঞেস করবে তাঁরা সব তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন।

আশ্রম মাতা স্বর্গীয়া মীরা দেবীর (মাসীমা) আশ্রমিকা গৌরী দেবীকে লেখা একটি অপ্রকাশিত পত্র

দেওঘর (S.P.)
নিউ টাওয়ার হাউস
P.O. – বিলাসী
২৪.১১.৬৮

স্নেহের গৌর,

তোমার পত্র পাইয়া স্বাভাবিক সমস্ত খবর দিয়াছ দেখে খুসী হয়েছি জানিবে। তোমাদের ডাকের খামে লেখাপত্র পাই নাই। পূর্ব্বে সুকুর হাতের পত্রও পেয়েছি।

সব দিদিদের তোমার প্রণাম জানাব। আমি অনেক দিনই তোমাকে লিখব মনে করেছি কিন্তু মাথার জন্য লিখতে পারি নাই। আমার দু'কথায় লেখা হয় না, একটু ভালো করেই লিখতে চাই তাই আর হয়ে উঠে না। এখনও কয়েকখানা বিজয়ার চিঠিরই বোধহয় উত্তর দিতে পারি নি। এই সব ভেবে তোমরা দুঃখিত হয়ো না।

দেহে আমার এখনও নানা রকম কষ্ট লেগেই আছে কি করব বল। মায়ের যা ইচ্ছা তাই ত হবে। এই জেনে চুপ করে থাকতে চাই।

ওখানে এত দিনে নিশ্চয়ই শীত পড়েছে। বানীদিকে গরম চাদর গায়ে দিয়ে দিয়েছ ত? সকালের ব্যাপার মনে হয় রেবাই করে, তার মাঝে ৩/৪ দিন মনে হয় তোমাকেই করতে হয়। মনস্থির করে মন দিয়ে সব করো। যে কাজই করতে যাবে সেটা মায়ের, ঠাকুরের সেবা করছ, এই কথাটা দৃঢ় করে মনে ধরে রেখে করো। তাহলে ভুল হবে না বিরক্তিও আসবে না, অধিকন্তু জীবনের উন্নতি হবে, কল্যাণও হবে আনন্দও পাবে। যেখানে থাকা যায়, যা কিছু করতে হয় তাতে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে জীবন বৃথা হয়ে যায়, হিতে বিপরীত হয় জেনো। সুতরাং সেই ভাবে সব করতে, থাকতে সতত চেষ্টা করিও। ঊষাদি শুনেছি তোমাদের চিঠি দিয়েছেন, পেয়েছ? আজ এখানে শেষ করছি। তুমি আমাদের স্নেহ ভালবাসা ও শুভ কামনা জেনো।

ইতি—
শুভা ঃ মাসীমা

জাফনায় বক্তৃতা— বেদান্ত

কলম্বো হইতে কাণ্ডি, অনুরাধাপুর ও ভাভোনিয়া হইয়া স্বামীজী জাফনা শহরে পদার্পণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। জাফনায় অভিনন্দনের উত্তরে ২৩ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ’ প্রাঙ্গণে তিনি ‘বেদান্ত’ সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দেন।

বিষয় অতি বৃহৎ, কিন্তু সময় খুবই কম; একটি বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি, বর্ণনা করিব। যে ‘হিন্দু’ নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিন্তু আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ— ‘যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।’ প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে ‘সিন্ধু’-শব্দই ‘হিন্দু’রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই ‘হিন্দু’ বলিতেন। এইরূপেই ‘হিন্দু’-শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই কারণ তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, বর্তমানকালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মতো এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীস্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য আধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অথএব আমি ‘হিন্দু’-শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা ‘বৈদিক’ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি, অথবা ‘বৈদান্তিক’-শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস— এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য; সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ঐ-সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

বেদ-নামক শব্দরাশি কোন পুরুষের উক্তি নহে। উহার সন-তারিখ এখনও নির্ণীত হয় নাই, কখনও হইতেও পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম— ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত

পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়। হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ; কারণ বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। 'বেদ' অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি; বিদ্-ধাতুর অর্থ— জানা। বেদান্ত-নামক জ্ঞানরাশি ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত। ঋষি-শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; পূর্ব হইতেই বিদ্যমান সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন বা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব হইতে বিদ্যমান ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। ঐ ভাবরাশি অনন্ত কাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল— ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা।...

আমাদের ধর্মেও স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু ঐগুলি চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ-নরকের স্বরূপ বিচার করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, ঐগুলি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা এই মর্তলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে— না হয় একটু বেশি সুখ, একটু না হয় বেশি ভোগ। তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এই প্রকার স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্খার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্মবশে ইহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র-বরুণাদি কোন দেব-বিশেষের নাম নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, কিছু দিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা স্বর্গসুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যেমন এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধন মান ঐশ্বর্য লাভ করিলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্যপদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না; তাঁহাদের শুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি। সুতরাং এই-সকল স্বর্গেও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?— মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেন ঃ ''শ্রেষ্ঠ স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে— তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি ক্রীতদাসমাত্র।'' এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি— উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে তোমাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে, সুতরাং মৃত্যুরও পারে উপনীত হইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল, সুতরাং তুমি দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী-ভেদ নাই। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ আরোপ করার ভ্রমমাত্র— শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হইলেন? একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি— জ্ঞানোদয়েই অজ্ঞানের নাশ হইবে, জ্ঞানই আমাদিগকে এই অজ্ঞানের পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দিরজ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জ্ঞানের উদয় হইবে, অজ্ঞান দূরীভূত হইবে, সকল বন্ধন টুটিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।...

যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির একটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। গতকালের শিশু— যে আগামীকালই হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হইবে— সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিতে বলে এবং আমিও যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের বাহিরে নানাদেশ হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরনের। তাহাদিগকে বল— তোমরা যখন একটি স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী! বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় বিলয়! আগে তোমাদের মতো স্থায়ী সমাজ গঠন কর; প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যেগুলির শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে— তখন তোমাদের সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।

আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। এখন আমি বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারত-কার বেদব্যাসের জয় হউক। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম'। অন্যান্য যুগে যে-

সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এ যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান— অপরকে সাহায্য করা। 'দান' শব্দে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান; অন্নবস্ত্র-দান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যা দান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমনকি প্রাণদান পর্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্যান্য সব কাজ নিম্নস্তরের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত উৎস।

এই ত্যাগের দেশ— ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় ধর্মের অপরোক্ষানুভূতির এরূপ দৃষ্টান্ত পাইবে? পৃথিবী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর— অন্যান্য দেশে অনেক বড় বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানে— কেবল এখানেই এমন মানুষ পাওয়া যায়, যিনি ধর্মকে জীবনে পরিণত করিয়াছেন। বড় বড় কথা বলাই ধর্ম নয়; তোতাপাখিও কথা কয়, আজকাল কলেও কথা বলে, কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহার মধ্যে ত্যাগ আধ্যাত্মিকতা তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান। এই-সকল গুণ থাকিলে তবে তুমি ধার্মিক পুরুষ। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবনসমূহ উদাহরণস্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক-প্রসূত চিন্তা-রত্নগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ-সকল তত্ত্ব শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র জগতে ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে— তুমি নিজেরই কল্যাণ করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্মকে ভালবাস, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দিতে হইবে— এই মহাব্রতসাধনে প্রাণপণ করিতে হইবে।

সর্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়! শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হইতেছি— আমরা সর্বদাই পরস্পরকে হিংসা করিতেছি। অমুক কেন আমা অপেক্ষা বড় হইল, আমি কেন তাহা অপেক্ষা বড় হইলাম না— অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা। এমনকি, ধর্মকর্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী— আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে ভয়ানক কোন পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষাপরতা। সকলেই আদেশ করিতে চায়, আদেশ পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদা দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে-সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন— আমরা ভক্তি ও স্পর্ধার সহিত তাঁহাদের কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এখন আমাদের কাজ করিবার সময়— আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ যেন গৌরবের সহিত আমাদের এই কার্যকলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউক না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন সব কাজ করিব, যাহা দ্বারা তাঁহাদেরও গৌরব-রবি ম্লান হইয়া যাইবে।

> The downfall of a religious sect begins from the day that the worship of the rich enter into it.
>
> — Swami Vivekananda

A healthy work attitude

Swami Atmajnananda

People, generally are interested in work. They want to be active, successful and gain recognition for their efforts. Being devoid of work or a job is frightful and retired people find time hanging heavily on their heads. People like to work in a stress free environment wherein they can be more productive. When told about efficiency in work as a means to gaining control over their mind and that it can help them to become better individuals, they are interested. Efficiency in work enables them to be more successful and therefore they are happy. But what they fail to understand is that along with success there is failure, ill-health, tremendous mental pressure to perform and the ills of competition. Are they willing to face the other side of work? No. They burn themselves out in the rat race, become frustrated and confused as to where it all went wrong. When efforts do not bring about commensurate results they vilify their colleagues and spoil their day. So work does lead to problems if one does not train oneself to work with awareness or the right attitude.

Work We Must

We are not aware of how our mind works. One cannot remain idle and say I shall not work. When one sits idle, the mind spends itself in all sorts of mental activity and the strain that results is more harmful than physical strain. Sri Krishna says in the Bhagavad-Gita, 'Do your regular duties; for action is superior to inaction; and even the bare maintenance of the body would not be possible if thou art inactive. 'It is in our nature to work. Nature forces us to work. 'All are made to act, helplessly indeed, by their very nature'[2], says the Lord again. Our breathing, digestion and other involuntary actions are all work, only we are not aware that we are working. If these do not happen, we are in for trouble. Most of us are only against work that is troublesome or more strenuous because we are lazy. We shirk work out of fear; fear that it may bring failure or censure. Generally, all of us are aware that work leads to more work and we invariably get involved in it. We become apprehensive about getting involved for that means less freedom for our individualistic pursuits.

Is there no freedom from work then? We find some people who work just like the others but do not see the work as drudgery. For them, work is not only joyful but it also has far reaching impact. They do not seem to be working. Work just happens for them. They do not work with the ego-sense; 'I am doing this work, this is my work and I am entitled to the results that accrue from it'. Their attitude can be put in these words: 'The forces of Nature perform all action. With the understanding deluded by egoism, the person thinks, "I

am the doer".[3]

The sense of doership gives us the idea that we are capable of 'doing a work, not doing it or doing it otherwise'. When we work, we can do something really creative and benefecialal, undo something that has been wrongly done by ourselves or others, do something wrongly and create problems for ourselves and others or change the way in which a particular work is being done so that it besomes easier to do it. All these involve a sense of doership, 'I am doing this work'. Things however do not happen as per our plans. We soon realize that all is not how it should be. Our ego plays spoilsport and we start hating work. The only way to get over this imbroglio is to ripen our puny ego by chastising it or by asserting our true nature, the Self. The mind is to be cleansed of all the desires that nourish the ego- our sense of separateness or limited individuality.

We are constantly denying our higher nature, our infinite dimension and reinforcing the selfish ego that binds us. How unfortunately deluded we are! We feel insecure when we are asked to give up the 'I' that we have created. Narendranath, the later Swami Vivekananda, was once asked by Sri Ramakrishna as to how he would enjoy the syrup served to him. Naren replied that he would sit on the edge of the plate and carefully sip it, lest he get drowned in it. Sri Ramakrishna laughed and said, 'There is no fear of dying if you drown in this nectar of immortality. You will gain eternal life'. All of us, the moment we are born, start clinging to life. We are forced to do so by nature, by our genes. Only the wise and courageous can break this attachment and work towards freedom.

Work Transformed to Yoga

Work trains the mind and helps us to realize our weaknesses. Two ways are prescribed: To ass ert the Self and remain a witness, being unattached to the things that happen around. And the second, but in no way inferior is the part of surrendering all actions to God and doing all work as His worship. The former is the path of Jnana or knowledge and the latter, the path of Bhakti or devotion. Working without attachment to the results and without the sense of doership is the path of Karma or action. Swami Vivekananda says, 'Each one of our Yogas is fitted to make man perfect even without the help of the others, because they have all the same goal in view. The Yogas of work, of wisdom, and of devotion are all capable of serving as direct and independent means for the attainment of Moksha'[4].

Reconciling work with worship has always been a bother for the general spiritual aspirant who has not yet achieved the attitude or vision by which all actions are made spiritual. The beginner on the spiritual journey, struggling against his ego that tries to assert itself, avoids worldly temptations by negating the world, and work just does the opposite; it reinforces the ego, and the world. How is he to work and yet go beyond kartrtva or the sense of doership? How can he remain unaffected by the inevitable failures and successes? Can he avoid work-related thoughts at the time of meditation? How can he maintain equipoise when he gets swayed by the feverish nature of work? These questions can best be answered when we study the lives of those who have achieved the state of equanimity or sthitaprajnatva as described in the Bhagavad-Gita by Sri Krishna. He was himself a master in yoga and at the same time an expert in action, a combination that is seldom seen.

Sri Ramakrishna, the simple temple priest of the Kali temple at Dakshineshwar had learnt the art of reconciling work with worship. For his, only the Mother existed and he was a mere instrument in Her hands. He had no separate individuality to bring in the sense of agentship. Although his mind would easily soar to the highest realms at the slightest suggestion, every small thing received his undivided attention. He was never found to be careless or forgetful. Swami Premananda, one of his direct disciples, once reminisced about how the Master's work attitude was. He said: 'The Master never sat idle. We saw him working in the garden and he also swept his room. He could not tolerate work done in a slopshod manner. He himself did everything precisely and gracefully and taught us do so. He would scold us if we did not put tools and other things back in their proper places. Yet he was inward all the time. He would say: 'Yoga is skill in action'[5].

That reminds us of the famous verse in the second chapter of the Bhagavad-Gita, a part of which says, 'yogah karmasu kaushalam' or Yoga is skill in action.[6] Work when seen as a means to train the mind becomes an efficient instrument to achieve equanimity and peace of mind. Such a person, through his or her concentrated mind is able to achieve much more than the ordinary, but he or she no longer works as a slave. Most people think that they are working out of their own sweet will while all along they are goaded into action by their desires. This tension

to achieve robs them of peace and shows in all their dealings. Most often we judge others by what material progress they have achieved in life because we value such things. After all we look at the world through our colored vision. We are unable to see the intrinsic worth of human beings and always try to barter with them. This attitude rules our dealings and is the chief cause for all distinctions in society. Holy Mother told a young girl that if we desire something from someone and we get it from that person, then we shall love him or her more than others.

The Remedy

The only way to get over this impasse is to get rid of the diseased mind that is infected with desires. All said and done that is not easy. The best way to cleanse the mind of selfish desires is to grow in unselfishness. To expand the heart and disintegrate our limited individualities and become the whole is the ideal that Vedanta proposes: 'that which is expansive is verily happiness'. Swami Vivekananda put it as, 'Expansion is life, and contraction is death'.

Sri Ramakrishna suggests a very effective way to get rid of these desires that limit us. He says that when you walk towards the East, the Left falls behind. Give the mind the higher taste of sugar candy syrup and it will no longer run after molasses syrup. That is exactly what he did. He had tasted the bliss of divine communion and the world, as we perceive it no longer attracted him. For him the world was full of joy, and he was not running away from it. The world was not separate from God but was His manifestation and therefore all work was sacred. He had seen the same divinity in the image, in the utensils that are used for worship and in everything. How could he refuse anything as non-sacred? To him the line of demarcation between the manifest and the Unmanifest had vanished.

The same chapter of the Bhagavad-Gita defines Yoga as 'evenness of mind (in regard to success and failure)'[7], and continues to state the 'Work (with desire) is verily far inferior to that performed with the mind undisturbed by thoughts of results. Wretched are they who work for result'. Swami Vivekananda says, 'to the unattached worker all duties are equally good, and form efficient instrument with which selfishness and sensuality may be killed, and the freedom of the soul secured'[8]. This then is the secret of action and unless we achieve it, we shall know no peace, the devotee surrenders all the fruits of his actions to the Lord, looks upon all work as His work and transforms them to worship. He tries to please the Lord through his work and thereby is able to get over the difference between sacred and secular.

The man of knowledge discriminates and identifying himself with the true Self gets over the sense of doership. Work happens of its own accord and he is only a facilitator or witness to the happenings. He remains unattached. But that does not mean that he becomes insensitive. He is able to love all impartially and every act receives his equal attention.

Sir Ramakrishna once gave some strands of jute to Holy Mother and said: 'Twist these into hangers for me, please. I want to keep sweets and refreshments in them for the boys.' The Holy Mother would keep aside the vegetable peels and feed it to the cows; the leftovers would go to the fishes in the pond. Nothing was wasted. She once instructed a woman devotee to put the broom in its proper place with respect for it deserves a place in life. She would clean and put aside the wicker baskets for future use and not throw them away. Conservation of resources is a theme that is being emphasized today when man is plagued by plenty. It is well known that the poverty that plagues third world countries can easily be eradicated if the affluent nations restrict wastage of food and resources. This can be achieved if people are more sensitive to the sufferings of others. If only we can feel for the deprived and take it as a blessing when given the opportunity to serve them, divinity will not be afar from us. The Isavasya Upanishad begin with these words: All this (that is seen in this ephemeral world) must be superimposed by the Lord; one must not covet other's possessions.

Conclusion

Work can become a blessing if we do not work only for our pleasures and put ourselves in a larger canvass. Just as the different colors, seemingly insignificant, add to the beauty and value of the whole painting, all our actions, big or small, have their role to play. The way is to put in equal efforts behind all actions, apply the mind equally and not to distinguish between work as lowly or prestigious. A changed attitude will lead to changed perception and all that was binding us will not become doors to liberation. The key to these doors is in our hands. Let us respond to the

call of the Load: 'Uplift yourself by your own self. Do not spoil yourself. You are your best friend and you can be your worst enemy too'[9]. The responsibility is entirely ours and none other can be blamed. The easiest way is to make ourselves fit instruments in the Lord's hands so that we do His work and feel blessed. There can be nothing better and liberating than this.

Reference

1. Bhagavad-Gita, Chapter III-7
2. Ibid, III-5
3. Ibid, III-27
4. Complete Works of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama, Kolkata), Vol. 1, p 93
5. Swami Chetanananda, Ramakrishna as We Saw Him (Advaita Ashrama, Kolkata) p 110-111
6. Bhagavad-Gita, Chapter II-50
7. Bhagavad-Gita, Chapter II-48
8. Complete Works of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama, Kolkata), Vol. 1, p 71
9. Bhagavad-Gita, Chapter VI-5

What is the use of fighting and complaining? That will not help us to better things. He who grumbles at the little thing that has fallen to his lot to do will grumble at everything. Always grumbling, he will lead a miserable life, and everything will be a failure. But that man who does his duty as he goes, putting his shoulder to the wheel, will see the light, and higher and higher duties will fall to his share.

— Swami Vivekananda

জীবন— একটা একটানা উপাসনা

ব্রহ্মচারিণী সুতপা দেবী

জীবন মানে কী বা 'জীবন'-এর সংজ্ঞা কী— এ প্রসঙ্গে জনসমাজে বিভিন্ন মতভেদ আছে। আমরা যারা রামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী, অবতার বরিষ্ঠায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করি, তাঁদের ব্যবহারিক জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা আমাদের 'জীবন'-কে মহিমান্ডিত করে তুলতে সাহায্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে যখন ভক্তগণ সমবেত হতে শুরু করেছিল ভাবান্দোলনের বীজটি তখনই বপন করা হয়েছিল। কালে তা একটি বিশাল মহীরুহে রূপান্তরিত হয়ে আজ সারা পৃথিবীতে তার শাখা-প্রশাখাকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা বড়ো কঠিন। তিনি যুগপুরুষ ও যুগাবতার, ভক্ত আবার জ্ঞানী, একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব আবার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন বলে আমরা যুগপুরুষ বলছি। শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুর মূলত এক ও অভিন্ন।

কেন ঠাকুর তাঁর জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন? এ প্রসঙ্গে কথামৃত থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের জন্মোৎসব প্রসঙ্গে পড়া হচ্ছে— লোকে যা ভালোবাসে— নিজের পূজা হোক, সে কি তার জন্য? তা নয়। ভক্তরা সব আসবে, ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তন হবে, ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ হবে, তাই। মা বৈ যিনি কিছু জানতেন না, তাঁর আবার লোকমান্য হবার ইচ্ছা কোথায়, তাতে যে লোকমান্য হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে মা বৈ কিছু জানতেন না— এ কথা তাঁর নিজের আচরণে সুস্পষ্ট, জন্মোৎসব বাসরে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। যখন ব্যুত্থিত হলেন তখনও মন সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান পুরোপুরি ফিরে আসেনি। সেই অবস্থায় তিনি আধ-আধ স্বরে বলছেন, 'মা জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই তুমি। মন-বুদ্ধি সবই তুমি।' আবার বলেছেন, 'তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ।' যাঁর এই অবস্থা, এই কথা, তাঁর কি লোকমান্য হওয়ার ইচ্ছা থাকে?'

ঈশ্বরচিন্তা হবে এই জন্মোৎসবে, তাই অনুমতি দিলেন। আর এই জন্যও অনুমতি দিলেন পরেও এইরূপ জন্মোৎসব পালন করবে সকলে। তাতে ভক্তদের পরম কল্যাণ হবে।

ভাগবতে আছে, ভক্তগণের উপর ভগবানের সকলের চাইতে বড়ো কৃপা, বড়ো অবদান তাঁর অবতারত্ব। ভক্তগণ অবতারের জন্ম, লীলা, মহাবাণী চিন্তা করে-করে ক্রমে চিন্তা শুদ্ধ করে ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা করবে।

ঠাকুরের ভালোবাসা, তাঁর কাজ, তাঁর গান, তাঁর নৃত্য, তাঁর নিজের হাতে ভক্তদের খাওয়ানো, ঈশ্বরের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ও শিশুর মতো ক্রন্দন, তাঁর মুহুর্মুহু সমাধি— এই সব চিন্তা করবে ভক্তরা— তাই তিনি জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন।

জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর অবতার শরীর ধারণ। সেই সুদুর্লভ পুরুষোত্তমের, অবতারের জন্মোৎসব স্বয়ং অবতারই আরম্ভ করিয়ে দিয়ে গেলেন। ঈশ্বরলাভের সহজ পথ অবতার দেখিয়ে গেলেন। অবতার নিজের পূজার আয়োজন নিজেই করেন। এই করে তাঁতে ভক্তদের রুচি জন্মিয়ে দেন। তাঁর মানুষরূপকে যে ভালোবাসবে— শরীর, মন, আত্মা যাকেই ভালোবাসুক তাঁর আর জন্ম হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট মন ও মনীষার প্রত্যক্ষ রূপ তাঁর 'কথামৃত'। 'মানুষ' রামকৃষ্ণকে এক দিন প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবীর দৃশ্যপট হতে অন্তর্হিত হতে হয়েছে কিন্তু রয়ে গিয়েছে

'দেবতা' রামকৃষ্ণের মৃত্যুহীন 'কথামৃত'। বছরের পর বছর যাচ্ছে, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর যাবে শতাব্দী। সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ। মহাকালের কালগ্রাস জগতের সকল ব্যক্তি ও বস্তুকে নিশ্চিহ্ন করলেও 'কথামৃত'কে গ্রাস করবার সাধ্য তার নেই, কোনও দিন হবেও না। ক্যান্সার আক্রান্ত, ক্ষীণদেহ, প্রায় নিরক্ষর এই দরিদ্র পুরোহিতের ভাবরূপের সম্মুখে আজ নতজানু মহাকাল, নতশির মহাপ্রকৃতি। প্রাজ্ঞজনেরা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, 'কথামৃত' সর্বশ্রাস্ত্রসার, শুধু সর্বশ্রাস্ত্রসার নহে, 'কথামৃত' সর্বশ্রাস্ত্রসারাৎসার। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে 'প্রায় নিরক্ষর' বলেছেন, সমকালের সকলেই যাঁকে নিরক্ষর বলে জানত— সেই দক্ষিণেশ্বরের পাগল, কথায় বেদ-বেদান্ত নিরন্তর অবলীলায় উৎসারিত হয়েছে। শুধু কি তাই? বেদ-বেদান্তকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর কথা, তাঁর উপলব্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'The latest & the most perfect' ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

সমন্বয়ের এই মহান আচার্য চেয়েছেন যে, আধুনিক মানুষ তার নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরে ডুব দিক এবং আবিষ্কার করুক তার মধ্যে সদা উপস্থিত তার একান্ত নিজস্ব দেব-স্বভাবকে, যা কি না সকল শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। ইন্দ্রিয়ের জগতে মানুষ যে সব বস্তু নিয়ে কাজ করে সে সব সস্তা, দু'দিনের জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এই ভাবে বলেছেন যে, সাগরের উপর সাঁতরালে কেবল খেলো ঝিনুকই পাওয়া যায়, গভীরে ডুব দিলে রত্ন মেলে। তাই তিনি গাইতেন: 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' মানব মনের গভীরে ডুব দিয়ে ভারতীয় সাহিত্য অনবদ্য সব মণিমুক্তা আহরণ করে এনেছে, উপনিষদ দেখি, কিংবা বুদ্ধের বাণী অথবা ভগবতগীতা— আমাদের দেশের এই উল্লেখযোগ্য ও সমৃদ্ধ প্রজ্ঞার ঐতিহ্যের সন্ধান আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে…।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে সেই অনুপ্রেরণার এক বিশাল ভাণ্ডার আমরা আবিষ্কার করে চলেছি।

ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন— হিন্দুর জীবনটা একটা Continual Worship (একটানা উপাসনা)। দিনরাত যখনই অবসর হবে তখনই জপ। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় টক্ টক্ করা চাই। কাজ শেষ করে করব— যদি এ মনে করা যায় তবে আর হল না। কাজের শেষ নেই, একটার পর একটা— এ চলবেই। সমুদ্র স্থির হলে স্নান করব— এ যেমন হয়ে ওঠে না, তেমনই সব কাজ শেষ করে জপ করব— এ-ও হয় না। তাই এর ভিতরেই সব করে নিতে হবে। ভাত বসিয়েছ, জপ কর। একটু বেশি অবসর হল, অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে বসে জপ কর। কোথাও যাচ্ছ, জপ করতে করতে যাও, এমনই করে সর্বকার্যের ভিতর জপ করার অভ্যাস করা। এ করতে-করতে হয়ে যায়। এ সব ঠাকুর কেন বলে গিয়েছেন? তিনি জগদগুরু কি না— লোকের কল্যাণের জন্য এ সব বলেছেন। সময় তো হয় না, তাই যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই তার নাম কর। কর্মত্যাগ ও কর্মসংক্ষেপ কী করে হয়, তার কৌশল সব দেখিয়ে গিয়েছেন, এ সব মানুষের কথা নয়। যিনি অবতার, ঈশ্বর— যিনি গুরু, যিনি বন্ধু তিনিই এ সব বলে গিয়েছেন আমাদের কল্যাণের জন্য।

ঠাকুর বলেছেন, 'আমি পাগলের মতো ছুটোছুটি করতাম— কোথায় দেবতা, কোথায় ভাগবত, কোথায় গীতাপাঠ হচ্ছে, সে সব স্থানে।' প্রথম প্রথম এ সব করতে হয়। তা হলে মনের খেদ মেটে। পরে বৃদ্ধবয়সে মনে আর কষ্ট হয় না। মন তখন বলে কি না, কিছুই করলাম না তাঁর জন্য। তাই বয়স থাকতে এ সব করে নিতে হয়। তার পর একস্থানে বসে রোমন্থন করা। যা দেখেছি, যা শুনেছি— এ সব নিয়ে থাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সংসার করতে দোষ নেই, সংসার কর। কিন্তু জেনে রাখ, সংসার অনিত্য। সংসারের ঐশ্বর্য, মান-সম্মান অনিত্য। দেহের শক্তি, সৌন্দর্য অনিত্য। সংসারে ব্যাধি, ব্যথা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা বাস্তব সত্য। এই সমস্ত মনে রেখে সংসারে থাক, কিন্তু মন রেখো এই অনিত্য সংসারের পিছনে যিনি নিত্যস্বরূপ সত্তারূপে বিরাজমান তাঁতে, যিনি ঈশ্বর। ঠাকুর উপমা হিসেবে বলেছেন, ধনীলোকের বাড়িতে কাজের লোকের কথা, নৌকার মধ্যে যেন জল না ঢোকে। বলেছেন, কাঁঠাল ভাঙবার আগে তেল মেখে নিলে আঠা লাগে না, জলে নামবার আগে হলুদ মেখে নামলে কুমির কাছে আসবে না, পাঁকাল মাছের উপমাও দিতেন— ঠাকুরের মতে এইগুলো হল সতর্কতা। যদি আমরা সতর্ক থাকি, আমাদের বিবেককে, আমাদের বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখি তা হলে এ সংসার 'ধোকার টাটি' না হয়ে 'মজার কুঠিতে' রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

এ কালের পতিত পাবন পরম করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন— 'মানুষ কি কম গা'। মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী— সকলের মধ্যেই সেই শক্তি বিদ্যমান, যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এ জন্য প্রয়োজন পুরুষাকারের। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে— 'তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাবে, যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাব, তবে দুর্বল হইবে, তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত গল্প 'এগিয়ে পড়'— এই উপদেশের ফলশ্রুতিতে এক দরিদ্র কাঠুরিয়া বনের মধ্যে এগিয়ে পড়ে একে একে চন্দন কাঠ, রুপোর খনি ও সোনার খনি পেয়ে ঐশ্বর্যবান হয়েছিল— সকলেরই তা জানা। গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থটি তো ধারণা করতে হবে? মানুষকে এগিয়ে পড়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে— নিজেকে জানতে হবে, নিজের ভিতর যে রত্নের ভাণ্ডার আছে, তার সন্ধান পেতে হবে। বিশ্বকবি গানের মাধ্যমে যেমন বলেছেন— 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না', 'আত্মানম্ বিদ্ধি'— এই তো ভারতবর্ষের চিরকালের ঋষিবাণী। নিজেকে জানা, ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে জানা আর তাঁর আলোতে জগতকে জানা— এই তিনটিই তো অধ্যাত্মজীবন গঠনের মূল সূত্র। এই সূত্রটির সন্ধান দিতেই তো অবতারের আবির্ভাব।

বিষয়রসে মজে থাকা বেহুঁশ মানুষের হুঁশ ফেরাতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। জগতকে বুদ্ধদেবের মতো দুঃখময় বা আচার্য শংকরের মতো

জগৎ মিথ্যা বলেননি— তার কাছে জগত হল আনন্দময়ীর লীলা— এ লীলায় ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য সবই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষামৃত মেশানো এই জীবন ও জগতকে ত্যাগ তো করেননি এবং ভালোবেসে আলিঙ্গন করে অদিব্য জীবনে রূপান্তরিত করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই জগন্মাতাকে বলতেন— 'মা আমি শুঁটকে সাধু হব না।' আবার কখনও বলতেন— 'মা আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনি, রসে বশে রাখিস।' বিভিন্ন ধর্মপথের কঠোর সাধনা ও তপশ্চর্যা সত্ত্বেও সারা জীবন ধরেই তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত ও আনন্দরূপ— আনন্দের যে নির্ঝর স্বরূপ। আনন্দ যেন স্বয়ং রূপধারণ করেছেন। ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন, গান, রসরসিকতার অন্ত ছিল না, তিনি যে রসস্বরূপ রসিক।

ভগবানের পথে জীবনকে উৎসর্গ করলে মানুষ তবেই তো অফুরান আনন্দের সন্ধান পাবে। সুখের উপকরণ সংসারে অনেক আছে, কিন্তু তাতে তো আনন্দ নেই, নিত্যরসের সন্ধান নেই, নশ্বর সুখের অন্বেষণে যখন অবসাদ আসে তখনই তো চিরন্তন আনন্দের, অমৃতের আস্বাদের জন্য মানুষ পাগল হয়— তখনই ছুটে যায় সেই মায়াবী হাসির অধিকারী পরমপুরুষের চরণপ্রান্তে— যিনি সব অহংকার, অভিমান, মান-গর্ব সব-সব কিছু বিনাশ করে— ধুয়ে মুছে সন্তানকে কোলে টেনে নেন— জগদবাসীর কানে কথামৃতের মধু বর্ষণ করে বলেন— 'আমি আলো জ্বেলে রেখেছি, সেই আলো দেখে চলে আয়', 'আমি ভাত বেড়ে রেখেছি— বাড়া ভাতে বসে যা।'

ক্ষুধার পরিতৃপ্তি, তৃষ্ণার পরমশান্তির সন্ধান আছে কথামৃতের পাতায় পাতায়— যা শুনলেই মঙ্গল, জীবনের সব পাততাপ দূর হয়ে যায়। আমরা এই যুগের মানুষ ধন্য হয়েছি, কৃতকৃতার্থ হয়েছি। ঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশির তল নাই বা পেলাম, কিন্তু কথা গঙ্গার আস্বাদ তো পেয়েছি! শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষকে বলেছেন— 'ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল।'

সবই আমাদের কৃপা করে উদ্ধার করার জন্য বলা। বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন— 'আমাকে ভুলো না, আমার কথা একটু বল, একটু কানে শোন, আমাকে একটু স্মরণ কর।' শ্রীশ্রীমাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন— ''জেনো! তোমার একজন মা আছেন', 'ঠাকুরকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না''। অভয়া নির্ভয় হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁদের কথা বলা, শোনা, চিন্তা করা মানেই তো তাঁদের স্পর্শ করা। সেই স্পর্শেই তো আসক্তির কালি ঘুচবে, মন, বুদ্ধি শুদ্ধ হবে। তাই ঠাকুর বলেছেন— 'চৈতন্য দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার ঋষিমুনিরা করেছিলেন। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আদর্শ লোকশিক্ষক। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কেবলমাত্র মুষ্ঠিমেয় ভক্তের জন্য নয়। তাঁর উপদেশ কেবলমাত্র তাঁর সমসাময়িক কালের জন্য নয়। বাংলায় জন্ম নিলেও তিনি শুধু বাংলার ছিলেন না। তাঁর আবির্ভাব, তাঁর জীবন, তাঁর বাণী সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের, সমস্ত মানুষের জন্য। সেই মহান লোকগুরুর শিক্ষা মানুষকে চিরকাল অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাবে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাঁর শিক্ষা অমৃতভিক্ষু প্রতিটি মানুষের তাই নিত্য স্মরণ-মনন করা উচিত। কারণ মরলোক থেকে অমরলোকে যাত্রার সেই হল প্রথম পদক্ষেপ।

> আমাদের দেশের মেয়েরা... বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, এ আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে যদি তা করতে হয়, তবে নয়।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

অতীতের স্মৃতিপথে

ড. রমা চৌধুরী

রজত জয়ন্তীর শুভ্র আলোকে চোখের সমানে জ্বল জ্বল করছে চিরমধুময়ী মাসীমা ও চিরহাস্যোজ্জ্বলা বাণীদির তেজোদ্দীপ্ত চিরউজ্জ্বল সেই রূপ। আর মনের মধ্যে বেজে চলেছে তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মেলামেশার কত মিষ্টি-মধুর সুর।

সুন্দরতম এই বিদ্যালয়ের পঁচিশ বৎসরে পূর্তি উৎসবে বিদগ্ধজন সমাবেশে আলোচিত হবে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও চমকপ্রদ সাফল্যের ইতিহাস, মন-প্রাণ ভরিয়ে দেবে ছাত্রীদের নানাবিধ কৃতিত্বের সংবাদ। আনন্দঘন এই পবিত্র পরিবেশে নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনার মাঝে আমি কিন্তু কোরবো এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা মাসীমা (মীরা দেবী) ও বাণীদির (বাণী দেবী)র মানস-পূজা তাঁদের সঙ্গলাভে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কয়েকটি মাত্র কথা দিয়ে।

সর্বজন বিদিত, সর্বজন সমাদৃত এই শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী অনন্যা চরিত্রা ঁমীরা দেবী এবং তাঁরই কন্যাপ্রতিম, প্রাণসমা ও দক্ষিণহস্ত স্বরূপা ঁবাণী দেবী সকলের নিকট শ্রদ্ধেয়া ও আদরণীয়া ছিলেন তাঁদের অনন্য সাধারণ গুণ ও শক্তির জন্য এবং বিশেষ করে জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদামণির পুণ্য পাদরেণুপূতা কন্যারূপে, 'মায়ের মেয়ে রূপে'। পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যসঙ্গ তাঁরা লাভ করেছিলেন, কৃপাঘন-আশীর্ব্বাদ স্নাতা হয়েছিলেন, তাঁর অহেতুক স্নেহের পরশও লাভ করেছিলেন তাঁদের জীবন-পাত্রটি পূর্ণ করে। কি পরম সৌভাগ্য তাঁদের! সেই দিক থেকে তাঁরা দুজনেই কি গৌরবমণ্ডিতা, কি মহিমময়ী, কি বরিষ্ঠা,—আমাদের থেকে কত উচ্চ, কত ধন্য, কত সার্থক!

অথচ তাঁদের চলন-বলন, আচারাচরণ, কথাবার্ত্তা ছিল, কত সরল সহজ সাধারণ, কত নির্মল, কত নিরহঙ্কার, কত স্নেহপূর্ণ, কত কোমল, কত সহানুভূতি সিক্ত, কত করুণাবর্ষী! তাঁদের কাছে আগত সকলকেই অতি আপন করে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রীতি দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে, সেবা

দিয়ে, যত্ন দিয়ে। সেজন্যই তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই প্রকৃষ্ট। সর্বদিকে প্রকৃষ্ট আমাদের পরম প্রিয় 'মাসীমা' এবং 'বাণীদির' প্রাণের গভীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁরাই দেখেছেন, কত সহজে এঁরা সকলকে কাছে টেনে নিয়ে, করে তুলেছেন আপনজন, প্রিয়জন। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁদের অসাধারণ।

১৯২৪ সাল থেকে আমাদের প্রাণসমা বন্ধু পাখীর সঙ্গে যাতায়াত ছিল নিবেদিতা-স্কুলে। তারই আত্মীয়তা-সূত্রে মীরা দেবীকে আমরা ডাকতাম 'ছোট মাসীমা' বলে, আর তাঁর পরম আদরের বাণী দেবীকে ডাকতাম 'বাণীদি' বলে। আমাদের স্কুল জীবন থেকেই তারা আমাদের মাসীর মত; দিদির মতই আদর যত্ন সাহস বুদ্ধি সব কিছু দিয়ে গিয়েছেন আজীবন।

'ছোট মাসীমা' আমাদের জীবনে যে কি ছিলেন, তা দু'এক ছত্র লিখে ভাষায় বোঝাতে পারা যাবে কি করে? তিনি ছিলেন আমাদের সব— মা, বন্ধু, উপদেষ্ট্রী, পথপ্রদর্শিকা, আলোক দায়িকা, অমৃত বর্ষিকা, আনন্দ-দায়িনী। আমার ত এমন কোন কথা ছিলনা যা তাঁকে বলিনি, এমন কোন সমস্যা ছিল না যার সমাধান তিনি করে দেননি, এমন কোন কার্য্য ছিল না, যা তাঁর পরামর্শানুসারে করিনি। আমার সমস্ত জীবন ব্যাপেই ১৯২৪-১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ অর্থে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া 'ছোট মাসীমা' ঠিক আপন মা-মাসীর মতই আমার জীবনকে সর্বদিক থেকে ভরে রেখেছিলেন স্নেহে, করুণায়, কল্যাণে, যত্নে, আনন্দে।

কিন্তু অশেষ শক্তির অধিকারিণী 'ছোট মাসীমাকে' আমি আমার বন্ধু বললাম কোন সাহসে? সেই সাহস পেয়েছি তাঁরই নিকট থেকে— তাঁকে 'গুরু' না ভেবে 'বন্ধু' ভাববার সেই গৌরব আমি লাভ করেছি তাঁরই কৃপায়। কারণ, বহু উচ্চস্তরীয়া হয়েও, তিনি অনায়াসে স্নেহভরে নেমে এসেছিলেন বন্ধুত্বের সমান স্তরে, আমার একেবারে নিকটতম জন হয়ে, আমার অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেরণা দান করে।

খ্রীষ্টপূর্ব শতকে বিরচিত সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ 'হিতোপদেশে' বন্ধুর একটিঅতি সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া আছে—

উৎসব ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ।
(হিতোপদেশ ১।১০৯)

অর্থাৎ যিনি উৎসবকালে, বিপদের সময়ে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে— সর্বক্ষেত্রেই পাশে থাকেন সাহায্য করবার জন্য— তিনিই প্রকৃত 'বন্ধু'।

এই অর্থেই অশেষ-গৌরব বিমণ্ডিতা হয়েও, ছোট মাসীমা ছিলেন আমার পরম বান্ধব— যাঁকে কোন ভয় না করে, একেবারে অতি আপন জন, বন্ধুর মতই সমান জন বলে ভাবতে পেরেছি চিরকাল।

দীর্ঘকাল ধরে দেখেছি, কি মধুময় রসঘন, সুধাসিক্ত ছিল তাঁর সমগ্র সুপবিত্র জীবন। বাইরের দিক থেকে তিনি ছিলেন অতি কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষাকারিণী— তাঁর চারপাশের কারো মধ্যেই তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা অনিয়ম, অসংযম, যথেচ্ছাচারাদি বিন্দুমাত্রও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মতে— জ্ঞান বা বিদ্যা প্রথমেই এনে দেবে সংযম, দৃঢ়তা, সুশৃঙ্খলতা, ধীরতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণ সকলের জীবনে। তবেই ত মানব-জীবনে বিদ্যা হবে সার্থকতম। এই কারণে, তিন সর্ব্বদাই সকলকে সুদৃঢ়ভাবে সুশৃঙ্খলতা রক্ষার নির্দ্দেশ দিতেন। সেজন্য স্বভাবতঃই তিনি অনেকেরই ভীতির পাত্রী ছিলেন। অথচ সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরটি ছিল অতি কোমল, অতি স্নেহপূর্ণ, অফুরন্ত মধু-সুধা-রস-আনন্দ নির্ঝর। —সেই মধু আস্বাদনেই আমিও ছিলাম পরম ধন্য, পরমতৃপ্ত। এ আমার কত শত জন্মের সঞ্চিত পুণ্যফল!

আর বাণীদি? ছোট মাসীমার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা বাণীদি ছিলেন যেন ছোট মাসীমারই কায়ার ছায়া। আমরা ত দুজনকে ছেড়ে দুজনকে ভাবতেই পারতাম না কোনদিন। প্রতি পদে পদে তাঁরা ছিলেন একেবারে এক ও অভিন্ন। অতি দুর্গম জগৎ-সংসার মাঝে প্রচণ্ড ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে পড়েও তাঁরা দুজনে একে অপরকে আশ্রয় করে, হাত ধরাধরি করে, উন্নত মস্তকে, স্ফীত বক্ষে, দৃঢ়-দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে যেতে পেরেছিলেন অনায়াসে নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় অন্তর্হিহত এই সাম্য-ঐক্যের গুণে।

কি অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন আমাদের আদর্শ স্থানীয়া বাণীদি। সর্ববিষয়ে পারদর্শিনী বাণীদি ছিলেন অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনাদীপ্তা। সকল রকম কাজ তিনি করতেন কেবল কর্তব্য বোধে নয়,— তার চেয়েও অনেক বেশী ভালবেসে, প্রাণের টানে, অন্তরের তাগিদে। সেজন্য তাঁর কাজ কেবল কাজই থাকত না, হয়ে উঠ্‌ত তাঁর প্রীতি, মৈত্রীর পূর্ণ প্রতীক।

বস্তুতঃ বাণীদি সত্যই আনন্দময়ী জগজ্জননীর আনন্দাংশ সম্ভূতা। তাঁর সদা-হাস্যময়ী, স্নেহসুকোমল, সুন্দর মুখখানি আজও ত জ্বল জ্বল করছে আমার চোখের সামনে। মাতৃ-ইচ্ছায় জাগতিক কাজ সাঙ্গ হওয়ায় রস মধুরা বাণীদি দেহ রাখলেন সোমবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬-তে।

আমরা ত নিজেদের দুঃখ ভুলে, ব্যাকুল হয়ে উঠলাম ছোট মাসীমার জন্য। তিনি কি করে বাণীদিকে বাদ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন এই ভেবে। কিন্তু না, তিন বৎসর কাল বাণীদি বিহীন জীবন যাপন করে, ছোট মাসীমা জগতকে দেখিয়ে গেলেন, কি করে গভীরতম শোককেও পরিণত করা যায় স্থিরতম সান্ত্বনায়, কল্যাণতম কর্মে, শোভনতম সেবায়।

ছোট মাসীমা, বাণীদির কথা প্রসঙ্গে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাঁদের কর্মজীবনের রূপায়িত আদর্শ এই শ্রীসারদা আশ্রম বালিক বিদ্যালয়ের অঙ্কুর থেকে পল্লবিত অবস্থার কথা। আদর্শনিষ্ঠ মাসীমা ও অক্লান্তকর্মী বাণীদি, সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা যে আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন এই বিদ্যালয়ের মর্মমূলে, তার ফলে, শত বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়েও অবিচল অবস্থায় এই বিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

রজত জয়ন্তীর এই আনন্দ উৎসবে আমাদের পরম প্রিয় ছোট মামীমা ও বাণীদি স্থূল দেহে নেই, কিন্তু তাঁদের হাতে গড়া সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী ঊষা, অনিলা, রেবা প্রমুখ আশ্রমবাসিনীগণ মাতৃকৃপায় তাঁদের রূপায়িত শিক্ষাধারাটি পঁচিশ বৎসর ধরে চালিয়ে আসছেন অক্ষুণ্ণ মহিমায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির অজস্র আশীর্ব্বাদে, ছোট

মাসীমা ও বাণীদির তপস্যাপূত এই শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় আদর্শ জ্ঞানপীঠ রূপে সর্বজনের মঙ্গল সাধন করে উত্তরোত্তর প্রগতির পথে এগিয়ে চলুক স্থির-ধীর-দৃঢ়-দৃপ্ত পদক্ষেপে এই প্রার্থনা।

বরমাতৃপদ সুখদে বরদে
দীনায়ার্নতি কোটী জননি!
বিশ্ববরেণ্যে স্মরণসুপুণ্যে
জগদম্ব নারায়ণি।
জননি!
শ্রীসারদামণি
মাতদিশি তবাশীরাশি
বিতরতু ক্ষেমং বিধাত্রি!
শোকজর্জরে মমান্তরে
কৃপাং বর্ষয়ে বিশ্বধাত্রি!
জননি! শ্রীসারদামণি!।।
''জননি। সারদামণি।
সুখদায়িনি! বরদায়িনি!
জগজ্জননি! নারায়ণি!
জননি! সারদামণি!
তোমার স্মরণে উদিত হয়
পুণ্য শত শত!
তোমার শ্রীপাদারবিন্দে
কোটী প্রণাম নিয়ত।।
দিকে দিকে তব আশিষ রাশি
করুক মঙ্গল বিতরণ!
শোকজর্জরে মমান্তরে
করুক কৃপা বরিষণ।।''
...ওঁ শান্তিঃ।

> No great work can be achieved by humbug. It is through love, a passion for truth, and tremendous energy, that all undertakings are accomplished. Therefore, manifest your manhood.
>
> — Swami Vivekananda

দরিদ্রদেবো ভব

স্বামী গিরীশাত্মানন্দ

স্বামী বিবেকরানন্দ ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন মহীশূরের রাজাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির শেষে স্বামীজী লিখেছিলেন ''হে মহামনা রাজন! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য— সকলেই ক্ষণস্থায়ী, তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছেন। মহারাজের ন্যায় মহামনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ভারতকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শ্রদ্ধার সহিত আপনার নাম স্মরণ করিবেন''। দরিদ্রের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা এবং কল্যাণ চিন্তা তাঁর বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে পাই। বর্তমান ভারতে অধিকাংশ মানুষ এখনও গরিব। গরিবের কল্যাণ স্বার্থে আমাদেরকে ভাবতে হবে, ভুল করেও যেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁদের প্রতি আমরা খড়্গহস্ত না হই। তাঁরাও ভারতবাসি। তাঁদের উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। সে জন্য আমাদের দেখা প্রয়োজন এদের শিক্ষা-দীক্ষার কিভাবে উন্নতি করা সম্ভব। স্বামীজী সে জন্য আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, ''গরিব নিম্ন জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইওরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়; আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী— এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গলা দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না। এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্য আসে যায় না, কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে— এই বিশ্বাসটি ভুলো না। রাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, ততই উত্তম হবে, যে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই।''

স্বামীজী বললেন, ''আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে— ধর্মে এক বিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান। মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।'' স্বামীজী রাস্তা দেখালেন গরিবের উন্নতি বিধানের মাধ্যমে জাতির উন্নতির। ''মৃত্যু পর্যন্ত গরিব ও পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে— ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।''

স্বামীজী আরও বললেন, ''এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তি বলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না।''

স্বামীজী গরীবদের জীবিকা ও চিরন্তন কালের পরম্পরাতে আঘাত না হেনে তাদের মধ্যে দিতে চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ মানসিক ও কায়িক স্বাধীনতা। ''চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি ও কল্যাণ''— স্বামীজী তা জানতেন।

বিদেশ থেকে ফিরে স্বামীজী মঠে থাকতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। মঠের কাজে যে সমস্ত সাঁওতালরা কাজ করত তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা। স্বামীজী তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কাজের সময় স্বামীজী তার কাছে গেলে স্বামীজীকে কেষ্টা বলত, ''ওরে স্বামী বাপু, তুই

আমাদের কাজের সময় এখানে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়ো বাবা এসে বকে''। কথা শুনে স্বামীজীর চোখ ছলছল করত, আর বলতেন, ''নানা বুড়ো বাবা বকবে না, তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল''। একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বললেন, ''ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?'' কেষ্টা বলল, ''তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে। তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ!'' স্বামীজী বললেন, ''নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে, তা হলে তো খাবি?'' কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হলে স্বামীজীর আদেশে মঠে লুচি তরকারি, মিঠাই, মণ্ডা, দই ইত্যাদি যোগাড় করা হল আর স্বামীজী তাদেরকে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। খেতে খেতে কেষ্টা বলল, ''হ্যাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনও খাইনি।'' স্বামীজী তাদের পরিতোষ করে খাইয়ে বললেন, ''তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।'' স্বামীজী যে দরিদ্র নারায়ণ সেবার কথা বলেছেন তা তিনি এই ভাবে অনুষ্ঠান করে দেখিয়ে গেলেন। পরে মঠের সন্ন্যাসীবর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন— ''দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ— এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। দেশের লোকেরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়— ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোকেদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।''

''আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব উঠে, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নেই রে! তাই ইচ্ছা হয় তোদের ছুঁতমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে বলি— কে কোথায় পতিত— কাঙাল, দীন দরিদ্র আছিস আয়। সবাইকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না।''

রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি এই দরিদ্ররূপী নারায়ণ। স্বামীজীর বিদেশ যাত্রা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রের কল্যাণ। স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজের বন্ধুদের আদেশ করেছিলেন— ''দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরা চেষ্টা করব।''

> যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না,
> অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না,
> আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

‘বাণী ও রচনা’ থেকে গৃহীত

গীতাতত্ত্ব

স্বামীজী কলিকাতায় থাকাকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামীজী ইহাদিগকে ধ্যান-ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়; তাহাই এখানে ‘গীতাতত্ত্ব’ নামে সংকলিত হইল।

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। প্রথম— গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ উহা বেদব্যাস-প্রণীত কি না? দ্বিতীয়— কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? তৃতীয়— যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? চতুর্থ— অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? প্রথমতঃ সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি, দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন

বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস— কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটি উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ‘ব্যাস’ নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য— এই নামটিও একটি সাধারণ নাম। শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে গীতা-গ্রন্থখানি সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ-কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়ন-ভাষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, যদবলম্বনে রামানুজ ‘শ্রীভাষ্য’ প্রস্তুত করিয়াছেন— বলিয়াছেন, শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশবিশেষ উক্ত বোধায়নকৃত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায় নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়াও এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটি কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন-ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, তখন গীতাসম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ

অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য-প্রণীত। তাঁহাদের মতে— তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতে মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

কৃষ্ণসম্বন্ধে সন্দেহ এই ঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে 'মদনোৎসব'-নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপানো হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর পূর্বকালে লোকের নাম-যশের আকাঙ্খা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না— অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্রাদি রচনা করিয়াছেন; পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবনধারণ করিতেছেন; কিন্তু আবার বেদে পাই 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'। আমরা এখানে কাহাকে অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দিকে তাহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। ইহা খুব সম্ভব এইজন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক— গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় প্রাচীন কালে এক-একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে— তাহার মধ্যে এক-একখানি শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাবসকল সন্নিবিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা— যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল ব্যক্তি (Short-hand writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সে-সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপকমাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য— সদসৎপ্রবৃত্তির সংগ্রাম। এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে।

তৃতীয় প্রশ্ন

অর্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে এই যে— 'শতপথব্রাহ্মণ' অতি প্রাচীন গ্রন্থ, উহাতে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে স্থলে অর্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিৎ জন্মেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা— যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্মসাধনাশিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐগুলি কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ-সম্বন্ধে সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি ভাল বিষয়ে প্রচার করিতে হইলে একটি মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means; এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত সত্যকে ধারণা করা, সত্য বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীস্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

গীতার বিশেষত্ব

এক্ষণে কথা হইতেছে— গীতা জিনিসটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ— তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি— গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো— যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম— এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার

অর্থ— উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তো পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম— এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

গীতার একটি শ্লোক

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'— এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল! সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেরূপ ধীর। অর্জুনের (মনে) ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই— তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, 'আমরা সত্ত্বগুণী'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, 'আমরা পরমহংস'। কারণ, শাস্ত্রে আছে— পরমহংসেরা 'জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে— ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, আর একজনের জানোন্মেষ মোটেই হয় নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটিতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটিতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসে; এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছে।

অর্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'— তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ— এ তো তোমার সাজে না। তাই ভগবান বলিতেছেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। জগতে পাপতাপ নাই, রোগশোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে-কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', তুমি বীর, তোমার এ (ক্লীবতা) সাজে না।

তোমরা যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পার— 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ-সকল রোগ-শোক, পাপ-তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান— যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকেও ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিকটিই দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর; সমগ্র জগৎকে বল— তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

বিদ্যালয় পত্রিকা 'আলিম্পন'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার নির্বাচিত রচনা

অমূল্য স্মৃতি

গৌরী দেবী

১৯৬৩ সনের জুলাই মাসের মাঝামাঝি আশ্রমিকা হয়ে শ্রী সারদা আশ্রমে যোগ দিই। এর আগে একদিন আশ্রম সম্পাদিকা শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যা পূজনীয়া ঁবাণী দেবীর পত্রে যোগাযোগ করার জন্য এক পত্র পাই। তাতে বনহুগলী থেকে কিভাবে আশ্রমে আসব তার নির্দেশও থাকে। একদিন ঁবাণীদির পত্র নিয়ে আশ্রমে এলাম। দারোয়ানকে পত্রখানি দেখাতে সে তিনতলায় নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকতেই দেখি দুদিকে দুটো তক্তাপোশে পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় একটিতে সৌম্য শান্ত ফর্সা মহিলা বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ''এসো''। প্রণাম করতে আমাকে বসতে বললেন। তারপর আমাদের বাড়ীর সংবাদ নিলেন। পরে বললেন, ''আশ্রম'' বলতে আমরা মনে করি ''মায়ের সংসার''। ঘর পরিষ্কার থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজই মায়ের সংসারের কাজ মনে করে করতে হবে। বাড়ীতে থাকার সময় আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলের জন্য যা কিছু করেছো কিন্তু এখানে মায়ের সংসারের জন্য করতে হবে। ''Work is worship'', এই মনে করে সব কাজ করতে হবে তাহলেই তুমি কাজ করে আনন্দ পাবে ও কাজও সুন্দর হবে।''

কাজকেই যে পূজারূপে মনে করে কাজ করছেন এঁরা তা কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম। আশ্রমের এক বর্ষীয়সী দিদি যিনি ছিলেন স্নেহময়ী সকলের শোভাদি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যা। তিনি আশ্রমের রান্নাঘরের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে দেখে মনে হল সত্যই তিনি 'কাজকে পূজা' বলে মনে করেছেন। প্রতিদিন ভোর চারটের সময় প্রাতঃকৃত্য সেরে সকাল ছটা পর্যন্ত জপ, পাঠ সেরে চারতলায় তাঁর কাজের জায়গায় যেতেন। সকলের টিফিন খাওয়া হলে বসতেন আনাজ কুটতে। ৫৭/৫৮ জনের আনাজ একজন সাহায্যকারিণীকে সঙ্গে নিয়ে কাটতেন। বিকালের টিফিনের লুচি ও রুটিও বেলতে দেখেছি। আশ্রমে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে আনাজ কাটতে সাহায্য করতাম

ও বিকালে রুটি, লুচি বেলতে তাঁকে আর দিতাম না। কিছু দরকার হলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমাকে ডাকতেন।

১৯৬৩ সাল ছিল শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী পালনের বছর। আমাদের আশ্রমেও তার প্রস্তুতি চলছে। পূজনীয়া মাসীমা ও বাণীদির ইচ্ছা প্রতিমা এনে দুর্গাপূজা করবেন। সেইজন্য সকলেই খুব ব্যস্ত। দুর্গাপূজার আগে ছিল জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ভক্ত মহিলারা বসে প্রসাদ পেতেন। নিজেদেরই ভোগ রান্না করতে হত ২০০/২৫০ জনের মত। আগের দিন আনাজ কাটা, ডাল ভাজা, তালের বড়া করা প্রভৃতি কাজ করার সাহায্যের জন্য ডাকতেন ও বলতেন— ''তোমরাই তো ভবিষ্যতে আশ্রমের হাল ধরবে, জেনে নাও, শিখে নাও আশ্রমের উৎসব কেমনভাবে, কি কাজ সুষ্ঠুভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করতে হবে।'' একদিন দেখি, সন্ধ্যা ভজন ও জপ সেরে একখানা বড় গেরুয়া রঙ করা খাটে দুর্গাপ্রতিমার জন্য শাদা রঙ নিয়ে আল্পনা দিচ্ছেন। কি অপূর্ব সেই আল্পনা না দেখলে মুখে বলা যায় না।

সকাল দশটার ঘণ্টায় স্কুলের আবাসিক মেয়েরা খাচ্ছে। টুলে বসে বসে খাওয়া দেখছেন আর হাতে গুণ ছুঁচ নিয়ে ভাঙ্গা ঝুড়ি সুতুলী দিয়ে মেরামত করছেন। সময় নষ্ট করা চলবে না। কাঠি খুলে গেছে বলে ঝুড়ি ফেলা যাবে না। একটু সুতলী দিয়ে বাঁধলে তা কয়েকদিন ঝুড়িটা ব্যবহার করা যাবে। ভক্তের দেওয়া টাকা কত কষ্ট করে রোজগার করে তাদের টাকার অপব্যবহার করা চলবে না। এই ছিল তাঁর নীতি। স্কুল থেকে সেলাইয়ের দিদিমণি পরীক্ষার নমুনা দিয়েছেন। দোসুতি কাপড়ের, এ, বি, সি লেখা অবসর সময়ে ছুঁচ সূতা দিয়ে জুড়ে ঝাড়ন করছেন, ভাতের হাঁড়ি কড়া নামানোর জন্য। পরীক্ষার উলের টুপি, মোজা সোয়েটারের বুক খুলে রঙ মানিয়ে সোয়েটার বুনছেন। শীতের সময় যার সোয়েটার নেই তাকে দেবেন। রঙ মানিয়ে সুন্দর একটা পুরোহাতা সোয়টোর বুনলেন।

১৯৬৯ সনে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী গিয়েছি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা মায়ের নূতনবাড়ীতে হয়েছে। জিনিসপত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে এদিক ওদিক ঘুরছি, একদিকে দেখি তাঁবু খাটানো যজ্ঞের জন্য— ''যজ্ঞকুণ্ড'' করা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মায়ের সেবক পূজনীয় শ্রী বরদা মহারাজ; কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। শোভাদিকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, ''আমার চিন্তা নেই। শোভা এসে গেছে, শোভাই আলপনা দেবে''। তিনি মেয়েগুলোকে শোভাদিকে দেখিলে বললেন— ''এরা সব নিবেদিতা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। বেলুড়ের ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা কি সুন্দর আলপনা দিয়েছিল দেখার মত।'' শোভাদিকে বললেন— ''জগদ্ধাত্রীপূজার দিন এই বেদীতে 'সপ্তসতী যজ্ঞ হবে' তোমাকে যজ্ঞবেদীর চারপাশে আলপনা দিতে হবে।'' তাঁকে সাহায্য করার জন্য দু তিনজন মেয়েকে দিলেন। মেয়েগুলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ''তোরা আল্পনা দিতে রাজী হচ্ছিলি না, দেখ শোভা তোদের থেকে কত বড়, কত আগ্রহ করে বসে গেল আলপনা দিতে।'' শোভাদির সঙ্গে নানা রকম পুরানো দিনের কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ বললেন, ''রাধু পাগলীর সেই টনটনে জ্ঞানের কথা মনে আছে'' ''আমি জানি আমার রোগ সারবার নয় তাই মহারাজরা আমাকে কাশীতে পাঠিয়েছেন, কাশীতে মরলে মুক্ত হয়ে যাব বলে। ওঁরা জানেন না আমার মুক্তি আমার হাতের মুঠোয়।'' শোভাদিকে দেখে তাঁর পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে। রাধুদির সেবিকা হিসাবে মহারাজরা অসুস্থ রাধুদির সঙ্গে শোভাদিকে পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতা স্কুলে যখনই রাধুদি ও তাঁর মেয়ে আসতেন তখনই শোভাদির ওপর তাদের দেখাশোনার ভার পড়তো।

১৯৭৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়। বেলুড় মঠ থেকে বন্যাত্রাণের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হয়। আমরা পাড়ার মহিলাদের কাঁথা তৈরী, জামা সেলাই প্রভৃতি কাজে সাহায্য করার জন্য বলি। তারা সানন্দে সকলে আসেন সাহায্যের জন্য। আমাদের আশ্রম বাড়ীর একতলার হলঘরে তাদের সময় মত এসে মেসিনে অথবা হাতে সেলাই করতে বসে যান। একদিন শোভাদি বললেন, ''আমাকে দাও, আমিও কাঁথা করে দোব। একজন আশ্রমিকাকে বললেন, কাঁথা পেতে দিতে। তিনখানা কাঁথা চেয়ারে বসে বসে করে দিলেন। চোখে ভালো দেখতেন না, অনেকগুলো সুঁচে সুতো পরিয়ে রাখতেন ছুঁচের সূতো ফুরিয়ে গেলে কাউকে দেখতে পেলে বলতেন ছুঁচে সূতো পরিয়ে দেওয়ার জন্য। আন্দাজে কি সুন্দর সমান বরফি করে কাঁথা সেলাই করে দিলেন। বলতেন, ''আমার কাঁথা সেলাইও হয় আবার জপও হয়।'' শোভাদি ছিলেন— শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের সেলাই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী, এক নীরব কর্মী।

আরেকজনকেও দেখেছি যিনি কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রুটিনে বাঁধা ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। ভোর চারটায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে চলে আসতেন পাঁচটার সময় ঠাকুর ঘরে। ভোর পাঁচটার সময় ভজন হবে। কখনও তিনি ভজন পরিচালনা করতেন, কখনও বা অন্য কেউ ভজন পরিচালনা করলে তিনি ভজনের সময় উপস্থিত থাকতেন। সাড়ে ছ'টায় চায়ের ঘণ্টায় চা খেয়ে নীচে নামতেন— বোডিং-এর মেয়েদের স্টাডির জায়গায় বসিয়ে নিজের টেবিলে বসে হিসাবের কাজ করতেন। মাঝে মাঝে টেবিল ছেড়ে উঠে দেখতেন মেয়েরা পড়ছে কিনা। কখনও বা কারুকে অঙ্ক করিয়ে দিতেন, কখনও বা সংস্কৃত পড়াতেন। কখন আবার বোডিং-এর মেয়েদের স্কুলের সেলাই দেখিয়ে দিচ্ছেন। তিনি অনিলাদি বলেই পরিচিত ছিলেন ছেলে, বুড়ো সকলের কাছে। অত্যন্ত মিশুকে, স্নেহময়ী। সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কাটে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় ব্যাচে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং বেথুন কলেজ থেকে আই.এ ও বি.এ পরীক্ষা দেন। কিছুদিন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। পরে শ্রী সারদা আশ্রমে চলে আসেন ও শ্রী সারদা আশ্রমের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হন। ইতিমধ্যে বি.টি পরীক্ষাও পাশ করেন। ১৯৫৭ সন থেকে '৬৫ সন পর্যন্ত শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন।

তাঁকে দেখেছি ছুটির দিনে বোর্ডিং-এর স্কুলের মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষার খাতার পরিষ্কার কাগজগুলো ছিঁড়ে সেলাই করে ব্রাউন পেপারের মোটা ঠোঙার কাগজ দিয়ে মলাট করে রাফ খাতা তৈরী করতে ও মেয়েদের দিয়েও এই কাজ করাতেন। এই খাতা দিয়ে ধোপার হিসাবের খাতা, ফোনের জায়গায় থাকতো ফোনের হিসাব রাখার জন্য খাতা। কাগজ ভাঁজ করে খাতা হত মাস কাবারী হিসাব রাখার জন্য, মাস কাবারী ফর্দ করার জন্য ও দৈনন্দিন বাজারের হিসাব রাখার জন্য। হঠাৎ কোন আলো ফিউজ হয়েছে অনিলাদির কাছে সংবাদ এলো। অনিলাদি যন্ত্রপাতি নিয়ে আশ্রমিকা কাউকে দিয়ে ফিউজ তার পাল্টানোর কাজটা করে অন্ধকার দূর করলেন। কখনও দেখেছি পাঁচতলায় একটা খাবার জলের ট্যাঙ্ক ছিল। পাঁচতলায় উঠতে হত মইয়ের সাহায্যে। প্রতি সপ্তাহে সেই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে হত। একটা নারকেল ঝাঁটা ও একটা বাটী নিয়ে মইয়ের সাহায্যে উঠে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে নেমে আসছেন। আশ্রমের বার্ষিক উৎসব হবে। (অনিলাদিকে) উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত গাইতে হবে। আশ্রমিকা ও বোর্ডিংয়ে ছাত্রীদের নিয়ে বসে গেলেন প্রাকটিস করতে। ঁবাণীদির ভাই এসে শিখিয়ে যেতেন গান। আমার আশ্রম জীবনের প্রথম উৎসবের জন্য গাওয়া গান ''সঙ্ঘ মূরতি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণতি তোমারে বারংবার'' আর মায়ের গান, ''ধরা দিতে এসে লুকাও পুনঃ হেসে'' ও ''দাও গো মা দেখা দাও'', শেখা হয়।

১৯৬৩ সনে আশ্রমে ঁদুর্গাপূজার আয়োজন হচ্ছে তার জন্য একটা থলি হাতে নিয়ে চলেছেন টাকা সংগ্রহের জন্য। শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্রী নিজেদের ভিতর বলতো, ''যোগাযোগ মন্ত্রী থলি নিয়ে চলেছেন টাকা সংগ্রহের জন্য।'' তাঁর সঙ্গে ছিল ভক্ত পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তখনকার সময় বিখ্যাত লেখিকা শ্রদ্ধেয়া আশাপূর্ণ দেবীকেও দেখেছি নিজের আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে তাঁর সঙ্গে। তিনি একবার এসেছেন শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের পুরষ্কার বিতরণ করতে। সভা শেষে আশ্রমে এসে বসেছেন। অনিলাদির সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলছেন— 'অনিলা, আমি ছেলে বৌমাকে বলেছি আমি যা কিছু করি না তোমরা জেনো এবৎসর আমার বয়স ৭২ বৎসর!'

সেই পুরানো স্মৃতি যখন মনে হয় নিজেকে ধন্য মনে করি এই ভেবে যে এঁদের সঙ্গে কিছুকাল সঙ্গ করতে পেরেছি।

> ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়— আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা— তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু প্রভু' বলে চিৎকার করে সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

খেলাধূলায় স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ঋতানন্দ

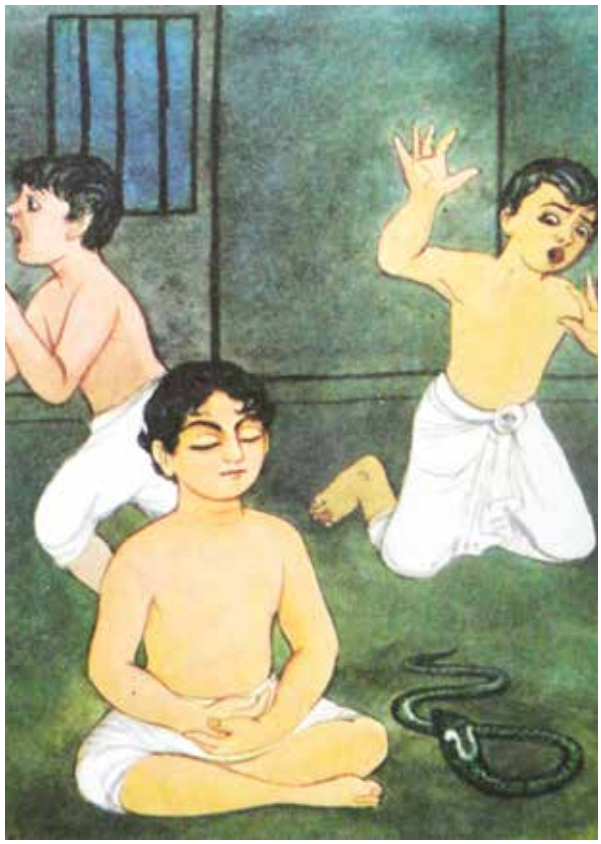

সর্বতোমুখী প্রতিভার এক বিরলতম দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ যে দিকে পড়েছে সে দিকেই তা আলোকস্তম্ভসদৃশ হয়ে প্রচণ্ড তাপ ও আলোক বিকিরণ করেছে। সন্ন্যাসী চরিত্রের সঙ্গে খেলাধূলা বিষয়টি আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। তবুও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে খেলাধূলা যেমন অনবদ্য ভাবে খাপ খেয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনও সন্ন্যাসীর জীবনে তা অকল্পনীয়। অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিভিন্ন রচনা থেকে স্বামীজীর বাল্য ও কৈশোরের খেলাধূলার উপাদান ও পরবর্তী জীবনে বিবিধ ক্রীড়াবিষয়ে আগ্রহ ও নৈপুণ্য তাঁর নিজের ও জীবনীকারদের রচনায় এবং স্মৃতিকারদের স্মৃতিচারণে প্রায়শই প্রকাশিত হয়েছে। তার সামান্যমাত্র দিগ্‌দর্শন বর্তমান রচনাটির প্রতিপাদ্য।

সিমলাপাড়ায় বর্তমানে যেখানে ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, সেখানে আগে যোগেন পালের জিমন্যাস্টিকের আখড়া ছিল। অনেকে ওখানে কুস্তি, জিমন্যাস্টিক শিখত। ট্র্যাপিজ, প্যারালাল বার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। নরেন্দ্রনাথ সেখানে খুব কুস্তি, জিমন্যাস্টিক করত। সকলেই খেলার জন্য প্রস্তুত, হয়তো বিলের যেতে কিছু দেরি হচ্ছে, প্রত্যেকেই দোরের দিকে চেয়ে আছে, খেলতে যেন কারও মন নেই। আর যেমনি বিলে ঢুকল, সকলেই ভিতরে যেন একটা শক্তি এল এবং সব ছেলেরা উঠে উল্লাস করে খেলতে লাগল। যেন এসেছে সর্দার। সে উপস্থিত না থাকলে খেলা জমত না।

যোগেন পালের আখড়া ছাড়িয়ে বর্তমানে যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সেখানে ঘোষেদের পুকুর ভরাট হওয়ার পর নবগোপাল মিত্রের জিমন্যাস্টিকের আখড়া হয়। ওখানেও নরেন্দ্র কিছু দিন কসরত করেছিল, ট্র্যাপিজে যা দোল মারত তা ভীতিজনক। পিকক, সামারসল্ট খুব শিখেছিল। তার পর হোগলকুড়ের প্রসিদ্ধ অম্বু গুহর আখড়ায় অনেক দিন কুস্তি লড়েছিল। সেই সময় রাখালচন্দ্র ঘোষও (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কুস্তি লড়ত।

এক সময় নরেন বাড়ির উঠানে শরীরচর্চার এক বন্দোবস্ত করল, যেখানে তার বন্ধুরা নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি অভ্যাস করত। এই উদ্যোগ বেশ কিছু দিন চলেছিল, যত দিন না তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের হাত ভেঙে যায়। তার কাকা ব্যায়ামাগারের সব যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেললেন। তখন নরেন তার বন্ধুদের নিয়ে প্রতিবেশী নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় যোগ দিল। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের এই জায়গাটিকে উপযুক্ত মনে করে নরেন ঐকান্তিক ভাবে নিজেকে শরীরচর্চায় নিয়োজিত করল এবং ক্রমে লাঠিখেলা, অসিচালনা, দাঁড় বাওয়া, সাঁতার, কুস্তি ও অন্যান্য খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠল। এক বার একটি ব্যায়াম ও হস্তশিল্পের মেলায় মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম হওয়ায় সে রূপার প্রজাপতি পুরস্কারস্বরূপ পায়।

লাঠিখেলায় নরেনের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এই খেলায় সে অনেক মুসলমান বিশারদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে প্রভূত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন নরেন এক বার শরীরচর্চার প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল। লাঠিখেলা চলার সময় যখন অনেকেই আগ্রহই স্তিমিত হয়ে এসেছে, নরেন হঠাৎ এগিয়ে এসে লাঠিখেলায় তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে আহ্বান করল। সব চাইতে বলবান প্রতিযোগী তার আহ্বানে সাড়া দিল এবং দু'জনের মধ্যে লাঠিখেলার তুমুল লড়াই চলল। নরেন্দ্র দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছিল

এবং হঠাৎ প্রতিপক্ষকে এমন জোরালো আঘাত করল যে, তার হাতের লাঠি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং সুনিশ্চিত করল তার জয়। সে দিনের বিজয়ী নরেনের জন্য দর্শকদের আনন্দোচ্ছ্বাসের বাঁধ ভেঙে গেল

বালক বীরেশ্বর কখনও স্থির হয়ে থাকতে পারত না, সব সময় ছটফট করত— কিছু না কিছু যেন তাকে করতে হবে। এক দিন হুড়োহুড়ি করতে করতে বীরেশ্বর রক থেকে বেকায়দায় পড়ে যায় এবং উঠানের একটি খোলামকুচি বা ইঁটের টুকরো তার কপালে ফুটে যায়। কপালটি অনেকটা চিরে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকল। পরে যদিও ঘা শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাটা দাগ চিরকাল ছিল।

তখন কপাটি খেলার খুব প্রচলন। তাদের বাড়ির বাইরের উঠোনটি খুব বড়ো। ছুটাছুটি করার খুব সুবিধা। বাড়িতেও জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিয়ে বালকের সংখ্যা ১০-১৫টির উপর এবং পাড়ার ছেলেরাও সব আসত। উঠানে কপাটি খেলা খুব জমত। তখন বাড়িতে অনেকগুলি গরু ছিল। বিচালির আঁটি থেকে খড় এনে একটি সীমানা করা হত এবং দুটি দলে ছেলেরা দাঁড়িয়ে— 'চুরে রাং ঠ্যাং,/ সোনা দিয়ে বাঁধাবো ঠ্যাং।/ মারবো ঠ্যাঙ্গের বাড়ি,/ পাঠাবো যমের বাড়ী।।' এই সব ছড়া আওড়াতে আওড়াতে কপাটি খেলা হত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'মোর' করে দেওয়া হত। কখনও বা মুখ বন্ধ করে 'আম্বা', 'আম্বা' করে ছড়া না আওড়িয়ে ছুঁয়ে আসত। কপাটির নানা কৌশল, নানা প্যাঁচ ও ল্যাং মারা খুব চলত।

তখনকার দিনে মার্বেল খেলার বিশেষ রেওয়াজ ছিল। গাব্বু পিল, ঘরপার, চিক বেগদা প্রভৃতি খেলা ছিল। বীরেশ্বর গাব্বু পিল ও ঘরপার খেলাতে খুব টিপ মারতে পারত এবং মার্বেল জিতে নিত। কিন্তু ছেলেরা যারা হেরে যেত, তারা খেলার শেষে কান্না ধরত আর বলত— 'ভাই বিলে, তুই ভুলিয়ে আমাদের মার্বেল জিতে নিয়েছিস, তুই আমাদের মার্বেল দে।' বিলে যদিও ন্যায়ত মার্বেল জিতে নিত কিন্তু বালকদের কাকুতি-মিনতিতে সব ফিরিয়ে দিত। সে এক-এক দিন প্রায় ৩০-৪০টা মার্বেল জিতত। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩-৮৪ সালে যখন বি এ পাশ করে পিতা বিশ্বনাথ ও খুল্লতাত তারকনাথের সঙ্গে হাইকোর্টে বের হতে আরম্ভ করেছেন, তখন এক দিন ছেলেরা উঠানে মার্বেল খেলছিল। নরেন্দ্রনাথ এক জনের কাছ থেকে মার্বেল চেয়ে নিয়ে বলল, 'দেখ, আমার হাতের টিপ দেখবি'। এই বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাব্বু পিল খেলতে লাগল এবং গাব্বু থেকে মেরে ঠিক মার্বেল তুলতে লাগল। তার পর খানিকক্ষণ ঘরপার খেলল। অনেকে বসে মারে, কিন্তু বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে মারতে লাগল। তখনও তার হাতের টিপ বেশ ছিল। সাথীরা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, 'ভাই বিলে, তুই কী করে টিপ মারিস?' সে বলত, 'মার্বেলের সঙ্গে, হাতের সঙ্গে, চোখের সঙ্গে এক করে নিতে হয়, তার পর টিপ মারলে ঠিক লেগে যাবে।'

আমেরিকায় যাওয়ার আগে যখন স্বামীজী মাদ্রাজে গিয়েছিলেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা কিডি (সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র) বলেছিলেন। এক দিন শিকারে গিয়ে স্বামীজী একটা হরিণের উপর টিপ করলেন, তার পর ঘোড়াটা টানলেন। গুলিটা ঠিক হরিণের গায়ে গিয়ে লাগল। কিডি উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'Swamiji is a dead-shot, Swamiji is a dead-shot'— স্বামীজী সাংঘাতিক টিপ মারতে পারেন। কথাটা খুব সত্যি। স্বামীজী অনেক সময় বলতেন, 'মনটা একাগ্র করে যে-কাজে লাগাবে, সেই কাজেই জিতবে।'

তখন লাটিমে লাটিমে গচ্চা মারা খেলা হত। কিন্তু ওটা নিতান্ত নিস্তেজ খেলা। বীরেশ্বর একটু-আধটু লাটিম খেলত কিন্তু এই খেলাটি বিশেষ পছন্দ করত না। কারণ, বোধ হয় লাটিম খেলায় মস্তিষ্কের কোনও চালনা হয় না, মস্তিষ্কটা জড় মেরে যায়।

অন্যান্য ছেলেদের মতো ঘুড়ি ওড়াতে বীরেশ্বরের তত উৎসাহ ছিল না। তবে ছোটো ছেলে, সকলের সঙ্গে মিশে তেতলার ছাদে বিকালবেলায় যেত। ঘুড়ি যখন খুব উপরে উঠত তখন কখনও কখনও অন্য ছেলেরা তার হাতে কিছু সময়ের জন্য দিত। সেটা দু-এক মিনিট ধরে থাকত। তার কপাটি, মার্বেল খেলাতে যেমন উৎসাহ ছিল, ঘুড়ি ওড়ানোতে তত উৎসাহ ছিল না।

এখন যাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন তাকে ব্যাটবল, চলিত কথায় 'ব্যাটম্বল' বলত। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে ব্যাটম্বল বেশ ভালো রকম খেলতে পারত। পাড়ার অনেক ছেলে বাইরের উঠানে জড়ো হত এবং বিকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলত। বীরেশ্বর এই খেলার সর্দার বা মোড়ল হয়ে সব হুকুম-হাকাম করত। এই জন্য বীরেশ্বর বা বিলে যতক্ষণ না খেলায় নামত, খেলাটা তেমন জমত না।

বুড়ো কোচোয়ান বালক বীরেশ্বরকে আস্তাবলে তার খাটিয়ায় বসিয়ে একটি শুকনো থেলো হুঁকা হাতে নিয়ে ঘোড়ার গল্প করত, 'দেখ বিলুবাবু, তোমায় ঘোড়ায় বসিয়ে এমন ঘোড়া চালিয়ে দেব যে, ঘোড়া ওই ছাতের উপর গিয়ে উঠবে, আর ঘোড়া হাওয়া দিয়ে চলে যাবে, আর টগ্‌বগ্‌ শব্দ করে যাবে। আর পক্ষীরাজ ঘোড়া যে আছে, তাতে চড়লে মেঘের উপর পর্যন্ত যাওয়া যাবে।'

নিষ্ক্রিয়তার বিরোধী নরেন্দ্রনাথ সব সময় সক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বিকেলে তার বাবার কিনে দেওয়া টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াত। অবসর বিনোদনের জন্য অশ্বারোহন তার অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল এবং ক্রমে সে এতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

পক্ষীরাজ না জুটুক, কয়েক বছরের মধ্যে একটা সাদা কর্মী-ঘোড়া তার বরাতে জুটে গেল। সেটাকে নিয়ে বালক নরেন্দ্র হৈ-হৈ করে কলকাতার রাস্তায় ছুটছে, সেই দেবভোগ্য দৃশ্যের উল্লেখ সবিশেষ না পাওয়া গেলেও (কিছু উল্লেখ মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় পাওয়া যায়) ওই বালক যখন বিশ্ববীর, তাঁর তখনকার সওয়ারি-ছবির কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় এক বিখ্যাত বাঙালির কাছ থেকে, তাঁর নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৮৯৭ সালের মে কি জুন মাস। অশ্বিনীকুমার আলমোড়ায় গিয়েছেন। এক দিন পাচকের মুখে শুনলেন, এক অদ্ভুত বাঙালি সাধু এসেছে, যে 'ইংরেজী বলে, ঘোড়ায় চড়ে এবং রাজার মতো ঘুরে বেড়ায়।' সাধুটি অবশ্য

কে, তা অশ্বিনীকুমার তখনই বুঝলেন এবং 'সৈনিক সন্ন্যাসী'র সন্ধানে পথে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। —স্বামী বিবেকানন্দ? কে তিনি? চিনি না তো? —ওহো! ঘোড়াসওয়ার সাধু? ওই তো তিনি— ঘোড়ার পিঠে!

অশ্বিনীকুমার দেখলেন— দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উড্ডীন গৈরিক। একটি বাড়ির গেটে ঘোড়া থামল, এই ইউরোপীয় গেট খুলে ঘোড়ার মুখ ধরে বাড়ির সামনে নিয়ে গেল, সন্ন্যাসী নেমে পড়লেন।

কাব্যের মতো শোনাচ্ছে কথাগুলো? কিন্তু একশোভাগ বাস্তব। অনেকগুলো চিঠিতে স্বামীজী পরিণত বয়সে তাঁর ঘোড়ায় চড়ার উল্লেখ করেছেন।

'তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মতো পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে, অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় চড়াই-উৎরাই করতে দেখতে, তাহলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে।'

'এখানে আমার নিত্যকর্ম— যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড়ে ওঠা, বহু দূর পর্যন্ত ঘোড়ার দৌড়ান।... এর পর যখন দেখা যাবে, দেখবে আমার চেহারা কুস্তিগীরের মতো।'

'ঘোড়া চড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে— কুড়ি ত্রিশ মাইল একনাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছুমাত্র বেদনা বা exhaustion হয় না।'

আলমোড়ার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাঁচার আনন্দ স্বামীজী কী ভাবে ফিরে পেয়েছেন, তার কথা ডাক্তারকে জানিয়েছেন, 'আমি সকাল-বিকাল ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি, এবং তার ফলে সত্যই আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলায় যখন কুস্তি করতাম, তারপর এমনটি আর কখনো বোধ করিনি। সত্যই মনে হচ্ছিল, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। আগে শরীরের প্রতি ক্রিয়াতে শক্তির পরিচয় পেতাম, প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়ায় আনন্দ দিত।...শক্তির পরীক্ষায় জি জি (জি জি নরসিংহাচারিয়ার) এবং নিরঞ্জন উভয়কেই মুহূর্তে ভূমিসাৎ করতে পারতাম।'

সুতরাং স্বামীজী ঘোড়ায় চড়বেনই, শুধু নিজে চড়বেন তাই নয়, যারা চড়তে ভয় পায় তাদের জোর করে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে চাবকে দেবেন ঘোড়াটিকে। যখন দেখবেন, কাতর আরোহীকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, তখন ফেটে পড়বেন অট্টহাস্যে। স্বামী বিরজানন্দের এমন দুর্গতি তিনি ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের দুর্গতি আর স্বামীজীর স্ফূর্তি, তার পরেই তৃপ্তিময় চিন্তা— আমার শিষ্যেরা বীর হবে।

ঘোড়ায় চড়া প্রসঙ্গেই স্বামীজী তাঁর একটি পূর্বতন খোলা মাঠের বীরত্বকাহিনির উল্লেখ করেছিলেন এক পত্রে, 'আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ি ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাইসাইকেলের চেয়ে এটা নিশ্চয় বেশি উন্মাদনাপূর্ণ! অবশ্য উইম্বলডনে আমার সে-অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই, মাইলের পর মাইল উৎরাই, রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া— খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খাদ।'

হিমালয়ের ভয়াবহ পথে ঘোড়া ছোটানো হয়তো উইম্বলডনের সাইকেল চড়ার অভিজ্ঞতার চেয়ে 'কিছু বেশি উন্মাদনাপূর্ণ', কিন্তু সাইকেল ব্যাপারটাও 'খুব কম উন্মাদনাপূর্ণ' নিশ্চয় ছিল না! স্বামীজী এক সাইকেল-অ্যাডভেঞ্চারে বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ইংল্যান্ডেই ছিলেন।

'একদিন স্বামীজী খুব প্রফুল্ল; বেলা ১২টার সময় বলিলেন, 'চল, সকলে মিলে সুমুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি।' মিস মুলারের আর্থার নামে একটা মালী ছিল। সে মিস মুলারে গ্রীন হাউস থেকে একটা বাইক মাঠে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। স্বামীজী সারদানন্দ-স্বামীজীকে বলিলেন, 'তুই চড়, শেখ না, দিনকতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে।' সারদানন্দ-স্বামী অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাতিরে বাইকের ওপর একবার চড়িয়া বসিলেন। ...সারদানন্দ-স্বামী একটু পরে নামিয়া পড়িলেন। স্বামীজী আবার বাইকে উঠিলেন। সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদু স্বরে বাংলায় গান গাইতে লাগিলেন— 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।/ ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,/ মধুর বহিবে সমীর ভেসে যাব রঙ্গে'।'

এক বার স্বামীজী লন্ডন থেকে যাত্রা করে জেনেভা নগরীতে উপনীত হলেন। একটি বেলুন দেখে তিনি তাতে ওঠার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। সূর্যাস্তের আগে বেলুন উড়বে না শুনে তিনি বালকের ন্যায় অধীর ভাবে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এখনও কি সময় হয়নি? মিসেস সেভিয়ার আকাশভ্রমণটি নিরাপদ নয় মনে করে আপত্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। স্বামীজী তাঁর কোনও প্রকার আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না, বরং তাঁকে পর্যন্ত বেলুনে উঠতে বাধ্য করলেন। সে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। ওপর থেকে সূর্যাস্তের মনোহর শোভা দর্শন করে স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বেলুন থেকে অবতরণ করে তাঁরা সকলে ফটো তুলে প্রফুল্লচিত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করলেন। স্বামীজী অবশ্যই দাবি করতে পারেন, তিনিই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি যোগবলে নয়, বেলুন-বলে আকাশবিহার করেছিলেন।

আলঙ্কারিক সমুদ্রসন্তরণের কথা বাদ দিয়ে বাস্তব সমুদ্রস্নানের কথায় দেখা যায়, কোরা স্টকহ্যাম স্বামীজীর জন্য একটি স্নানের পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং তিনি ঠিক হাঁসের ন্যায় জলে নেমে স্নান করে মজা করেছেন, যে-ব্যাপারটা জলকাদার জীবদের পক্ষেও পরম উপভোগ্য ঠেকবে।

দরিয়ায় ডোবা চমৎকার ব্যাপার, দরিয়ায় ভাসাই বা কী কম? স্বামীজী যে রকম অনুরাগের সঙ্গে ইয়াট নৌকার বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি ওই সাধের তরণিতে পাল তোলেননি, বিশ্বাস হয় না। লিখেছেন, 'এ দেশে গরমীর দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়— আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোটো ছোটো জাহাজ ছেলে-বুড়ো যার পয়সা আছে তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘুরে আসে, খায়-দায় নাচে-কোঁদে— গান-বাজনা তো দিবারাত্র।'

নিশ্চিত থাকা যায়, স্বামীজী অবশ্যই নৌকা চড়তেন। শুধু তাই নয়, ডুবতেনও।

একবার নৌকাডুবির পর তিনি বীরের ন্যায় ভগিনী ইসাবেলা ম্যাককিন্ডলিকে লিখেছেন, 'কিছু চমৎকার নৌকাভ্রমণ হয়েছে; এক সন্ধ্যায় নৌকা উল্টে জামাকাপড়-সুদ্ধ ডুব।'

নৌ-প্রসঙ্গ এখনও অসমাপ্ত। জাতীয় তরণির কর্ণধার যাঁকে হতে হবে, তাঁর পক্ষে নৌকাডুবির কাঁচা গল্পে থেমে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, এক বৎসর পরে এক পত্রে লিখছেন, 'পার্সিতে রীতিমত নৌকা চালানো গেছে। নৌ-চালনের দু-চারটে জিনিস শিখে নিয়েছি।'

বিবেকানন্দ প্রায় সব ধরনের খেলাই খেলেছেন, এমনকি গলফ্ পর্যন্ত— হ্যাঁ, নিতান্ত বিদেশি গলফ্ও। 'এখানে গলফ্ খেলার চেষ্টা করেছি। খেলাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হল না— শুধু কিছু অভ্যাস চাই।' —১৮৯৯-এর নভেম্বর মাসে স্বামীজী তাঁর শেষ আমেরিকা-ভ্রমণের সময়ে লিখেছিলেন। চিঠিটা লেখেন, 'স্নেহের বোন' মেরি হেলকে, যে মেরি হেলকে বা হেলপরিবারকে বিবেকানন্দের বহু খেয়ালের ঝঞ্ঝাট অবিরত পোহাতে হত। যেমন, বরফের ওপর স্কেটিং দেখে এই সদানন্দময় বালকের বাসনা হল স্কেটিং শিখবেন, কিন্তু কিছু প্যাকটিস তো চাই। আর হেলদের দামি কার্পেট-পাতা সদরঘরের চেয়ে ভাল অনুশীলনক্ষেত্র কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং, কার্পেট ছিঁড়ে আসবারপত্র ভেঙে বিবেকানন্দ স্কেটিং অভ্যাস করতে থাকেন।

সে বার স্বামীজী মি. লেগেটের বাড়িতে আছেন। লেগেট ধনী ব্যক্তি। তাঁর বাড়িতে একটি মাঝারি আকারের গলফ্ কোর্স আছে। স্বামীজী সেখানে এক দিন বেড়াচ্ছেন— দেখলেন যে বালক হলিস্টার (মিসেস লেগেটের প্রথম পক্ষের পুত্র) একটি লাঠি দিয়ে একটি বলকে মেরে কোথায় যেন পাঠানোর চেষ্টা করছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হল, করছ কী?' হল বলল, 'গলফ্ খেলছি।'

হলিস্টার অতঃপর স্বামীজীকে গলফ্ খেলা ব্যাপারটি সম্বন্ধে যারপরনাই জ্ঞানদান করল। খেলাটি খুব সহজ নয়। ভালো খেলোয়াড়ও তিন-চার মারের কমে সাধারণত গর্তে বল ফেলতে পারে না।

স্বামীজী— বাজি ধরবে? আমি এক মারে গর্তে বল ফেলব।

হল— এক্ষুণি! (হলের বিশেষ সম্পদ একটি হাফ ক্রাউন, সেটি পকেট থেকে বের করে) এই বাজি রাখলাম।

স্বামীজী— আমি বলেছি, ওই গর্তে এক মারে বলটা ফেলব।

মি. লিগেট— (পকেট থেকে দশ ডলার বের করে) তা হলে আমিও বাজি রাখছি।

স্বামীজী— বাঃ! আপনার দশ ডলার এবং হলের হাফ ক্রাউন আমারই হচ্ছে।

হল গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গর্তটি দেখাল। স্বামীজী বললেন, 'সরে যাও'। হল সরে গেল। এবং স্বামীজী স্টিক দোলালেন, বলে আঘাত করলেন— বলটি তীব্র বেগে অর্ধচন্দ্রাকারে শূন্য দিয়ে ছুটে চলল এবং ঠিক গর্তে গিয়ে পড়ল!!!

'হায় হায়' করে উঠল হল। হাউমাউ করে বলল, 'আমার হাফ ক্রাউন! আমার হাফ ক্রাউন!'

হতভম্ব মি. লেগেট বিড় বিড় করে বললেন, 'ভারতীয় যোগীর অলৌকিক খেলা!'

স্বামীজী হেসে বললেন, 'আরে, না, না! যৌগিক শক্তি আমার এসব তুচ্ছ ব্যাপারে খরচ করি না। আমি কী করেছি শুনবেন! আমি আমার মনকে বললাম, দশ ডলার এবং ঐ হাফ ক্রাউনটা আমার চাই— আমি ওটা নেব। আমার ইচ্ছা আমার মন থেকে পেশিতে গেল— তারপর হাত চালালাম এবং যা চাইছিলাম তা পেয়ে গেলাম।'

মহেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত অন্য একটি ঘটনা '১৮৮৪ বা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ, গ্রীষ্মকাল। আমাদের পড়িবার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল রাত্রে পাশাপাশি শুইয়া আছে। খানিক রাত্রে দুইজনের ভিতর তর্ক উঠিল। রাখাল বলিল যে, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিমন্যাসটিক ছাড়িয়া দিয়াছে, সে এখন Peacock march বা ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে পারে না। এই তর্ক উঠিলে এক টাকা বাজি ধরা হইল। অর্ধেক রাত্রে দুইজন উঠিয়া সম্মুখের দালানে জিমন্যাস্টিক শুরু করিল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মারিয়া দালানটাতে ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে লাগিল আর রাখাল সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। পাশের ঘরে যাহারা শুইয়াছিল তাহাদের ঘুম ভাঙিলে বকাবকি শুরু করিল— কী উৎপেতে ছেলে, আদ্দেক রাতে উঠে জিমন্যাসটিক শুরু করেছে! ছোঁড়াদুটো মাথাপাগল, একটু বিবেচনা নেই যে, লোক ঘুমুচ্ছে।'

আর একটি ঘটনা— মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতি অনুযায়ী— লেগেট-ভবনে এক দিন দুপুরবেলা মিস ম্যাকলাউড পুরুষদের পার্লারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা আধ-ভেজানো দেখে ঠেলে খুললেন, আর তখনই আবছা আলোয় দেখলেন অদ্ভুত দৃশ্য— মি. লেগেট শূন্যে ভাসছেন! পরমুহূর্তেই ধপ্ করে একটি আওয়াজ— সেই সঙ্গে 'উঃহুহু' শব্দ! অতঃর স্বামীজীর কড়া গলার স্বর 'দরজায় টোকা না দিয়ে কী আক্কেলে ঢুকলে?'

দুপুরবেলা নির্জন বাড়িতে স্বামীজী মি. লেগেটকে জিমন্যাসটিকের খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করছিলেন, শুধু তাই নয়— ঊর্ধ্বপদের ওপরে মি. লেগেটকে চাপিয়েছিলেন! ঠিক এই সময়ে ঘটনাস্থলে মিস ম্যাকলাউডের প্রবেশ। মহিলার সামনে ওই অবস্থাটা বিশেষত প্যান্ট যখন হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে, নিতান্তই বেয়াদবি। স্বামীজী কী করেন, মি. লেগেটকে পা থেকে ছুঁড়ে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে মিস ম্যাকলাউডকে তিরস্কার করলেন। তার পর ভূপতিত প্রৌঢ় মি. লেগেটের দিকে তাকিয়ে মিস ম্যাকলাউডের উদ্দেশে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'এখন এস, দেখা যাক, মি. লেগেটের কী অবশিষ্ট আছে?'

স্বামীজী দ্বিতীয় এবং শেষ বারের মতো পাশ্চাত্যে এসেছেন। আমেরিকায় এক দিন একটি নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল কয়েকটি যুবক সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে জলে ভেসে-থাকা কয়েকটি ডিমের খোলার দিকে গুলি ছুঁড়ছে। বার বার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক বারও পারছে না। দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে স্বামীজীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। যুবকদের একজনের তা চোখে পড়ল। স্বামীজীকে চ্যালেঞ্জ করে সে বলল, 'কাজটা যতটা সহজ দেখাচ্ছে ততটা সহজ নয়। দেখি তো আপনি কেমন পারেন!' স্বামীজী

দ্বিরুক্তি না করে তাদের কাছ থেকে একটা বন্দুক নিলেন, তার পর পরপর বারোটি ডিমের খোলা গুলিবিদ্ধ করলেন। যুবকরা অবাক হয়ে গেল। তারা ভাবল, ইনি নিশ্চয় বহু দিন ধরে বন্দুক ছুঁড়ছেন। স্বামীজী তাদের বললেন যে, তিনি আগে বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করেননি। তিনি যে লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন, তার রহস্য হচ্ছে 'মনঃসংযম'।

বাহ্য জাগতিক খেলাগুলি তো স্বামীজীর জীবনে প্রতীকমাত্র। উপনিবেশবাদের কলঙ্কময় ও অবক্ষয়প্রাপ্ত ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের 'অভীঃ' মন্ত্রের এই উদ্‌গাতা তৎকালীন ধর্মধ্বজীদের কাপুরুষতা ও হীনমন্যতাকে চিরতরে বিলুপ্তির জন্য বৈপ্লবিক এক আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।... তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝিবে।'

স্যার হিরাম ম্যাক্সিম— সেকালের একজন প্রতিভাদীপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং আবিষ্কর্তা। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের স্মৃতি রোমন্থন প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'তারপর যখন বিবা কানন্দ বললেন, তখন তাঁরা বুঝলেন যে এবার একজন নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়তে হবে।... এখানে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিত্রাত মানুষের নিদর্শন— যিনি সারা দেশের তাবৎ পুরোহিত আর যাজকদের চেয়ে দর্শন ও ধর্ম অনেক ভালো ভাবে জানেন। এই প্রথম তাদের কাছে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হলো ধর্ম। তার মধ্যে যে এত কিছু আছে, এ তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, আর এ নিয়ে বিতর্কও অসম্ভব। বেড়াল যেমন করে ইঁদুর (শিকার) নিয়ে খেলা করে, বিবা কানন্দ সেইভাবে মানুষ নিয়ে খেলা করলেন। তারা তো বিহ্বল— তারা আর কী করতে পারে!' কী আর করতে পারে' মানে, কিছুই করতে পারে না। কারণ কবি লিখেছেন—

'ঠাকুরের দুরন্ত তনয়!
তুমি যে চঞ্চল বড় বজ্র লয়ে খেলা কর।'

বিবেকানন্দের মতো অতিপ্রাকৃত প্রফেটদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কাজী নজরুল ইসমানের সুবিখ্যাত সঙ্গীতের কলি-কয়টি স্মরণে আসে—

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রবল সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে।।...
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন মনে— নিরজনে প্রভু নিরজনে।'

স্বামীজী তাঁর প্রাণপ্রিয় সখা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মান-অভিমানের খেলাও কম খেলেননি। তাঁরই রচিত দু-একটি পঙ্‌ক্তি—

'ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা' পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।'

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে খেলাধূলা জীবনযুদ্ধের প্রতীকমাত্র। প্রিয় জো-কে লিখেছেন 'লড়াইয়ে হারজিত দুই-ই হল— এখন পুঁটলি-পোটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নাইয়া'— হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।' কবিতায়ও লিখেছেন, 'খেলা মোর হল আজি শেষ, শৃঙ্খল ভাঙিয়া দাও, / মুক্ত আজি কর মা আমারে।' —এই প্রার্থনা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি স্বামী বিবেকানন্দের নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানবতার পক্ষে তাঁর এই আর্তি। চির পরিত্রাতা, চিরজাগ্রত বিবেক বিবেকানন্দের 'খেলা' সাঙ্গ হওয়ার নয়। জীবনসংগ্রামরূপ খেলায় মানুষকে অবিরত তিনি উদ্বুদ্ধ করে যাবেন— যত দিন না সে জানতে পারে যে, সে এবং ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

> The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Teach men of the strength that is already within them.
>
> — Swami Vivekananda

সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে স্বামীজীর প্রভাব

চিত্রা বসু

সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান সৈনিক তিনি, বিদেশে ও ভারত সীমান্তের রণাঙ্গনে যাঁর যুদ্ধ ও আত্মত্যাগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তরান্বিত করেছিল, দেশবাসী শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় যাঁর নাম দিয়েছিল নেতাজী, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও চিন্তাধারায় কতখানি প্রভরান্বিত হয়েছিলেন তা স্মরণ করা এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ, ভারত ও বাংলার কয়েকজন মানীষী তাঁর হোতা হলেও বিবেকানন্দ সর্বসাধারণের মধ্যে জাগরণের সর্বাঙ্গীন রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বাংলা তথা ভারতের মানুষের শিরায় শিরায় এনে দিয়েছিলেন নবজন্মের উন্মাদনা, বিপ্লবের মন্ত্র। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহামন্ত্র, আলোড়নকারী ভাষণ ও রচনার মধ্যে পেলেন সংগ্রামী মহামন্ত্র, দেশমাতৃকার পূজার নির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সন্ধান দিলেন জীবনসত্যের, নরেন্দ্রনাথ গুরুর পতাকা নিয়ে ক্লান্তিহীন ভ্রমণ করলেন ভারতের প্রতিটি মানুষের কল্যাণার্থে। সুভাষচন্দ্র সন্ধান পেলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের গ্রন্থনার মধ্যে জীবনসত্যের। আজীবন সেই সত্য বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন, সেই সত্যকে ধ্রুবতারা করে দুর্গম পথ হেঁটেছেন— ভয় ভীষণ সেই পথ।

সুভাষের জন্মের আগে স্বামীজীর পাশ্চাত্যে বিশ্বধর্মসভায় সাড়া জাগানো বক্তৃতা এবং দেশেও ফিরে এসেছেন। কলম্বোর ফ্লোরাল হলে বিস্ফোরক বক্তৃতা— দেশের মানুষের কাছে বললেন— চাই প্রবল দেশ প্রেম, বেপরোয়া ত্যাগ, পরেই মাদ্রাজে, ঘোষণা করলেন 'আমার সমরনীতি'— দেশপ্রেমিক চাই। সমস্ত জগৎ তরবারি হাতে দাঁড়ালেও সত্যের জন্য ভয়হীন সম্মুখ হওয়া। তার পরেই বললেন— আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতজননী দেশবাসীর উপাস্য দেবতা হোক্। সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর এই উদ্দীপক বাণীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পরিচিত হলেন— তাঁর যাত্রা শুরু হোল স্বামীজীকে হৃদয়ে ধারণ করে।

সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা জানকীনাথ বসু। মাতা প্রভাবতী দেবী। তাঁর জন্ম উড়িষ্যার কটক শহরে, যেখানে পিতা ছিলেন স্বনামধন্য আইনজীবি, ভ্রাতা অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু সুদক্ষ আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ। সুভাষ বসুর ছাত্রজীবন শুরু কটক শহরে, কৃতী ছাত্র, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি, দর্শনে অনার্স নিয়ে। সেই ছাত্রজীবনে 'ওটেন' নামের এক ইংরাজ অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক ভাবে বহিস্কৃত হন। পরে স্কটিশচার্জ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ইংল্যান্ডে যাত্রা, সেখানে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার ও কেমব্রিজে টাইপস্ লাভ। আইসিএস পদগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ও ১৯২১ সালে ভারতে ফিরে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নিকট রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। ক্রমে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি, কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার ও পরে মেয়র। যুব কংগ্রেসে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠনে বৃহৎ ভূমিকা নেন। বিনা বিচারে কারাবাস, পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে মুক্তি। ইতিমধ্যে নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপ, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের উত্থাপক, সাইমন কমিশনের বিরোধিতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক, ত্রিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত। দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ, তবে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন প্রচারের মাধ্যমে। কারারুদ্ধও হন। ১৯৪১ সালে ভারত ত্যাগ করে জার্মানিতে প্রস্থান। পরে পূর্ব এশিয়ায় তাঁর আজাদহিন্দ সৈন্যদল গঠন ও তার সর্বাধিনায়ক হন। ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অকুতোভয় তিনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রণাঙ্গনে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন, জাপান সেই সময় আত্মসমর্পণ করে মিত্র শক্তির কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয় ও আত্মসমর্পন করতে হয়। নেতাজি অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান ও বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ প্রচার হয়। যদিও এই সংবাদ এখনও সংশয়পূর্ণ।

সুভাষচন্দ্র বসুর ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবনের সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিপিবদ্ধ হল। কিন্তু এই জীবন নির্মিত ও অনুস্রৃত হয়েছিল কোন আদর্শের দৃষ্টান্তে? তার সন্ধান অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর অভিন্ন হৃদয় বাল্যবন্ধু, অরবিন্দু শিষ্য দিলীপকুমার রায়— কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র, সাহিত্যিক, কবি ও সর্বোপরি বিরাট সঙ্গীতজ্ঞ— তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে বন্ধুর চরিত্রের নানা দিক আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। তিনি স্মরণ করেছেন 'সুভাষের পবিত্র চরিত্রের সন্ন্যাসী প্রভা। অন্তরাত্মার অধ্যাত্মজ্যোতি, শুধুমাত্র মহৎ দেশভক্ত হয়। বিবেকানন্দের মতো ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে মনে করত। স্বামীজীর song of sannyasin থেকে ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত একটি চরণ 'Have thou no home, what home can hold the friend?' দেশকে ভালোবেসে প্রেরণা দিয়েছিল এই অভীঃমন্ত্র জপের, সেই জন্যই ঘরছাড়া সর্বহারা হবার দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিল দেশের জন্য।'

সুভাষচন্দ্র ছোটোবেলা থেকে অন্তর্মুখী, বালক তার মা'কে লেখা চিঠির মধ্যে তার সুগভীর চিন্তা ব্যক্ত করতেন। ইতিমধ্যে বারো বছর বয়সে স্কুলে হেডমাস্টার বেণীমাধব দাস মহাশয়ের সান্নিধ্য। আদর্শপুরুষ এই মানুষটি তাঁর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু হেডমাস্টার মহাশয় কিছু দিন পরই বদলী হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্কুলজীবন হয়ে ওঠে নিরানন্দময়। দৈবক্রমে এক দিন তাঁর এক আত্মীয় বাড়িতে বিবেকানন্দের রচনাবলীর সন্ধান পেলেন— তাঁর নিজের লেখায় 'একদিন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটি জিনিষ পেলাম যা এই সংকটকালে আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। আমার এক আত্মীয় শহরে নতুন এসেছিলেন, এবং আমাকে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতে হত। তাঁর বইগুলির ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকাননেদ্র রচনাবলী।' তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দ এনে দিলেন বিপ্লব, যে চিন্তা ভাবনায় তিনি জর্জ্জরিত ছিলেন বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথেই তার উত্তর খুঁজে পেলেন। বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণপ্রেম এল। আর এ-ও উপলব্ধি করলেন— আত্মশক্তি উদ্বোধনের জন্য আত্মশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য প্রয়োজন।

শুরু হল ব্রহ্মচর্য সাধনা সঙ্গে লোকসেবার ব্রত, কারণ বিবেকানন্দ বলেছেন দরিদ্রের সেবাই নারায়ণ সেবা। কলেজে পড়ার সময় তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রচণ্ড আধ্যাত্মিকভাব, দেশের নানান জায়গা ঘুরে এলেন বারাণসীতে, সেখানে দেখা হল স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে, মহাযোগী বললেন, 'তোমাকে দেশের কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বন্ধু দিলীপ রায়কে বলেছিলেন, 'আমিও পেয়েছি তাঁর কৃপার আভাস।' আরও বলেছেন এর পরই তিনি বিবেকানন্দের দেশপ্রেমাত্মক উক্তির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর আত্মজীবনী 'ভারতপথিক' an Indian Pilgrim-এ তাঁর জীবন গঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা সবিস্তারে লেখেন। 'রামকৃষ্ণের সবধর্ম সমন্বয় ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি, এই সকলমত সহিষ্ণুতাই ভারতের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের জাতীয়তাবোধ এনেছে। বিবেকানন্দ এসেছিলেন বিশ্বের পটভূমিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়, যুগ প্রয়োজনে তিনি শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের মুক্তির প্রধান বার্তাবহ।' সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম মননের রূপটি দেখেছিলেন গভীর ভাবে এবং মান্দালয় জেলে আত্মসমীক্ষার সুযোগ পান। বন্ধু দিলীপকুমারকে কথামৃত ও বিবেকানন্দ রচনাবলী পাঠ করতে বলেন। কারণ ভারতবাসীর কাছে স্বামীজীর বাণী এনে দেয় আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মজাগরণ এবং নারীকেও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন তারই বার্তা স্বামীজীর বাণী রূপায়ণের জন্য তিনিও রেখেছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদ— সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপর মূলভিত্তি করে দাঁড়াক আর চাই সর্বত্যাগী, আত্মবলিদানে উৎসুক যুবকের দল। বিবেকানন্দের পথেই তিনি রেখেছিলেন সমাজতন্ত্রবাদ। কার্লমার্কসের পথে নয়।

সুভাষচন্দ্রের দেশ প্রেমের কথা বলতে গেলে আমরা বিবেকানন্দকেই অনুসরণ

করব। নিবেদিতার 'Master as I saw him' তাঁর প্রিয় বই ছিল। নিবেদিতা লিখেছেন— 'I saw him almost daily the thought of India was to him little the air like he breathed'। নিবেদিতা বলেছেন তাঁর গুরুর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন এক অস্থির দহনজ্বালা। দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস। স্বামীজীর আদর্শের এই মন্ত্রে সুভাষচন্দ্র দেশকে ভালোবেসেছিলেন এবং তিল তিল করে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে দেশের স্বাধীনতা লাভে এবং দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায়। দেশকে স্বাধীন করার সংকল্প নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন— তৈরি করলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী ও ঝাঁসিরাণী বাহিনী। তিনি ভারতের মানুষের কাছে রক্ত ভিক্ষা চাইলেন— 'Give me blood, I shall give you freedom'। ১৯৪৫ সালের ১৭ অগস্ট, ঘোষণা করলেন আমরা স্বাধীনতার সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছি, পৃথিবীর কোনও শক্তি ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারবে না। আমরা জানি দুঃসাহসিক ছিল তাঁর যুদ্ধকালীন যাত্রা। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ভূমধ্যসাগরের সাবমেরিনে যাত্রা। দিলীপ রায় বন্ধুর স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'সে ছিল অকুতোভয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল গর্জনের মধ্যে— সে ছিল শক্তিসাধক— কৈশোরেও গঙ্গাজলে নেমে আবৃত্তি করত স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother

'নির্ভয়ে যে বরি যন্ত্রণায়
প্রেমে করে মৃত্যু আলিঙ্গন
নাচে মহাকাল নৃত্য সাথে
তারে করে জননী বরণ।'

বন্ধু দিলীপ রায় তাঁর স্মৃতিচারণে সুভাষের আত্মজীবনের কিছু কথা আমাদের জানিয়েছেন— 'স্বামীজীর বাণীর আলোয় সুভাষকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলাম। এর পরে স্বামীজীর নানা বাণী ওর মুখে শুনেছি তখনই আমার মনে হয়েছে এই একটি কথা ফিরে ফিরে, স্বামীজীর উদ্দীপনাই ওকে দীক্ষা দিয়েছে। মনে হয়েছে স্বামীজীর সমানধর্মী যদি এ যুগে কেউ জন্মে থাকে তাহলে সে সুভাষ। সুভাষ কুরুক্ষেত্রে না গিয়ে যদি ধর্মক্ষেত্রে যেত তাহলে সে হয়ে দাঁড়াত স্বামীজীর পতাকাবাহী।' সুভাষচন্দ্রের অন্তরজীবনের চিত্র তাঁর বাল্যবন্ধুর স্মৃতিচারণের পাতায় ধরা আছে।

সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল দক্ষিণেশ্বরে, যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাভূমি আর তাঁর সন্তান নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ জন্মলাভের পুণ্যক্ষেত্র, ছিল বেলুড়মঠ, স্বামীজীর হাতে গড়া মঠ। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন গভীর রাত্রে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে বসতেন। অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজি তাঁর কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে নিয়ে যান। সেখানেও প্রায়ই মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতেন। ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫ শত্রুকবলিত রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যেতে হয়, তার আগের রাত্রে চরম সংকট মুহূর্তে, যখন তাঁর আজীবনের সংগ্রাম ও স্বপ্ন রূপান্তরিত হবার আশা স্তিমিতপ্রায়। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মন্দিরে। পট্টবস্ত্র পরে বসেছিলেন তাঁর প্রাণ দেবতা যুগঋষি বিবেকানন্দের ছবির সম্মুখে ধ্যানে মগ্ন হয়ে। জীবন দেবতার প্রতি প্রণামের মধ্যে অর্পণ করলেন সেই আত্মনিবেদন যা স্বামীজী বলেছিলেন— নিবেদিতার 'Master as I saw him' উল্লিখিত 'To the Swami it is only natural to say in answer an enquirer— "Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazaralti, I would have washed His feet, not with my tears but with my hearts."

অন্তর্ধানের পূর্বমুহূর্তে তাই বিবেকানন্দ্রে পতাকাবাহী মানুষটি পরম ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে যাত্রা করলেন, অনির্দিষ্ট সংগ্রামময় পথে। তখনও মনের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার মহান উদ্দেশ্য। ভারতমাতার এই নির্ভীক সন্তান তাঁর দেশবাসীর কাছে আজও প্রণম্য হয়ে রইলেন, তিনি ছিলেন সর্ব অর্থে বিবেকানন্দের পতাকাবাহী, তাঁর প্রিয় ছিল স্বামীজীর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ কব ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি বিত্তমাঝে
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থসাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক পথ চলেছিলেন বিবেকানন্দকে সঙ্গী করে কারণ সেই মহান আত্মাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর কৈশোরে পড়া বিবেকানন্দের রচনাবলীতে— যেখানে লেখা আছে— 'আমি অনাহারে শীতে মরতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব অজ্ঞ অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ প্রয়াস দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। আর ছিল আগ্নেয় আশীর্বাদ। আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা।'

'উঠ— জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্ররিষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

‘বাণী ও রচনা’ থেকে গৃহীত

কলকাতায় অভিনন্দনের উত্তর

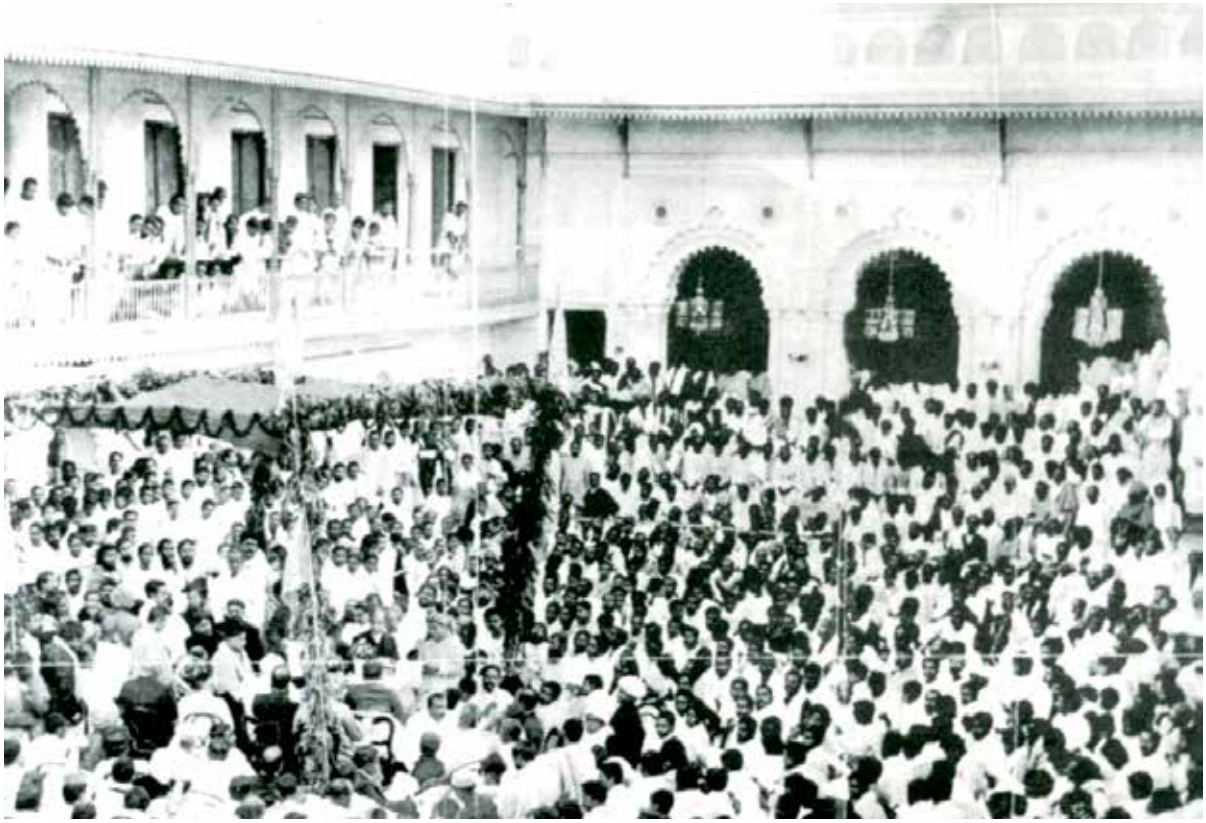

১৮৯৭ খ্রীঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাটীতে কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেন :

মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধে একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে— অতি দূরে পলাইয়া যায়; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ— পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমনকি সে নিজে যে সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’। হে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর (কলিকাতা তখন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল) অইধবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরল প্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে ‘ভাই’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ,

সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ' স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আমার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতে বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার মনে আসিল না।

হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ— অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই শিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম-মহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল— নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল— খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যতঃ ফল তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে অন্য কিছু হইবার উপায়ই ছিল না। অনেকেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই— আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, কাজেরও সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য— যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। কোন মার্কিনের সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বনধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণে কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য— ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁহারা যে অপূর্ব সহয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমার বহু বৎসর লাগিবে।

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলেই চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলান্টিকের অপর পারে সেই ইংরেজ জাতিকেও আমাকে সেরূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখনও ইংলন্ডে পদার্পণ করে নাই; এই সভামঞ্চে যে-সকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম— ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম— ঐ জাতির হৃদস্পন্দন কোথায়, ততই তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজ জাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। তাঁহাদের বিষয় ঠিক ঠিক জাতিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞাতপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের জানি না, তাঁহারাও আমাদের জানেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা— এমনকি চরিত্র-নীতি পর্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরেজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান— এখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতেছে, অমনি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, এ দেশ কোন ধর্ম থাকিতে পারে না নীতিও থাকিতে পারে না; তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই সত্য। ইওরোপের শীতপ্রধান জলবায়ুর জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সেখানে দারিদ্র্য ও পাপ একত্র অবস্থান করে— দেখা যায়; ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই —ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, যে তত বেশি সংপ্রকৃতি; কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বিদেশী প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার লোক অল্পই আছেন। এখানে— কেবল এখানেই এমন এক জাতির বাস, যাহাদের নিকট 'দারিদ্র্য' বলিতে 'পাপ' বুঝায় না; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হয়। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগকে পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি অতি ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার— সবগুলিরই অর্থ আছে, সবগুলিরই ভাল দিক আছে, কেবল তোমাগিগকে যত্নপূর্বক ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহার বহু শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও যেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারগুলি দেখিয়া উপহাস না করি, তাঁহারাও যেন আমাদের আচারগুলিকে

বিদ্রূপ না করেন।

আমি এই সভায় আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলন্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজ-জাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়— তাঁহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়— উহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ঐ জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অন্য কোন দেশে সেরূপ নহে। এই জাতির যেমন অপরিসীম কার্যকরী শক্তি, এই জাতির যেমন অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি বেশি। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীরে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা; ভাব কখনও না দেখানো— বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছেন। দেখিবেন, খুব কম ইংরেজ কখনও নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; পুরুষের কথা কেন, ইংরেজ নারীও কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে— এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাবধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাহার সহিত মেশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাহাকে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে ইংরেজ আপনার চিরবন্ধু— আপনার চিরদাস। এইজন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলন্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলন্ডে আমার প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে— গভীরতম সুরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনও অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত— সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র— সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ একনও সেই মহামানবকে জানিতে পারে নাই। আমার জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়া থাকি; এখন আমরা যে আকারে সেই-সকল জীবনী পাই, সেগুলিতে বহু শতাব্দী যাবৎ শিষ্য-প্রশিষ্যগণের পরিবর্তন-পরিবর্ধনরূপ লেখনী-চালনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া, কাটিয়া-ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কেন মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেই ভগবানে শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছে ঃ

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

— যখনই যখনই গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয়টি এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ একটি ধর্মের প্রবল বন্যা আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-পরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ— প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়তো কাহারও চোখে পড়ে নাই, যাহা কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ় শক্তিসম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই— সেটিই ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে এবং অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে বিপুল ও প্রবল হইয়া উহা মহাবন্যায় পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতিরোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই দেখিবে; যদি তোমাদের হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই উহা গ্রহণ করিবে; যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবেই উহার সন্ধান পাইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এরূপ কোন মহান আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমনকি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমনকি সামাজিক বা বাণিজ্যজগতের কোন আদর্শ-পুরুষ কখনও ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রবাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের

অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই— সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর— এমন একটি আদর্শই পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি— এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান আদর্শ-পুরুষকে স্থাপন করিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান আদর্শ-পুরুষকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাহা তোমাদের এখনই স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক— তোমরা যত মহাপুরুষ দেখিয়াছ, অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, তন্মধ্যে ইহার জীবন শুদ্ধতম। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যাদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখনও পাঠও কর নাই, দেখিবার আশা তো দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

কলকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগো কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ'— এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাগিদকে 'অভীঃ'— নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব; উঠ— জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমি এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম— আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমা-অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পার। উঠ, জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বুদ্ধিহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে— টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদগুলির মধ্যে ইতি মনোরম কঠোপনিষদ্‌পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছে ঃ এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দটি আইম মোদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধা জাগিবামাত্রই নচিকেতার মনে হইল— আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনই নহি; আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে-সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন; যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যম-সদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালিক নচিকেতা যমগৃহে তিনদিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে— ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধারই ফলে; তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও— যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টদ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন— সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সব শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই— এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক— এই আত্মবিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস-অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের জীবন প্রবেশ করিতেছে— সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

আমি তো এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, যাহা আমি কখনও কল্পনাও

করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি— তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত— এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী— 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভয় পাইও না, কারণ মানুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যত কিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি— আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।

> Neither seek nor avoid; take what comes. It is liberty to be affected by nothing. Do not merely endure; be unattached.
>
> — Swami Vivekananda

সংশয় থেকে বিশ্বাস ঃ নরেন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রঃ গার্গী দেবী

মানব ইতিহাসের মহান এক দিব্য মুহূর্ত— শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর নরেন্দ্রনাথ একে অন্যের অন্বেষণে এলেন এক নিগুঢ় মরমিয়া আকর্ষণে। বিশ্বাস সর্বস্ব সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর সংশয় সর্বস্ব, প্রমাণ সাপেক্ষ অধ্যাত্মবাদের যুক্তি মনীষা অথচ সত্য, শাশ্বত, চিরায়তের তৃষ্ণা হৃদয়ে নিয়ে পাশ্চাত্য আধুনিকতার আপাত প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ— ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী তেজসানন্দের কথায়, 'এ যেন দুটি বিপরীত মুখী ধ্যানস্রোতের পূর্ণ কুম্ভ মিলন— যুক্তিগ্রাহ্য পাশ্চাত্য যুদ্ধং দেহী, প্রত্যয়ভাগী প্রাচ্যের প্রতি।' এই দুই পরস্পর বিরোধী কিন্তু পরস্পর সম্পূরক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শের ভাবোন্মেষের পরিণতি নব্য হিন্দুধর্ম, যে ধর্মে সবাই উত্তীর্ণ, অনাগত ভবিষ্যতে কেউই পাপক্লিষ্ট নয়।

সব রকম সাধনার অনুসন্ধান, পরীক্ষায় সিদ্ধ ঠাকুর অমেয় পরমার্থ সম্পদ আহরণ করে ভবতারিণীর আদেশে ভাব মুখে আছেন কিন্তু প্রাণের বিশেষ দ্যোতনায় অধীর, কখন সে আসবে, যে নিয়ে যাবে তাঁর এই ভগবৎ প্রেমপ্রবাহ বিশ্বময় মানুষের মাঝে। তিনি এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারছেন, 'যত্র জীব তত্র শিব', বলছেন ধর্ম মানে 'হওয়া', 'যত মত তত পথ'। জীবের কল্যাণ সাধনে, ঈশ প্রেম সংবহনের জন্য 'চির উন্মদ প্রেমপাথার'-এর দুর্নিবার প্রেম আহ্বান— 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়রে—'।

অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের সতেরো বছরের তরুণ, অনন্য-সাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবান, বাইরে থেকে দেখতে বেপরোয়া, তর্ক-কুশলী, মেধাবী কিন্তু অন্তরে সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র হৃদয়, ধ্যান তন্ময় নরেন্দ্রনাথের, তরুণ মনকে এক বিতর্কিত প্রশ্ন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল— 'ভগবান কি আছেন?' অন্যে বুঝুক আর না বুঝুক, ভগবৎ অস্তিত্বের প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের সংশয়, যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের প্রাণের তন্ত্রীতে আকুল হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন একজন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আবার তাঁর হাত ধরে নিয়ে যাবে সেই আনন্দলোকে যেখানে সব প্রশ্নের সমাধান— 'ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়া'। দর্শন শাস্ত্রের গভীর থেকে গভীরে গিয়েও অন্তর থেকে ওঠা প্রশ্নের সদুত্তর পাননি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে কিন্তু নিজে চোখে ঈশ্বরকে দেখেছেন এমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না। অন্তর আকুল হয়ে উঠল, তার প্রশ্নের সোজাসুজি সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে। মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি— তবে কি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা কেউ নেই? 'ঈশ্বর নেই'— ভাবতেও প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা জেগে ওঠে। অনাদিকাল থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়ে আসছে— সেই পরমপুরুষকে অস্বীকার করতে প্রাণের ক্রন্দন অথচ নিজে চোখে না দেখে অবাঙ মনসগোচরম্ কারও অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেও মনে ওঠে সন্দেহের ধাক্কা। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সোজা

প্রশ্নের সোজা উত্তরদাতাকে— 'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?'

কলেজের অধ্যক্ষ হেষ্টিসাহেব ক্লাসে 'Words worth'-এর 'Excursion' কবিতা পড়াতে পড়াতে ভাবসমাধির প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসাবে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলেছিলেন। ১৮৮১ সালের শেষের দিকে সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ভাবময় ব্রহ্মসঙ্গীতের পূজার্ঘ্যের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। সুররসধারায় ভাবাপ্লুত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে আসার আন্তরিক নিমন্ত্রণ নিয়ে বাড়ি ফিরে, একমাত্র ঈশ্বর অবলম্বনকারী অপ্রকৃতিস্থ এক মানুষের সম্বন্ধে অস্বস্তিকর mind flash— এ যেন ছিল অনেকটা পূর্বাভাসের মতো— সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব গগনে রক্তিমাভা। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য দক্ষিণেশ্বরের সেই লীলাক্ষেত্র।

প্রেমের জোরে নামিয়ে আনা অখণ্ডলীন চৈতন্য পুরুষকে ঠাকুর প্রথম দর্শনেই চিনে উৎকণ্ঠিত রইলেন— কি দুর্লভ ধন এই নরেন। আড়ালে নিয়ে গিয়ে পূর্ব পরিচিতের মতো পরমস্নেহে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বললেন— 'এত দিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কী রকম অপেক্ষা করে রয়েছি তা কি একবার ভাবতে নেই?' পরক্ষণেই দেবতার সম্মানে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন, দু'হাত জোড় করে— 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নবরূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।' নরেন তো একেবারে নির্বাক স্তম্ভিত। হবারই কথা! এ যে একেবারে উন্মাদের কাছে আসা। নরেন তখন কী করে জানবে যে, সে নিজেও ঈশ-পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকাশিত এক যন্ত্র। যাই হোক অদ্ভুত পাগল যা ইচ্ছা তাই বলতে লাগল ভেবে চুপ করে থেকে চালচলন, কথাবার্তা সব লক্ষ্য করতে লাগলেন। অন্যদের সঙ্গে সদালাপ আর ভাবসমাধি দেখে তো উন্মাদের মতো কিছু মনে হয়ই নি বরং ভাবতে লাগলেন, উন্মাদ হলেও ঈশ্বরের জন্য এ রকম সত্য সত্যই সর্বস্বত্যাগী জগতে বিরল, মহাপবিত্র, এবং সে জন্যই মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা-পূজা ও সম্মান পাবার অধিকারী।

কলেজি যুবক তাঁর প্রশ্ন নিয়ে এলেন। তাঁর প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, জ্ঞান, মেধা, তর্কে-বিশ্বাস সবই চুরমার করে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন কোন চোখে ঈশ্বরকে দেখা যায় জানিস, প্রেমের চোখে। তোদেরকে যেমন দেখছি, তোদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি, এই ভাবে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু ও রকম করতে চায় কে? জাগতিক জ্ঞান, বৈধী কর্ম, পাণ্ডিত্য, কোনও কিছু দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। প্রবল বিশ্বাসে তিনি উপনিষদের তত্ত্বই প্রকাশ করলেন, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখে নরেনের মন একটু দোলায়িত হল। মনে হল সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডেকে যা প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তাই বলছেন। কিন্তু আগের আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাশ্চাত্য দার্শনিকের বইতে পড়া monomaniac-এর দৃষ্টান্ত মনে উঠল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গণ্য করতে তাঁর মন তখনই রাজি হল না। আমাদের এক মহাসৌভাগ্য যে স্বামীজী প্রথম দিনেই ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে মানেননি। তিনি সে দিন জানুন না-জানুন, সেই অর্ধোন্মাদের মাঝে অবতীর্ণ ভগবানকে আজ যে আমরা বিশেষ ভাবেই জানি, তা আমাদের নিজের সাধন বলে নয়, স্বামীজীর নিজ জীবনের অতন্ত্র সাধনা, জাগ্রত শাণিত বুদ্ধির পরীক্ষাগারে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল হিসাব। তবেই জগৎময় রামকৃষ্ণ হয়েছেন সত্য 'বস্তু' রূপে এত সহজলভ্য, স্বামীজীর কাছে তাই মানুষের অশেষ ঋণ।

প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে দ্বিতীয় বার নরেন্দ্রনাথ একা দক্ষিণেশ্বরে আসতেই সে দিনই ঠাকুর শাম্ভবী দীক্ষায় নরেনকে সব কিছু দিতে চেয়েছিলেন। এত জীবপ্রেম আকুতি আর তর সইছিল না। হঠাৎ ঠাকুর নরেনের গায়ে ডান পা রাখতে নরেনের এক অপূর্ব অনুভূতি হল। তিনি খোলা চোখে দেখতে লাগলেন, দৃশ্যমান সব কিছু কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাঁর 'আমিত্ব'ও সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে। ভয়ে নরেন্দ্র চিৎকার করে উঠলেন, 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে, আমার যে বাবা-মা আছেন।' অদ্ভুত পাগল ঐ কথা শুনে খল খল করে হেসে উঠে তাঁর হস্তস্পর্শে নরেন্দ্রকে পুনরায় 'স্বাভাবিক' অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন, মুহূর্তের এমন ঘটনায় নরেন্দ্র বিস্ময়ে অভীভূত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'এ কী করে সম্ভব হল?' লীলাপ্রসঙ্গকার বলছেন নরেনের নিজের মুখের কথা— 'ইচ্ছামাত্রেই যদি এই পুরুষ আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মনের দৃঢ় সংস্কারময় গঠন এরূপে ভাঙিয়া চুরিয়া কাদার তালের মতো করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কীরূপে?'

সংশয়বাদী নরেনের মনে ঠাকুরের সম্পর্কে রহস্যভেদ করতে না পারার জন্য প্রচণ্ড আঘাত উপস্থিত হল। ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিলেও যুক্তির পূজারী নরেন্দ্রনাথ ভালো করে পরীক্ষা না করে বা নিজে অনুভব না করে শুধু তিনি বলছেন বলেই বিশ্বাস করতে চাননি। স্বামীজীর দ্বারা নির্মম বৈজ্ঞানিক ভাবে ঠাকুর পরীক্ষিত হয়েছেন সানন্দে। জানতেন : বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ 'বিড়ে' নেবার অধিকার ছাড়বে না— তিনি নিজে যেমন সত্য ধর্মকে পরীক্ষা না করে কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বই নেননি। স্বামীজি ঠাকুরকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাজিয়ে না নিলে এ যুগের সাধনহীন সন্দেহ চঞ্চল মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন কিন্তুহীন নিবিড়তায় গ্রহণ করতে পারত না। বলা যেতে পারে এক হিসাবে অবতীর্ণ ভগবানের ধর্ম, সংস্থাপনের যন্ত্ররূপেই স্বামীজি অমনটি করেছিলেন। স্বামীজির রামকৃষ্ণ সাধনাকে ঠাকুর নিজেই বুঝিবা বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। যোগ সে 'কর্মসু কৌশলম্'। সদা জাগ্রত বৈজ্ঞানিক মনীষাকে সশ্রদ্ধ ভাবে সব সময় উজ্জীবিত করেছিলেন বলেই অক্ষত ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ স্বামীজির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ এই দুই মহামানবের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে রোঁমা রোঁলা বলছেন, 'No stranger relation can be imagined than

those now established between the young man and the old guru.'

নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এক দিকে মানুষ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে দূরে থাকতেও পারছেন না আবার শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে না বুঝে অস্বীকার করছেন। ঠাকুর জানতেন যে পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' সম্পর্কেও সত্য-উপলব্ধি নরেনের ধীরে ধীরে হবে। তাই কোনও তর্ক দিয়ে জোর করেননি। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে এক দিন জীব ও ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে 'অষ্টাবক্রসংহিতা' গ্রন্থ পাঠ করতে বলেন। মন দিয়ে শোনার পর হৃদয়ঙ্গম না হয়ে বারান্দায় এসে মজা করে নরেন্দ্র বললেন— 'এ আবার হতে পারে নাকি? ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর?' ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে নরেনের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই তাঁকে স্পর্শ করেন আর নরেন্দ্র বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, চোখের সামনে থেকে সব অন্ধকার সরে গিয়ে প্রকৃত সত্য— ভগবানের সর্বময়তা তিনি উপলব্ধি করেন। সর্ব বস্তুতেই ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করলেন এবং নিজে চোখে দেখলেন। এই অভিজ্ঞতা নরেনের মনে এক আলোড়ন তুলল। প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবলেন শাস্ত্রের অদ্বৈত বিজ্ঞানেরই আভাস এটি। আর কোনও দিনই অদ্বৈততত্ত্বের উপর সন্দিহান হন নি। তীক্ষ্মধী নরেন অচিরেই বুঝতে আরম্ভ করলেন— এই অত্যাশ্চর্য্য পুরুষ কে? যিনি স্পর্শ মাত্রই শরণাগত ব্যক্তির জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে প্রবর্তিত করতে পারেন যে, অচিরে সে দর্শনলাভ করে চিরকৃতার্থ হয়।

এ বিষয়ে নিজ মর্মকথা অন্তরঙ্গ শশী ও শরৎকে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন— 'সত্যি সত্যি, সব বিলোচ্ছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল! কী অদ্ভুত শক্তি! সব করতে পারেন— দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন।'

ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের প্রেম উত্তোরত্তর বেড়েই চলল, অথচ জাগ্রত বুদ্ধিতে 'বিড়ে' নেওয়াও চলল অন্য সকল সাধনার অন্তরালে। তার পর স্বামীজির জীবনে এল নিদারুণ পরীক্ষার অগ্নি দিনগুলি। যখন নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন অশেষ ভগবৎকৃপায় ভরপুর হচ্ছিল, তখন হল তাঁর পিতৃবিয়োগ। সাংসারিক অবস্থার হল শোচনীয় পরিবর্তন, নগ্ন দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সংসারের বৈরীরূপ। দয়ালু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস টলে উঠল। আধ্যাত্মিক কষ্টে পড়ে নরেন্দ্রের দার্শনিক মন চিরকালের দ্বন্দ্ব সমস্যার মুখোমুখি হল, এমন এক দিন অবসন্ন দেহমন নিয়ে শুয়েছিলেন রাস্তার পাশে এক রকে। তখন তিনি সহসা উপলব্ধি করলেন যে কোনও এক দৈবীশক্তির প্রভাবে একের পর এক সব পর্দা যেন উঠে গেল। শিবের সংসারে অশিব কেন? ঈশ্বরের কঠোর ন্যায় পরায়ণতা ও অপার করুণার কেন এত অসামঞ্জস্য, এ সব সন্দেহে আকুল নানা বিষয়ে মিমাংসা দেখতে পেলেন। সব গ্লানি-অবসান হয়ে অন্তর আনন্দে পূর্ণ হল এবং পেলেন এক অমিত বল। এখানে স্মরণীয় যে অত্যাশ্চর্যা ঠাকুরের নেপথ্যবাসিনী মা-টি। অখণ্ডের ঘর থেকে নামিয়ে আনা নরেন্দ্র যেন ছিলেন গৃহহারা-মাতৃহারা।

ঠাকুরের নরেন্দ্রকে হারাবার ভয় এখনও যায়নি। সকলকে নিজের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী করবেন বলেই তো নরেনকে অখণ্ডের ঘর থেকে নামিয়ে আনা। জ্ঞান বিচারের ক্ষুরধার পথকেই যেন নরেন্দ্র নিজস্ব বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই মহামায়াকে বড়ো একটা আমল দিতেন না। 'ও ঠাকুর মা'— এই ভাব। তাই যখন নরেন এসে ধরলেন ঠাকুরকে, তাঁর মাকে বলে যেন সংসারের কিছু ব্যবস্থা করে দেন। এই পরম সুযোগটি ঠাকুরও ধরলেন নির্মম ভাবে এঁটে। বললেন, 'তুই আমার মাকে মানিস না তাই তোর এত কষ্ট!' কত প্রেমের কত কঠিন কথা! নরেনকে ঠেলে দিলেন একেবারে মহামায়ার আন্তর আঙিনায়। নরেন্দ্র মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একেবারে স্তম্ভিত : এ যে চিন্ময়ী, জলজ্যান্ত! বাইরের আঘাত দিয়ে নিজের দিকে উন্মুখ করে মা নরেনের চৈতন্যে একেবারে চির অনূস্যূত হয়ে গেলেন। এত সর্বগ্রাসী করুণা! আশ্চর্য গুরুর আশ্চর্য শিষ্য! ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উত্তর পেলেন প্রথম দিনের প্রশ্নের, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' হ্যাঁ দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি। পারলেন না কোনও জাগতিক প্রার্থনা জানাতে। শুধু বললেন, 'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান, ভক্তি দাও।' সাকারে চরম অবিশ্বাসী, নরেন দেবদেবীর মুর্তিকে মাথায় খেয়াল বলে অবজ্ঞা করতেন— মর্ম উপলব্ধি করে আস্থাবান হলেন। প্রমাণিত হল— সাকার নিরাকারে নেই কোনও তফাৎ। 'যত মত তত পথ'।

নরেন যে দিন কালী মানলেন, ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। এটাই ছিল প্রধান বাধা— কালী না মানা। অখণ্ডের ঘর থেকে এসে এখন হলেন মায়ের ঘরের ছেলে। আর চিন্তা কী? বিশ্বজননী ওই যে একেবারে নরেনের চৈতন্যে চাপলেন, সারা জীবন আর নামবার নামটি করলেন না। কাজটি করিয়ে নিলেন ষোল আনা। কালীকে মেনে নেওয়াতেই ব্রহ্মকে নতুন করে যেন পাওয়া গেল, তা না হলে 'জীব-শিব' মন্ত্র এমন করে অনুভূতিতে পাওয়া যেত কি? 'জগৎ-মিথ্যা' ঠাকুর যতবার বলেছেন, তার চেয়ে বেশি বার বলেছেন, 'তিনিই সব হয়েছেন'। বনের বেদান্তকে প্রেমের রসে সিঞ্চিত করে নতুন ধর্মকে মানুষের কল্যাণভূমিতে ফিরিয়ে আনলেন।

নরেন্দ্র চেয়েছিলেন চড়ে থাকবেন সমাধিভূমিতে— জগৎ ভুলে। ঠাকুর ধিক্কারের এক আঘাতে ভেঙে দিলেন সে স্বপ্ন। আত্মানন্দে বুঁদ হয়ে থাকার অধিকার নরেন্দ্রের নেই, সে তো সাধারণ সাধকের জন্য। কী জন্যে অখণ্ডের ঘর থেকে এত করে টেনে আনা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য এক মুহূর্ত ভোলেননি ঠাকুর। দিলেন তা নরেনকে কিছুতেই সংসার ভোলা আত্মারাম হতে। তাঁর বিদগ্ধ চৈতন্যকে মানুষের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। নিত্যে আরূঢ় করে লীলায় বেঁধে রাখলেন, 'জীব-শিব' মন্ত্র দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন না। খালি পেটে যে ধর্ম হয় না— এ মন্ত্রটিও দাগ কেটে বসিয়ে দিলেন নরেনের হৃদয়ে। আর এক বৈপ্লবিক প্রশ্ন করলেন 'প্রতিমায় মানুষ পূজা হয়, আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না?' মানুষকে 'মহতো মহীয়ান' করে তাকেই দিলেন দিব্য ধ্যানের বস্তু, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসে।' নতুন সাধনার পথ সমাতন ধর্মে প্রবর্তন করলেন: কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেই ঈশ্বর দর্শন হয়। মায়ের

কাজ করতে হবে নরেনকে: এই হল তার দিগ্‌দর্শন। 'নরেন শিক্ষে দিবে'— একেবারে লিখিত পরোয়ানা। এ দিকে কোমরে বস্ত্রটি থাকে না অথচ নিজের কাজ গোছানো ব্যাপারে কি পরিপাটি। এ আদেশ বিশ্ববিধাতার হৃদয় থেকে উঠছে নরেন্দ্র সে দিন বোঝেননি— জবাবে বললেন— 'আমি ও সব পারবো না'। 'তোর হাড় করবে'— বস্ত্র নির্ঘোষ অমোঘ শক্তিতে ঠাকুরের আদেশ। কাশীপুরে মহাসমাধির আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। ঠাকুর বিছানার পাশে বসা নরেন্দ্রের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে সমাধিস্থ হলেন, নরেন্দ্র বোধ করলেন ঠাকুরের দেহ থেকে তড়িৎ কম্পনের মতো একটি সুক্ষ্ম তেজোরশ্মি তাঁর শরীরে ঢুকছে। বাহ্যজ্ঞান ফিরলে দেখলেন ঠাকুরের আনন্দাশ্রু। বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।' ঠাকুর নরেন্দ্রে অনুস্যূত হলেন— আলাদা অস্তিত্ব আর রইল না। 'এটাও আমি'— 'ওটাও আমি' নরেন্দ্র কত বড়ো শক্তিধর না হলে এ শক্তি বহন করা সম্ভব, তা সহজে অনুমেয়। ঠাকুরকে নরেন্দ্রের 'বিড়ে' নেওয়া এখনও শেষ হয়নি। মহাসমাধির দুদিন আগে নরেনের বিচার প্রবণ সত্যানু সন্ধিৎসু মনে একটি প্রশ্ন: এই জরজীর্ণ দেহে শয্যালীন অধিবাসী সত্যিই কি জগতের অধীশ্বর? এই চিন্তা উদয় হওয়া মাত্রই ঠাকুর স্পষ্ট বললেন— 'সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।' ঠাকুরের নিরাবরণ আত্মপ্রকাশে নরেন্দ্রনাথ তিরস্কৃত, লজ্জিত, স্তম্ভিত হলেন। তাঁর সকল সূক্ষ্ম সন্দেহের অবসান ঘটল। স্বামীজী সব মন দিয়ে মানলেন রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ, ভগবান। জানলেন— তিনিই 'স্তম্ভিত যুগ ঈশ্বর, জগদীশ্বর যোগ সহায়।'

> The great secret of true success, of true happiness, then, in this: the man who asks for no return, the perfectly unselfish man, is the most successful.
>
> — Swami Vivekananda

‘বাণী ও রচনা’ থেকে গৃহীত

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, ‘‘অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন ‘আমি আমার’ রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে ‘ওঁ’কার অনুভব করেন, ‘ওঁ’কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে— সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়— ‘‘ক্ষীরে নীরবৎ’’।

এইসকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নির্বিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপ অপূর্ব বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন— বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা-বিভক্ত। ‘শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়’ (ন্যায়প্রস্থানের গ্রন্থবিশেষ) এ-বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন, ''কে জি সি, এসব তো কিছু পড়লে না— কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।''

গিরিশবাবু। 'কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নাই, বুদ্ধিও নাই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নাই', বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন 'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়'।

পাঠককে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, স্বামীজী যখন যে বিষয়ে উপদেশ করিতেন, শ্রোতাদিগের মনে তদ্বিষয় তখন এত গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে, ঐ বিষয়কেই তাহারা ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা সার বস্তু বলিয়া অনুভব করিত। ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে যখন তিনি বলিতে থাকিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ তল্লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করিত। আবার ভক্তি বা কর্ম বা জাতীয় উন্নতি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যখন তিনি প্রসঙ্গ উঠাইতেন, তখন তত্তদ্বিষয়কেই শ্রোতারা মনে মনে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিয়া তত্তদ্বিষয়ানুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। বর্তমানে বেদের প্রসঙ্গ উঠাইয়া তিনি শিষ্য প্রভৃতির মন বেদোক্ত জ্ঞানের মহিমায় এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তখন উহাপেক্ষা সার এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অন্য কিছু আর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গিরিশবাবু তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলেন এবং স্বামীজীর মহদুদার ভাব ও শিক্ষাদানের ঐরূপ রীতির বিষয়ে ইতঃপূর্বে পরিজ্ঞাত থাকায় শিষ্য প্রভৃতিকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাইয়া দিবার জন্য এখন মনে মনে এক যুক্তি স্থির করিলেন।

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, ''হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু দেশে এই যে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি— এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে— এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?'' গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগতের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ''দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি! চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজী বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!''

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল, আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু। জগতে এই দুঃখ-কষ্ট, আর উনি সেদিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন। রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত!

শিষ্য। আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন; নিজে হৃদয়বান কিনা!

কিন্তু এইসব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু। বলি, জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি।

এই দ্যাখ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত, তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিস? এই দ্যাখ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শুনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ''সত্যই তো গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।''

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ''কি রে, তোদের কি কথা হচ্ছিল?'

শিষ্য বলিল, ''এই সব বেদের কথাই হইতেছে। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিয়ে পারিয়াছেন— বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।''

স্বামীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়— পড়বার-শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশবাবুর) মতো যাঁদের ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অপরের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনো ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। আজ্ঞে হাঁ নয়! যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি— মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও— বিশ্বাস করবি না। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?

শিষ্য। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, 'কী হবে ও-সব পড়ে?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?

স্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (বিভিন্ন দিক) থেকে আমাদের দুইজনের কথাগুলি বলা হচ্ছে— এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, সেখানে যুক্তিতর্ক সব চুপ হয়ে যায়— 'মুকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে যাতে— বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা, পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এ-সকল পড়ে-শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, শুনিলেন তো— স্বামীজী আমায় বেদ-বেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।"

গিরিশবাবু। তা তুই কর যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে, এই জি সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?"

সদানন্দ। মহারাজ! যো হুকুম— বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী। প্রথমে ছোট-খাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরিব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে— যাদের কেউ দেখবার নেই, এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ। যো হুকুম, মহারাজ!

স্বামীজী। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার-বন্ধন কেটে যায়— "মুক্তিঃ করফলায়তে।"

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়— এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজার হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে?

গিরিশবাবু। তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন?

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

> Take care! Beware of everything that is untrue; stick to truth and we shall succeed, maybe slowly, but surely.
>
> — Swami Vivekananda

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরাজি মাধ্যম বিভাগের শিক্ষিকামণ্ডলী

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের বাংলা মাধ্যম বিভাগের শিক্ষিকামণ্ডলী

শ্রীসারদা আশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকামণ্ডলী

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষিকামণ্ডলী

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রার্থনা গৃহ

শ্রীসারদা আশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগ

বিদ্যালয়ের মাঠে প্রশিক্ষণরত ছাত্রীদের একাংশ

শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরাজি মাধ্যম বিভাগের ছাত্রীরা

আন্তঃবিদ্যালয় ড্রইং প্রতিযোগিতা

আন্তঃবিদ্যালয় যোগা প্রতিযোগিতা

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কক্ষ

২০১৩ ইং উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের বরণ

উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ল্যাবের ছাত্রীরা

উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ল্যাবের ছাত্রীরা

মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীরা

বিদ্যালয় ছাত্রীদের দ্বারা সরস্বতী মায়ের বরণ অনুষ্ঠান

বাৎসরিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী ২০১৩ (নিউ আলিপুর)। অতিথি ও ভক্তদের একাংশ

বাৎসরিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী ২০১৩ (নিউ আলিপুর)। ছাত্রীদের একাংশ

বাৎসরিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী ২০১৩ (নিউ আলিপুর)। পূজ্যপাদ মহারাজ ও ভক্তবৃন্দ

ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে DIC-এর পক্ষ থেকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম

পূজ্যপাদ মহারাজের অর্ঘ্য নিবেদন

বিদ্যালয়ের প্রাইমারি বিভাগের কম্পিউটার বিভাগ

বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিভাগের বাৎসরিক খেলাধূলা প্রতিযোগিতা

নিউ আলিপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাটিকের প্রশিক্ষণ ক্লাশ

নিউ আলিপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাটিক ও ছাপার তৈরি কাপড়

নিউ আলিপুর আশ্রম অফিস

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রম ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট

নিউ আলিপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোকেশনাল
ট্রেনিং সেন্টার

মিলন মেলা হস্তশিল্প প্রদর্শনী কমপ্লেক্সে মেয়েদের তৈরি কপারে কাজের সম্ভার। ছবি: চন্দ্রিমা রায়

নিউ আলিপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তত্ত্ব সাজানোর ক্লাস

নিউ আলিপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেলাইয়ের ক্লাস

শাখাকেন্দ্র রঘুনাথপুর আশ্রমে চক্ষু পরীক্ষা

শাখাকেন্দ্র রঘুনাথপুর আশ্রমে চশমা বিতরণ

শাখাকেন্দ্র রঘুনাথপুর আশ্রমে কম্বল বিতরণ

শাখাকেন্দ্র রঘুনাথপুর আশ্রমে দন্ত পরীক্ষা

শাখাকেন্দ্র কল্যাণী আশ্রমে অবৈতনিক ছাত্রীদের কোচিং সেন্টার

শাখাকেন্দ্র কল্যাণী আশ্রমে গ্রামের জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কল্যাণী শাখাকেন্দ্রে পূজ্যপাদ বাগীশানন্দ মহারাজজী

কল্যাণী শাখাকেন্দ্রে অবৈতনিক ছাত্রীরা গানে প্রশিক্ষণরত

হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণরত মেয়েরা

আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণপত্র

শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়

প্রাথমিক
মাধ্যমিক
উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ

“শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যাগুলো মেয়েরা নিজেরাই মীমাংসা করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে আত্মরক্ষা শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ্ দেখি, ঝাঁসীর রানী কেমন ছিল।”

— স্বামী বিবেকানন্দ

পি-৬১৫, ব্লক-‘ও’, নিউ আলিপুর,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৩
ফোন: (০৩৩) ২৪০০-২৬৮৮
(০৩৩) ৬৪৫৮-৫৩০৭

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি নিবেদন

শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ শিষ্যা শ্রীযুক্তা মীরা দেবী ও শ্রীযুক্তা বাণী দেবী ১৯৫৭ সালে ২রা জানুয়ারি এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর-মা ও স্বামীজির জীবনাদর্শ আমাদিগের আদর্শ।

তাৎপর্যপূর্ণ ২০১৩ সালটিতে যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ পালিত হইতেছে বর্ষব্যাপী। তদুপলক্ষ্যে ৪ঠা মে ২০১৩ (শনিবার), আমাদের বিদ্যালয়ে আয়োজিত হইয়াছে আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রীদের সাদর আহ্বান জানানো হইতেছে।

প্র: বিব্রপ্রাণা (সম্পাদিকা)

নিয়মাবলী:

১। প্রতিটি বিভাগে ৪ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করিতে পারে।

২। একাধিক বিভাগে একই ছাত্রী অংশগ্রহণ করিলে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিবে।

৩। প্রতিযোগীদের নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ______________।

তারিখ:— ৪ঠা মে ২০১৩ (শনিবার)

রচনা প্রতিযোগিতা

সময়সীমা— দেড় ঘণ্টা
উপস্থিতি— ৯-৩০ মি.
লেখবার সময়— ১০ ঘটিকা

বিভাগ ‘ক’— পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী
বিষয়— ছাত্রসখা নরেন্দ্রনাথ

বিভাগ ‘খ’— সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী
বিষয়— স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

বিভাগ ‘গ’— নবম ও দশম শ্রেণী
বিষয়— মানবমিত্র বিবেকানন্দ

বিভাগ ‘ঘ’— একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী
বিষয়— স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনাদর্শ: ত্যাগ ও সেবা

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

উপস্থিতি— বেলা ১২ ঘটিকা
প্রতিযোগিতা শুরু— ১২-৩০ মি.

বিভাগ ‘ক’— নবম ও দশম শ্রেণী
(যে কোনও একটি)
১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
২। তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন

বিভাগ ‘খ’— একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী
(যে কোনও একটি)
১। গগনের থালে রবি চন্দ্র (স্বর বিতান-৬৪)
২। একী এ সুন্দর শোভা

যোগাসন প্রতিযোগিতা

উপস্থিতি— ১০.৩০ মি.
প্রতিযোগিতা শুরু— ১১ ঘটিকা
কেবলমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য

আসন:
সর্বাঙ্গাসন • ধনুরাসন

বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা

উপস্থিতি— সকাল ৯ ঘটিকা
প্রতিযোগিতা শুরু— ৯-৩০ মি.

বিভাগ ‘ক’— তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী (প্রাথমিক বিভাগ)
সাপ্লিষ্ট কাগজে বিষয়বস্তু দেওয়া হইল।

বিভাগ ‘খ’— অষ্টম ও নবম শ্রেণী
সাপ্লিষ্ট কাগজে বিষয়বস্তু দেওয়া হইল।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

উপস্থিতি— সকাল ১১-৩০ মি.
প্রতিযোগিতা শুরু— ১২ ঘটিকা
সময়সীমা— ২ ঘণ্টা

বিভাগ ‘ক’— তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী (প্রাথমিক বিভাগ)
বিষয়— যেমন খুশি আঁকো
মাধ্যম— প্যাস্টেল রং

বিভাগ ‘খ’— পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী
বিষয়— বিলের খেলাধুলার একটি দৃশ্য
মাধ্যম— জল রং

বিভাগ ‘গ’— সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী
বিষয়— সার্ধশতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ
মাধ্যম— মিশ্র

“মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সে-ই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়।”

— স্বামী বিবেকানন্দ

“মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।”

— স্বামী বিবেকানন্দ

Inter School Competition 2013

List of Prize-Winners:-

Ramkrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (IX/X)
প্রথম: সুস্মিতা নাথ

বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা (III/IV)
প্রথম: অন্বেষা বিশ্বাস

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (III/IV)
তৃতীয়: অঙ্কিতা সাহা

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (V/VI)
তৃতীয়: নবমিতা ব্যানার্জী

রচনা প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
প্রথম: মৌনি পাত্র

Multipurpose Govt. Girls' High School

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (IX/X)
প্রথম: সমদিপ্তা মুখার্জী

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (V/VI)
দ্বিতীয়: লাবনী সাউ

রচনা প্রতিযোগিতা: (VIII/IX)
তৃতীয়: শালিনী দাস

Bidyabharati Girls' High School

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (IX/X)
তৃতীয়: কমলিকা রায়চৌধুরী

রচনা প্রতিযোগিতা: (VIII/IX)
দ্বিতীয়: সৃজিতা মাইতি

Ballygunj Siksha Sadan Girls' High School

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা: (XI/XII)
বিশেষ পুরস্কার: চিরশ্রী ব্যানার্জী

Budge Budge Uchcha Balika Vidyalaya

যোগাসন প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
তৃতীয়: নৈরিন ইয়াসমিন

Sree Ramakrishna Sarada Sangha Balika Bidyalaya

বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা: (VII/IX)
তৃতীয়: সোহিনী চ্যাটার্জী

রচনা প্রতিযোগিতা: (V/VI)
তৃতীয়: শ্রেয়া কর

রচনা প্রতিযোগিতা: (VIII/IX)
প্রথম: শরৎপ্রিয়া কর

School: Jadavpur Vidyapith
অঙ্কন প্রতিযোগিতা: (III/IV)
প্রথম: শ্রেয়া ঘোষ

School: National Girls' High School
অঙ্কন প্রতিযোগিতা (III/IV)
দ্বিতীয়: বিদিপ্তা চৌধুরী

Sarengabad Jajneswari Pathsala Girls' High School

অঙ্কন প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
প্রথম: ঝুমা কর্মকার
দ্বিতীয়: সামিমা খাতুন

Muralidhar Girls' High School

অঙ্কন প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
তৃতীয়: সায়নী সামন্ত

Gokhale Memorial Girls' School

রচনা প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
তৃতীয়: অলিমিতা সরকার

Sree Sarada Ashrama Balika Bidyalaya

যোগাসন প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
প্রথম: রায়া ভট্টাচার্য
দ্বিতীয়: স্নেহা ব্যানার্জী

বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা: (III/IV)
দ্বিতীয়: সৃজনী নট্ট
তৃতীয়: শ্বেতা ভট্টাচার্য

বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা: (VIII/IX)
প্রথম: পৌলমী মুখার্জী

অঙ্কন প্রতিযোগিতা: (III/IV)
তৃতীয়: তিয়াসা হালদার

অঙ্কন প্রতিযোগিতা: (V/VI)
প্রথম: হৃত্বিকা সাহা

রচনা প্রতিযোগিতা: (V/VI)
প্রথম: সঞ্চারী দীর্ঘাঙ্গী
দ্বিতীয়: মাধবপ্রিয়া করণ

রচনা প্রতিযোগিতা: (VII/VIII)
দ্বিতীয়: তিতির বৈদ্য

Sree Sarada Ashrama Uchcha Balika Bidyalaya

রচনা প্রতিযোগিতা: (XI/XII)
প্রথম: পৌলমি মাইতি
দ্বিতীয়: ঈশিতা দত্ত

Inters Class Competition 2012

প্রথম পর্ব

বক্তৃতা

(V-VI)
প্রথম: শ্রীমতী সঞ্চারী দীর্ঘাঙ্গী
দ্বিতীয়: শ্রীমতী সৃজা রায়
তৃতীয়: পিয়াস চক্রবর্তী

(VI-VII)
প্রথম: শ্রীমতী প্রজ্ঞা সাহা
দ্বিতীয়: সাওনা মন্ডল
তৃতীয়: প্রিয়াংকা সরকার

(IX-X)
প্রথম: শ্রীমতী বিদিপ্তা চক্রবর্তী
দ্বিতীয়: স্বস্তিদীপা মুখার্জী
তৃতীয়: বেদত্রয়ী রায়চৌধুরী

রচনা

(V-VI)
প্রথম: স্বাগতা মিশ্র
দ্বিতীয়: অরিত্রী মল্লিক
তৃতীয়: সুবর্ণা ঘোষ

(VI-VII)
প্রথম: সুপ্রীতি মাজী
দ্বিতীয়: পৌলমী মুখার্জী
তৃতীয়: শ্রেয়া সিন্‌হা

(IX-X)
প্রথম: অন্বেষা ভট্টাচার্য
দ্বিতীয়: উপাসনা সরকার
তৃতীয়: সহেলী চক্রবর্তী

অঙ্কন

(V-VI)
প্রথম: তিয়াসা নন্দ
দ্বিতীয়: অয়ঙ্কা মাঝি
তৃতীয়: ঋতজা কমল

(VI-VII)
প্রথম: শর্মিষ্ঠা জানা
দ্বিতীয়: পৌলমী সাধুখাঁ
তৃতীয়: সৌমিলি আদক

প্রাথমিক বিভাগ
প্রথম: অন্বেষা আচার্য্য
দ্বিতীয়: পূজা দাস
তৃতীয়: তিয়াসা হালদার

(IX-X)
প্রথম: মোনালিসা হাঁসদা
দ্বিতীয়: শ্রীজয়ী দে
তৃতীয়: কেয়া কর্মকার

দ্বিতীয় পর্ব

বাণীপাঠ
(English Medium- Primary Section)
প্রথম: ত্রমিলা দত্ত
দ্বিতীয়: শ্রীজনী কুন্ডু
তৃতীয়: সৃষ্টি কর

প্রাথমিক বিভাগ
প্রথম: দেবস্মিতা মাইতি
দ্বিতীয়: অনন্যা মন্ডল
তৃতীয়: অর্পিতা বাণিক

ক বিভাগ (V-VI)
বিশেষ পুরস্কার: ঋদ্ধি চক্রবর্তী (ষষ্ঠ)

খ বিভাগ (VII-VIII)
প্রথম: সৈরন্ধ্রী দে (সপ্তম)
দ্বিতীয়: রিস্তা গুপ্ত (সপ্তম)
তৃতীয়: প্রজ্ঞা সাহা (অষ্টম)

গ বিভাগ (IX – X)
প্রথম: বিদিপ্তা চক্রবর্তী (নবম)
দ্বিতীয়: উপাসনা সরকার (নবম)

যোগাসন
ক বিভাগ (VI – VII)
প্রথম: শ্রুতি ঘোষ (সপ্তম)
দ্বিতীয়: প্রতীতি রায় (ষষ্ঠ)
তৃতীয়: সুলগ্না বসু (সপ্তম)

খ বিভাগ (VIII – IX – X)
প্রথম: পাপড়ি রায় চৌধুরী (অষ্টম)
দ্বিতীয়: নেহা বিশ্বাস (অষ্টম)
তৃতীয়: প্রজ্ঞা সাহা (অষ্টম)

সঙ্গীত
ক বিভাগ (V-VI)
প্রথম: ঋদ্ধি চক্রবর্তী (ষষ্ঠ)
দ্বিতীয়: সুবর্ণা ঘোষ (ষষ্ঠ)
তৃতীয়: তনুশ্রী মন্ডল (পঞ্চম)

খ বিভাগ (VII – VIII)
প্রথম: আত্রেয়ী দাস (অষ্টম)
দ্বিতীয়: সুপ্রীতি মাঝি (অষ্টম)
তৃতীয়: তৃষা দে (অষ্টম)

গ বিভাগ (IX – X)
প্রথম:শ্রীজয়ী দে (নবম)
দ্বিতীয়: অনুষা ভান্ডারী (নবম)
তৃতীয়: শ্রীজিতা চক্রবর্তী (দশম)

স্বামীজীর বাণী—

(অষ্টম ও নবম শ্রেণীর জন্য)

পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে— অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল— এগিয়ে যাও, এখনও বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি— এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি— এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশ মণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে— অল্পক্ষণের মধ্যে, দেখিবে সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়— চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করতে পারি। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই এ-কথা জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা— তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।' —হে অর্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই। তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণ ভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে সব শক্তিতে কাজ হয়, সেগুলি তো আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেলো, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন— এ তো তাঁরই কাজ। আমাদের আর কিছু করতে হবে না— কেবল সরে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে। আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতরে আসবেন। 'কাঁচা আমি'টাকে দূর করে দাও। কেবল 'পাকা আমি'টাই থাক্।

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

স্বামীজীর বাণী—

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য)

হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও— তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহস পূর্বক এ কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালোবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝিবে।

জীবনের পরম সত্য এই: শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।

সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বতচূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সংকল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ় ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন— যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ— জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।

সাহস অবলম্বন কর। আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আমরা তাহা করিব।

আন্তঃবিদ্যালয় অঙ্কন প্রতিযোগিতার চিত্র

প্রথম

Shreya Ghosh

Class - III, Jadavpur Vidyapith

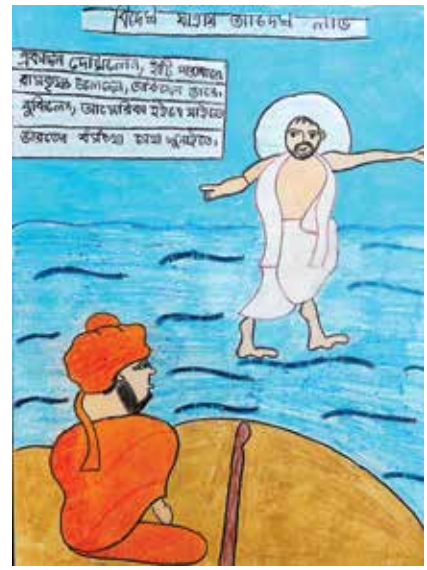

দ্বিতীয়

Bidipta Chowdhury

Class - III, National Girls' High School

তৃতীয়

Ankita Saha

Class - IV, Ramakrishna Sara-da Mission Sister Nivedita Girls' School

প্রথম

Ritwika Saha

Class - V, Sree Sarada Ashrama Balika Bidyalaya

দ্বিতীয়

Labani Shaw
Class - VI, Multipurpose Govt. Girls' High School

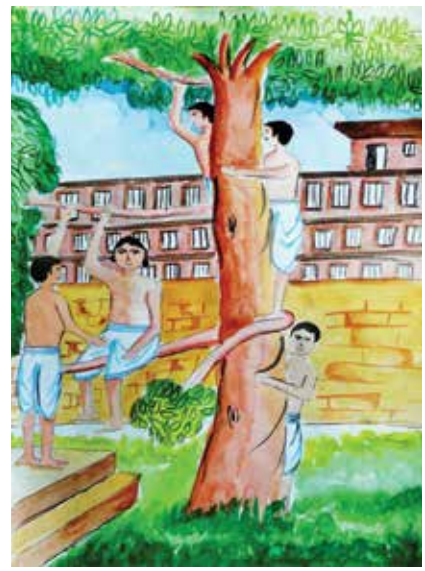

তৃতীয়

Nabamita Banerjee
Class - VI, Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School

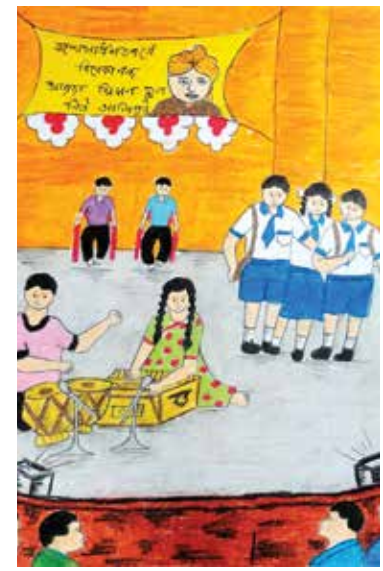

প্রথম

Jhuma Karmakar
Class - VII, Sarangabad Jajneswari Pathsala Girls' High School

তৃতীয়

Tiyasa Halder
Class - IV, Sree Sarada Ashrama Balika Bidyalaya

তৃতীয়

Sayanee Samanta, Class - III
Murlidhar Girls' School

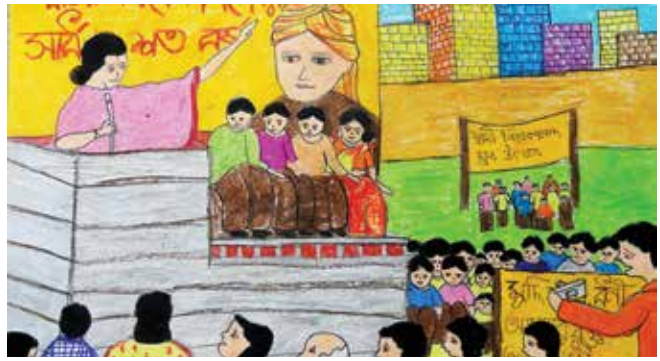

দ্বিতীয়

Samima Khatun, Class - VII,
Sarangabad Jajneswari Pathsala Girls' High School

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনাদর্শ: ত্যাগ ও সেবা

পৌলমী মাইতি শ্রী সারদা আশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দ্বাদশ শ্রেণি

সূচনা: ত্যাগ ও সেবা বিষয়টি পর্যালোচনা করলে প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয় রোদ্দুরে দণ্ডায়মান সেই মানবপ্রেমী, প্রবল রোদ্দুরে গা পুড়ে যাচ্ছে, তবুও— তবুও দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সেই মানবপ্রেমী যে!

ঊনবিংশ শতকের শেষ সালটা তখন প্রবল বর্ষার। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতায় ব্যক্তি মানুষর পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালের এক কোণে। প্রবল শীতে মানুষের মননে তখন শীতের জড়তা। ভারতজোড়া কালোমেঘের প্রবল গ্রাসে কান্নায় ফেটে পড়েছে সমগ্র ভারতবাসী। অবশেষে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তির দিন সূর্যোদয়ের ঠিক ছয় মিনিট পূর্বে জন্মগ্রহণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দূরীভূত হল আলোর অভাব, তিনি ছিলেন আলোর ছটা স্বরূপ। ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত পেরিয়ে অবশেষে এল বসন্ত। শীতের প্রার্থনার বসন্তের উত্তর হয়ে দাঁড়াল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের বাণী।

''জাতীয় জীবনাদর্শ হল 'ত্যাগ ও 'সেবা'— এই দুইটিতে নিজেকে উন্নত করিলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে।''

কিন্তু বসন্ত তো ফুল ফোটার সময় নয়, সুখের সময় নয়। এ হল খোঁজার তথা অন্বেষণের সময়। তিনি বুঝলেন বন্দরের সময় ফুরাল। তাই তিনি যাত্রা করলেন। অস্থির মন নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ালেন দেশে-প্রান্তরে। ১৮৯৭ সালে আসমুদ্রহিমাচল তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা (তার বিশ্বস্ত শিষ্য গুডউইনের লেখা) 'Lectures from Colombo to Almora' বা 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ধরা পড়ল।

ধর্মের মর্মকথা কী?

নিজ অন্তর্লিখিত দেবত্ব অর্থাৎ দৈবগুণ সমূহকে প্রস্ফুটিত করে তোলা। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনাদর্শে আধ্যাত্মিকতাকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। ধর্ম হল যা ধারণ করা যায়। কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের মধ্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম হল ছাতা, যার আশ্রয়ে মানুষের সুপ্ত জৈবিকতার বিকাশ ঘটে তাকে নিয়ে যায় চৈতন্যদ্বারে। জাতীয় জীবনাদর্শ— শক্তি, প্রেম, সাহস, নিঃস্বার্থপরতা, সেবাবৃত্তি, ত্যাগ, শৃঙ্খলা এই সব কিছু বিকাশ অবসম্ভাবী। 'Religion is manifestation of divinity is already in man'— স্বামীজী বললেন।

মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছে দিতে তিনি শুরু করেন তার জাতীয় জীবনাদর্শের মন্ত্রোচ্চারণ, যাকে বলে পরের জন্য নিজ স্বার্থত্যাগ বা নিঃস্বার্থপরতা যার পরিচয় আমরা পাই যখন তিনি ভুনওয়ালার উনুনের পাশে তপ্ত হতে থাকেন। স্বদেশ-প্রেম, ভারতপ্রেমের ঊর্ধ্বে গিয়ে যা হয়ে দাঁড়ায় মানবপ্রেমের সমার্থক। তিনি তার এই জীবনাদর্শের প্রভূত বীজ স্বরূপ ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

আচ্ছা কী ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ হওয়া যায়? সেই পথ কি কণ্টকাকীর্ণ? সেখানে কি সব ভালো-মন্দ মিশে একাকারে ভালো হয়ে যায়? তাঁর হৃদয়ে ছিল জাতি-প্রেম, স্বদেশ প্রেম, ভারতপ্রেম। তিনি স্বয়ং হয়ে ওঠেন ভারতবর্ষ। আর তার সামনে তার সন্তান এই অগণিত ভারতবাসী। বিদ্যাপতি বলেছিলেন— 'বিদ্যাপতি কহে কৈহে গোঞায়বি, বিনে দিন রাতিয়া'। অর্থাৎ এখানে বিবেকানন্দ ধারক স্বরূপ রক্ষা করেছে এই সমগ্র ভারতবাসীকে। তিনি যে সেবা প্রদান করেছেন তা নিঃস্বার্থ, বিনম্র, সৎ। মূর্খকে শিক্ষা দান, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, রোগীকে পথ্য দান, আহতকে শুশ্রূষা প্রদানের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে তার সেবার আয়োজন, তবে তা সর্বদা প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। নিজ মানসিকতা অনুযায়ী সেবা তো স্বার্থসেবারই এক নামান্তর। তাই বিবেকানন্দ ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবার কথা বলেছেন।

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—

স্বামীজীর সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সেবামূলক মানসিকতা প্রকাশ পায়।

হিন্দু সমাজের মূল আদর্শ হল স্বামীজী কথিত ত্যাগ ও সেবা। ফরাসিদের যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা তেমনই ইংরেজদের অর্থনৈতিক অধিকার লাভ। এ বার ত্যাগের

কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল— স্বামীজী বলেন যে দেবত্বকে প্রকাশ প্রয়োজন। যে ত্যাগ করছেন বা যার জন্য ত্যাগ করছেন তার চিত্তবিকাশ হওয়া দরকার। ত্যাগ করে তা নিয়ে গর্ববোধ নয়, ত্যাগের জন্যই ত্যাগ। কোনও কিছু লাভের জন্য নয়, বড়ো কিছু পাওয়ার আশায় ত্যাগ করা উচিত। সেই বড়ো জিনিস হল ভূমা— যা অক্ষয়। উপনিষদের মতে—

'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব মহে'।।

ত্যাগ হল বৃহৎ, অনন্ত। যা ব্যক্তি মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে সরিয়ে বৃহৎ অনন্তে মিশিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাহাই হল ত্যাগ।

স্বামীজীর পিতার মৃত্যুর পর, দত্ত পরিবারে যখন অত্যন্ত দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে, তখন, বাড়ির বড়ো ছেলে হয়েও কোনও দায়িত্বভার গ্রহণ করতে না পারায় তার মনে মন কেমনের একটা হলুদ হাওয়া বয়ে গেল। তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, নিজের মায়ের থেকে দূরে থেকে তিনি যে ভালোবাসা একলা ঘরে পুষে রেখেছিলেন তা নিয়ে তিনি বলে ফেললেন— 'আমার যদি ভালোবাসার কেউ না থাকত?' কেন এই ত্যাগ ও সেবা কখনও বর্ষার জলের মতো অনন্ত অসীম, আবার কখনও তপ্ত বিকেলের এলোপাথারি গোলাপের কাঁটার মতো যন্ত্রণাদায়ক?

স্বামীজী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে। স্বামীজীর হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল গভীর ভারতপ্রেম, স্বদেশপ্রেম। তিনি কিন্তু কম রোমান্টিক ছিলেন না, একটা মানুষ প্রেমে যতটা পাগল হতে পারে তেমনই রামকৃষ্ণদেব তৎকালীন হিন্দু সমাজের কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবী শ্রেণির থিয়েটার বর্জনের বিরুদ্ধে গিয়ে চরম সাবলীলতার সঙ্গে নিজের 'Image' নষ্ট হওয়ার ভয় না পেয়ে চরম প্রতিবাদ করেছিলেন সারদা মা, রামকৃষ্ণের সন্তান হয়ে তিনি কী রূপ পিছু হটে যাবেন? তিনি কেন ত্যাগ ও সেবামূলক জাতীয় জীবনাদর্শের ইতিবাচক জীবনাদর্শ গ্রহণ করবেন না? তিনিও করেছিলেন।

একপারে ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপর পারে স্বামী বিবেকানন্দ, তথা বৈপ্লবী, তপ্ত আঁচে তিনি সেঁকে নিয়েছিলেন নিজের বিপ্লবী সত্ত্বাকে। ঘোষণা করেছিলেন এ বার কেন্দ্র ভারত। সমগ্র বিশ্ব যে করাল গ্রাসে আপ্লুত ছিল তা থেকে মুক্তি প্রদান করেছিল। তিনি চরিত্র গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন আর চরিত্রগঠনের জন্য তিনি ভারতবাসীকে ত্যাগ ও সেবামূলক ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে এই সমূহ বাণী সিদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী নিজ স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতবাসীকে নিজের হৃদয়ে কোটরাগত করে রেখেছিলেন। তাদের সেবায় নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলেন। ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের চেতন ও মননের পূর্ণ বিকাশ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাঁর অসীম যাত্রায় তিনি ছুঁয়ে গিয়েছেন জেলে, মুচি, ভুনাওয়ালার ঝুপড়ি। তিনি বুঝেছিলেন যে রক্তের বিস্ময়ে ঠেলে দিয়ে তা থেকে উত্তোরিত করাই হল ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র ধারণের মূল উদ্দেশ্য। শেষ জীবনে নাকি সকল মানুষকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তিনিও মনে হয় শেষ জীবনে ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং ধরে নেওয়া হয় সেটিই ছিল মানবপ্রেমী স্বামীজীর শেষ প্রেমপত্র। এটি তার একটি আবেদনও ছিল বটে যাতে তিনি চেয়েছিলেন সকলের মাঝে ত্যাগ ও সেবার এই মন্ত্র ভরিয়ে দিতে। সেটাই শেষ, কিন্তু তার পর আবার নতুন যাত্রা সেই জাতীয় জীবনাদর্শের পথে স্বামীজীর যাত্রা সেই রোদ্দুর প্রেয়সী, রোদ্দুরের প্রেমিক স্বামীজীর যাত্রা...!

> পরার্থে একটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা— আমি দেখে খুশী হই।... লেগে যা। ক'দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা

মানব মিত্র স্বামী বিবেকানন্দ

শরৎপ্রিয়া কর শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়, নবম শ্রেণি

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু মানব মিত্রই নন, তিনি ছিলেন মানুষের চির পথের সাথী, তিনি ছিলেন মানুষের চিরজীবন, প্রাণের প্রাণ।

স্বামীজীর মধ্যে এই মানব প্রেমের স্ফূরণ বাল্যকালে ঘটেছিল। মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছোট্টো বিলেকে দুষ্টুমির জন্য ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন— আর বিলে ভিখারির আর্ত চিৎকারে আলনা থেকে দামি জামা-কাপড় জানলা গলিয়ে ভিখারিদের দান করে দিচ্ছে। এটি স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকালের অতি পরিচিত দৃশ্য। সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের প্রতিও বিলের ছিল অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসা, মমত্ববোধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধক জীবনে স্বামীজীকে দিয়েছিলেন মানব প্রেমের বিকেব মন্ত্র— 'তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে।' ব্যক্তিগত মুক্তি কামনাকে বিসর্জন দিয়ে সে দিন স্বামীজীর নবজন্ম ঘটেছিল। শ্রী ঠাকুর 'জীবে দয়া' কথাটি গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে, 'শিব জ্ঞানে জীব সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম'। স্বামীজী তাঁর এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে স্বামীজী প্রব্রজ্যা নিয়ে প্রায় সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নিপীড়িত, ক্ষুধিত, দলিত, দরিদ্র মানুষের সাথে স্বামীজীর আত্মিক বন্ধন নতুন ভাবে গড়ে উঠেছিল। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন— 'নেমেছে ধুলার তলে, হীন পতিতের ভগবান।' তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন— 'সর্বভূতে সেই প্রেমময়।' 'যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই।' সেই সব মানুষদের কাছ থেকে স্বামীজী পেলেন শ্রদ্ধা, প্রীতি, সহযোগিতা, সেবা। স্বামীজী নিজের অন্তর উজাড় করে এই সব মানুষদের দিলেন তাঁর বুক ভরা ভালোবাসা। স্বামীজী ভালোবাসার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল ভেদাভেদ, বৈষম্য, জাতপাত বিচার। তাই মুসলিম মাঝি ও তার শিশুকন্যা, ভাঙ্গী (মেথর) হরিজন পরিবার, রাজদরবারের নর্তকী, সেবাপরায়ণ হালুইকর, অখ্যাত ফকির সাহেব, আস্তাবলের সহিস, সহায় সম্বলহীনা গ্রাম্য নারী— এরা সবাই, এই সব নামহারা মানুষেরা স্বামীজীর আত্মার আত্মীয়তে পরিণত হয়েছিল। এই সব দরিদ্র, অবহেলিত মানুষদের কাছ থেকে স্বামীজী জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন— 'ভারত পরিক্রমার ফলে স্বামীজী ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে।' স্বামীজী এই সব নিরন্ন, নিপীড়িত মানুষদের ডেকে শোনালেন আশার বাণী— 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্ নিবোধত।' এই সব মানুষদের নিষ্ঠা, কর্মশক্তি, আন্তরিকতার মধ্যে স্বামীজী অনন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে মন্তব্য করেছেন— 'এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে। আর আধখানা রুটি পেলে, ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।' তিনি এই সব খেটে খাওয়া, শ্রমজীবীদের প্রণাম জানিয়ে সগৌরবে বলেছেন— 'ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী তোমাদের প্রণাম।' ভারততীর্থ পরিভ্রমণ কালে তিনি সিদ্ধান্ত নেন— 'এই সব শুষ্ক শ্রান্ত বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।' তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সব মানুষদের দুঃখ দূর করাই প্রকৃত ধর্ম, বাকি যা কিছু সবই অধর্ম।

১৮৯৩ সালে চিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে বলা যায়— 'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।' আমরা মনে করি স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় মানব ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে— 'উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটু ম্বকম্।' তাই ধর্মমহাসভার উদ্বোধনী ভাষণে স্বামীজী আমেরিকার জনগণকে— 'আমার আমেরিকাবাসী ভাইবোন।' বলে উদার কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন। ধর্মমহাসভার বক্তৃতাবলীর মধ্যেও স্বামীজী মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, বিভেদ, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এইখানে তাঁর মানব প্রেম বিশ্বজননীতায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে ধনীগৃহে বিলাসের সুখশয্যা পরিত্যাগ করে, তিনি নিরন্ন, নিরাশ্রয় দেশবাসীর কথা ভেবে অশ্রুপাত করেছেন। বিশ্বধর্মমহাসভার একজন মহানায়ক হওয়া সত্ত্বেও নিগ্রো কুলীর সাথে করমর্দন করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। পতিতা নারীকে 'হতভাগিনী' বলে সম্বোধন করে তিনি বেদনায় কাতর হয়েছেন। কারণ তাঁর কাছে— 'Each soul is potentially

divine.'

বিশ্বজয় করে স্বামীজী ভারতভূমিতে ফিরে আসেন। ১৮৯৭ সালে ১ মে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁর মানবপ্রেম এবং জনগণের হিতসাধন। এই মঠ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন— 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' এই বীজ মন্ত্রটি আজও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে চিরভাস্বর। মানবপ্রেমিক যুবসম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে নতুন পথের নির্দেশ দিলেন— 'Be and make'। 'নিজে জেগে অপরকে জাগাও, নিজে উঠে অপরকে উঠতে সাহায্য কর। অন্নহীনকে অন্ন দাও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও গৃহহীনকে গৃহ দাও, নিরক্ষরকে দাও অক্ষর জ্ঞান।' স্বামীজী দেশবাসীকে মানব প্রেমের শপথ বাক্য পাঠ করালেন— 'বলো মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই।' স্বামীজীর এই বিবেকবাণীতে জাতপাত, জাতিধর্ম, ভেদবিভেদ তুচ্ছ হয়ে গেল। দেশবাসী 'পরহিতায় জীবন পাত।' করার জন্য প্রস্তুত নিল। বন্যায়, খরায়, প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত মানুষদের সেবা করার জন্য মঠের সন্ন্যাসীরা ছুটে এলেন এবং স্বামীজী তাদের নেতৃত্ব দিলেন। অসহায় দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুত্র কন্যাদের জন্য স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে স্থাপন করেন অনাথ আশ্রম (Home)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মের ধারা আজও অব্যাহত। আজও 'যেখানে ডাক পরে, জীবন মরণ ঝড়ে।' রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সদা তৎপর।

আজও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ক্রোধে-ঘৃণায় মানব প্রেম সর্বত্র লজ্জিত এবং বিপর্যস্ত। একটা হতাশার অন্ধকার যেন চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরেছি। তবে হতাশ হলে বা ভয় পেলে চলবে না। স্বামীজী তো নিজে আমাদের ডেকে বলেছেন— 'হে বীর সাহস অবলম্বন করো।' সাহস অবলম্বন করলেই জড়তা, বিমূঢ়তা দূর করা যাবে। আমরা শুনতে পাব স্বামীজীর সেই অভীঃ মন্ত্র, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাব সেই যুগপুরুষকে, যিনি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা বলব— 'বন্ধু রহো, রহো সাথে।'

> Let us all work hard, my brethren; this is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping.
>
> — Swami Vivekananda

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা

ছাত্রসখা নরেন্দ্রনাথ

সঞ্চারী দীর্ঘাঙ্গী শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়, ষষ্ঠ শ্রেণি

'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র'। মানবজীবনকে ঘিরে কবির এই উক্তি যথার্থই সত্য। জন্মাবধি আমরা পৃথিবীর বুকে লালিত পালিত হচ্ছি এবং তার বিবিধ উপাদান থেকে আমৃত্যু শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছি। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'— এই গভীর শাশ্বত বাণী আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের সারা জীবনকালই ছাত্রজীবন, তবে আক্ষরিক অর্থে ছাত্রজীবন বলতে আমরা বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সময়কালকে বুঝে থাকি এবং মোটামুটি ভাবে সকলেই কিছুটা হলেও এই পর্যায়ের পথে পদচারণা করি। এই সময় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময়ে গড়ে ওঠা সু-অভ্যাসগুলি আমাদের সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। এই সময়ই আমাদের মানবিক গুণগুলির বিকাশ ও প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। যা পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত জগতে যা কিছু ভালো তার নির্যাসগুলি নিজেদের মধ্যে আত্তীকৃত করা এবং কোনও আদর্শকে সামনে রেখে নিজের কর্মে ব্রতী হওয়া।

আমাদের ভারতমাতা রত্নপ্রসবিনী— এ কথা আজ বিশ্বদরবারে স্বীকৃত এবং সমাদৃত, ভারতভূমিতে যুগে যুগে কালে কালে যে সব মহাপুরুষেরা ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁদের জীবন ও বাণীকে সামনে রেখে বিশ্ববাসী খুঁজে পেয়েছে জীবনের মূল মন্ত্র। এই নক্ষত্রখচিত ভারতাকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির বিভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল আসমুদ্রহিমাচল— তিনি আর কেউ নন, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নররূপী নারায়ণের আহ্বানে ধরার ধূলিতে নেমে আসা— 'নরেন্দ্রনাথ' পরবর্তীকালে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি মা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং বাবা বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তথা ছাত্রাবস্থায় তাঁর নাম ছিল 'নরেন্দ্রনাথ'। সে দিনের সেই 'নরেন্দ্র' আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র মানবজাতির 'রাজা'— বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায় তথা ছাত্রসম্প্রদায়ের কাছে আদ্যাবধি তিনি স্বর্ণসিংহাসনে আসীন। তাই আজও তাঁর জন্মদিনে— যুবদিবসে, প্রতিটি তরুণ প্রাণে বাণ ডাকে। সুপ্তি থেকে উঠে তাঁর বাণীর নির্ঘোষে নতুন করে উজ্জীবিত হয় ছাত্রসমাজ।

সখা বা 'বন্ধু' বলতে আমরা বুঝি, যে বা যিনি আনন্দে-বিষাদে, সুখে-দুঃখে সম্পদে-সংকটে সর্বদা পাশে বিরাজমান। স্বামীজী বর্তমানে তাঁর নশ্বরদেহে না থাকলেও তিনি অবিনশ্বর হয়ে আছেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে। তাঁর বাণী বহন করে আনে সততা, পবিত্রতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি হৃদয়বত্তার বার্তা। স্বামীজী বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে জাগাতে চেয়েছিলেন ছাত্রসমাজকে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'— তাঁর এই আহ্বান আমাদের শোনিতস্রোতে হিল্লোল তোলে। 'Arise! Awake! And stop not till the goal is reached.'— তাঁর এই আহ্বান আমাদের আত্মচেতনার উন্মেষ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং আমাদের নিজলক্ষ্যে উপনীত হতে প্রেরণা জোগায়। প্রকৃত বন্ধুই পারে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে।

স্বামীজী বলেছেন, তাঁর শরীর আমাদের সাথে না থাকলেও, তাঁর শক্তি সর্বদা আমাদের সাথে কাজ করবে। প্রকৃত বন্ধুর মতোই তাঁর এই বাণী আমাদের চলার পথের পাথেয়। স্বামীজী চেয়েছিলেন সবল, সাহসী, পরোপকারী, কুসংস্কারমুক্ত, ক্ষমতা-বিমুখ, ঈর্ষাহীন ছাত্রসমাজ। বস্তুত তিনি ছিলেন কর্মবীর এবং প্রবল ভাবে আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাসী। তিনি চেয়েছিলেন লৌহের মতো দৃঢ়পেশিসম্পন্ন ইস্পাতের মতো স্নায়ু সম্পন্ন এবং বজ্রকঠিন মনের ছাত্রসমাজ। ছাত্রজীবনে তাঁর আরও একটি গুণ ছিল যা ছাত্রসমাজের চির গ্রহণীয়, তা হল অধ্যবসায়। এর প্রগাঢ়তায় অতি জটিল এবং কঠিন বিষয়ও সহজেই আয়ত্ত করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি গুণ দেখতে পাই। আত্মবিশ্বাস, অকুতোভয়তা, বীর্যবত্তা, বাগ্মিতা, সহমর্মিতা, উদারতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণগুলির উপর নির্ভর করে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন সেই সমস্ত গুণবীজেরই অঙ্কুরোদ্গম ঘটে তাঁর ছাত্রজীবনে। আমরা যদি আমাদের এই ছাত্রজীবনে তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর আলোকে আলোকিত করে তুলতে পারি আমাদের মন ও মননকে, তবেই সার্থক হবে আমাদের এই ছাত্রসমাজ। তিলে তিলে সমগ্র ভারতে সফল রূপায়ণ ঘটবে তাঁর স্বপ্নের ও আদর্শের। কোটি কোটি মানবাত্মার জাগরনে স্বপ্ন সফল হবে ভারতাত্মার।

নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

মৌনী পাত্র রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, সপ্তম শ্রেণি

স্বামী বিবেকানন্দ অসীম কমশক্তিসম্পন্ন নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ বিরাট বিপুল তাঁর চরিত্রের ব্যাপ্তি। সমগ্র জাতির সম্মুখে তিনি এক সুমহান 'আদর্শস্বরূপ পরাধীনতার নিরন্ধ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মবিস্মৃত জাতিকে প্রকৃত ভারত সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীর বিখ্যাত দত্ত পরিবারে এটর্নী বিশ্বনাথ দত্ত ও ধর্মপ্রাণা ভুবনেশ্বরী দেবীর দুরন্ত সন্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের এই মেধাবী ছাত্রই পরবর্তীকালে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে পরিণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক বিস্তীর্ণ ভারতভূমির পথপ্রান্তর গ্রামনগর, মরুপর্বত, অরণ্য অতিক্রম করে চলেছেন এক তরুণ সন্ন্যাসী যাঁর দৃঢ় ও বজ্রমুঠিতে ধৃত প্রাচীনতম প্রতীক পরিব্রাজকের যষ্টি, উন্নত শীর্ষে শোভামান যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনার হোমানলসৃশ গৈরিক উষ্ণীষ, প্রতিভাদীপ্ত বিশাল নয়নে কী এক সন্ধানী দৃষ্টি, প্রশান্ত ললাটে বিচ্ছুরিত তপঃসিদ্ধির দিব্যদ্যুতি।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র মন্ত্রকে হৃদয়ে জপমালা করে স্বামীজী পদব্রজে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত প্রব্রজ্যায়। তখনই ভারতের যারা প্রাণপুরুষ সেই অজ্ঞ, মুচি, মেথর প্রভৃতি দারিদ্র্যপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মুখোমুখি হয়ে দেখলেন, চিনলেন, জানলেন প্রকৃত ভারতবর্ষকে। অন্তরে অনুভব করলেন ভারতের অগণিত জনসাধারণের তীব্র দুঃখ-দুর্দশা। তিনি এই শতধা-বিচ্ছিন্ন জাতিকে বৈদান্তিক সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এক আদর্শ বেগবান সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে তাই 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' এই বাণীর পরিবর্তে বলেছিলেন 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। বলেছিলেন— 'আমি সেই ভগবানের পূজার জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করি সে হল আমার দীনদুঃখী পাপীতাপী নরনারায়ণ।' দীন দরিদ্র অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শোষিত ভারতবাসীর অপমানে শপথ নিলেন বিষণ্ণ হতাশাগ্রস্ত ঘুমন্ত ভারতবাসীকে জাগ্রত করে ভারতের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর অপূর্ব ভাষণে বিশ্ববাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। ভারতে ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয় উদারতার বাণীবাহক এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিশ্ববাসী সে দিন ভারতকে নতুন ভাবে জানল, চিনল। আকুমারিকা হিমাচল যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠল তাঁর উদাত্ত আহ্বানে। পরাধীন হৃতসর্বস্ব জাতি লাভ করল আত্মশক্তি ও লুপ্ত বিশ্বাস।

প্রচলিত ধারণায় সন্ন্যাসীর কোনও গৃহ থাকে না, থাকে না তার স্বদেশ পরিচিতি কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা ছিল ভারতকেন্দ্রিক। তিনি বলেছিলেন— 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিক আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ'। তিনি স্বীকার করে বলেছেন— 'আমার চরিত্রে সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে এই যে আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, বড়ো একান্তভাবেই ভালোবাসি'। আবার এক ধ্যাননিবিড় মুহূর্তে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে শুনিয়েছিলেন তাঁর আত্মার বাণী; 'আমিই ভারতবর্ষের ঘণীভূত রূপ'। কারণ তিনি তাঁর ধ্যানের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন যে বিশ্বাত্মার জাগরণের এক মহান ক্ষেত্র হবে এই ভারতবর্ষ। ভারতের মাটিতে মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে যে বৈষম্য, যে শ্রেণিভেদ তা মিথ্যা, একমাত্র সত্য মানুষে মানুষে সাম্য। তাই তিনি বেদান্তের সাম্যের জগৎ থেকে নিয়ে এলেন সেই শ্রেণিহীন, বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বাণী যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রে অবনমিত হবে না, শূদ্র ব্রাহ্মণে উন্নীত হবে। যেখানে থাকবে না অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার বা কোনও রূপ সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা। আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন— 'ভারতে কোটি কোটি নরনারী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দু'টি অন্ন চাহিতেছে, আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তাই তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে ক্ষুধার আর্তনাদ থাকবে না। বস্তুত তাঁর গেরুয়ার আড়ালে ছিল প্রকৃত সমাজ-তান্ত্রিকের সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে যেমন নতশির ভারতের দিকে বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন তেমনই ভারতীয় সমাজকে নবজীবন ও নবযৌবনের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত

করেছিলেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষ ছিল পুণ্যভূমি ভারতের প্রতিটি ধূলিকণাও ছিল তাঁর কাছে পবিত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা আত্মশক্তির উদ্বোধনের সাধনা। তিনি কোনও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁর বাণী ও রচনা পাঠে বহু বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শৈশবকাল। ইংরেজদের কাছে আবেদন, নিবেদন ও কিছু চাওয়া পাওয়ার মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারা সীমাবদ্ধ কিন্তু সেই সময় স্বামীজীর দৃষ্টিপ্রদীপে ধরা পড়েছিল ভারতবর্ষের সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই তিনি লিখলেন— 'স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত ভারতবাসীর চিন্তা করার, কথা বলবার স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজন। তাদের পোষাক, আহার, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা ও অধিকার একান্ত প্রয়োজন। শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও একান্ত কাম্য।'

এক বার স্বামীজীর বন্ধু মিস জ্যোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'স্বামীজী কী ভাবে আপনাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারি?' স্বামীজীর উত্তর ছিল 'ভারতবর্ষকে ভালোবাস'। এই ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশের জন্য স্বামীজীর ত্যাগস্বীকার সত্যিই বিরল। দরিদ্র, আত্মজ্ঞানহীন বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা দান ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁর স্বদেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে তাঁকে যুগের প্রেক্ষিতে দেখা দরকার। দীর্ঘ আটশো বছরের পরাধীন, পরপদলাঞ্ছিত, ভগ্ন, রুগ্ন, দুর্বল আত্মবিশ্বাসহীন ভারতবর্ষকে তিনি সত্যিই এক ধর্ম, রাজ্যপাশে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামীজীর এই স্বদেশপ্রেম বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত।

আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও সেই ধ্যানের রাষ্ট্র, স্বপ্নের সমাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্বামীজীর বাণীর যথার্থ রূপায়ণে নতুন ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসবে চাষির লাঙলের ফলা হতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদে দীর্ণ ভারতের জাতীয় সংহতি আজ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে না। তাই আজ স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে কবির ভাষায় বলতে হয় 'তোমার আসন শূন্য আজিকে হে বীর পূর্ণ কর'। তাঁর স্বদেশপ্রেম সঞ্চারিত হোক প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে, ভারতবর্ষে গড়ে উঠুক দেশপ্রেমের মুক্তির দেউল যা বিশ্ববাসীকে বিশ্বপ্রেমে উৎসাহিত করবে। জয় হোক ভারতাত্মার। এই প্রসঙ্গে সি. রাজাগোপালাচারীর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সব কিছুর জন্য তাই আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋনী'।

> যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।
>
> — স্বামী বিবেকানন্দ

ছাত্রীদের নির্বাচিত লেখা

ছাত্রসখা নরেন্দ্রনাথ

মাধবপ্রিয়া করন শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়, পঞ্চম শ্রেণি

'সখা' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল সমবয়স্ক সুহৃদ, সহদর, সহজ করে এক কথায় প্রকৃতবন্ধু, সখা বা বন্ধু তাকেই বলা যায় যে বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় সর্বোপরি জীবনের চলার পথে আমাদের পাশে থাকবে, প্রয়োজনে সঠিক দিক নির্দেশ করবে। বিপথে চালিত হলে তিরস্কার করবে সমাজের ভালো-মন্দ সমস্ত রকম পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি যোগাবে।

আর 'ছাত্র' অর্থে শিক্ষার্থী বা পড়ুয়া আগামীর আহ্বানে যারা দুই বাহুকে ভবিষ্যতের দিকে প্রশস্ত করে বিশ্বসংসারের সর্বত্র নিজেদেরকে মেলে ধরতে সতত প্রস্তুত। এহেন, নবীন সবুজ অবুঝদের চিরযুবা, চিরজীবি করে তুলতে পারে যার অমোঘ মন্ত্র যার বাণী চারিত্রিক গুণাবলী পথ প্রদর্শক হয়ে এই অশান্ত প্রাণগুলিকে জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা যোগায় তিনিই হলেন মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত, উত্তর কলকাতার সিমলাপল্লীর বিখ্যাত দত্ত পরিবারের দুরন্ত সন্তান এবং মেট্রোপলিটন স্কুল ও জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে যিনি 'বিলে' তাঁর সহপাঠীবৃন্দের কাছে আদরের নরেন। কাশীর বীরেশ্বর বিশ্বনাথের আশীর্বাদ ধন্য পুত্রের নামকরণ 'বীরেশ্বর' করা হলেও পরে তার ডাক নাম হয় 'বিলে'।

ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব গঠনের পশ্চাতে তাঁর পিতামাতার অবদান অপরিসীম। তাঁর কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু মনের স্ফুরণ ঘটে পিতা বিশ্বনাথ দত্তের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদানে। তার ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতা; অসহায়কে সাহায্য দান, মুমূর্ষকে প্রাণ দান, এ সকলই মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। এ ঋণ তিনি বার বার স্বীকার করেছেন— 'আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার কাছে ঋণী।'

ছেলেবেলা থেকেই বিলের মধ্যে যেমন অসাধারণ মেধা, সাহস, তেজস্বীতা, স্বাধীন মনোভাব, হৃদয়বত্তা, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ও খেলাধূলার প্রতি আকর্ষন বোধ লক্ষিত হয়, তেমনই তাঁর আরও একটি গুন হল বন্ধুপ্রীতি। সমবয়স্ক ক্রীড়া সাথী সকলকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। অনেক সময় কাকে তিনি সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঘোর তর্ক লেগে যেত।

'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' বোধ করি এই মন্ত্রে নরেন্দ্রনাথ আজন্ম দীক্ষিত হয়েছিলেন। আর তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার মাধ্যমে যেখানে নরেন্দ্রকে দেখা যায় আর্তের সেবায় বিযুক্ত মানবসত্তারূপে এবং প্রকৃত বন্ধুরূপে আপন কর্তব্য পালন করতে। এক দিন তিনি কুড়ি-পঁচিশ জন বালককে নিয়ে মেলা দেখতে গেলে পথমধ্যে একজন কিছু অসুস্থ বোধ করে। অন্যান্য বালকগণ তাঁর কোনও রূপ পীড়া হয়েছে বিশ্বাস না করে তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। তিনিও অন্যান্যদের মতো কলহাস্যে গগন বিদীর্ন করে সকলের আগে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল বালকটি হয়তো সত্যিই অসুস্থ বোধ করছে তিনি তৎক্ষণাৎ পিছনে ফিরে গেলেন এবং দেখলেন পিছনের বালকটি রাস্তার ধারে বসে পড়েছে, এবং প্রবল জ্বরে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে গাড়িতে তুলে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসেন। এই রকম গুনের কারণেই সকলেই তার বশীভূত হয়েছিল এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুসরণ করত।

নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের অপর এক ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গল্প বলায় পারদর্শী নরেন এক বার গল্প আরম্ভ করলে সবাই সব কাজ ভুলে তার কথাই শুনত। এক দিন স্কুলে ক্লাসের ফাকে তিনি গল্প করছেন তাঁর গল্পে মুগ্ধ ছাত্রদের খেয়ালই নেই শিক্ষক এসে পড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিরক্ত শিক্ষক সকলকে এক এক করে পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি যা বলছিলেন তা কেউ শুনছে কি না! কেউ উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু নরেন্দ্রর মন ছিল দু-মুখো। গল্পের ফাঁকেও তিনি মনের একাংশকে পড়ার দিকে রেখে দিতেন। তিনি নির্ভুল উত্তর দিলেন। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন এতক্ষণ তবে কে কথা বলছিল, সবাই নরেনকে দেখালেও শিক্ষকের তা বিশ্বাস হল না। তিনি সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। সকলের সাথে নরেন্দ্রও উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে তিনিই এতক্ষণ কথা বলছিলেন। এই ঘটনার একই সাথে তার বন্ধুপ্রীতি ও সততার পরিচায়ক। পরবর্তীকালে তাই তাঁরই কণ্ঠে শোনা যায়— 'সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'

বন্ধু বৎসল নরেন বন্ধুদের দুঃখে বড়োই কাতর হতেন। বি এ পরীক্ষার টাকা জমা দেওয়ার সময় হয়েছে। নরেন্দ্রর সহপাঠীরা সকলেই টাকা জমা দিয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্রর এক গরিব সহপাঠী হরিদাস পরীক্ষার ফি-এর টাকা জোগাড় করলেও এক বছরের বেতন জোগাড় করতে পারেনি। নরেন্দ্রনাথ জানতেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কলেজে টাকা মুকুবের ব্যবস্থা আছে। তিনি কলেজের বৃদ্ধ কেরাণী রাজকুমারবাবুর কাছে গিয়ে বললেন অনুগ্রহ করে হরিদাসের মাইনেটা মাপ করে দিতে। রাজকুমারবাবুর মেজাজ ভালো ছিল না। তিনি মুখ বিকৃতি করে বললেন 'তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না। তুই যা নিজের চরকায় তেল দেগে যা।' চিন্তিত নরেন্দ্রনাথ সে দিন সন্ধ্যায় বাড়ি না ফিরে হেদোর কাছে এক গুলির আড্ডার দোকানের দিকে যারা আছে তাদের ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি জানতেন রাজকুমারবাবু প্রতি দিন গুলির আড্ডার দোকানে নেশা করতে আসেন। তিনি হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে রাজকুমারবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন তিনি যদি হরিদাসের মাইনেটা না মুকুব করেন তা হলে তাঁর নেশার কথা কলেজময় ছড়িয়ে দেবেন। বিপদ বুঝে রাজকুমাবাবু সম্মত হন। এর থেকে বোজা যায় তিনি কত পরোপকারী ছিলেন। তাঁর সহপাঠীর ক্রীড়া সাথীদের আরও অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর ছেলেবেলার নানা ঘটনার মাধ্যমে।

পরবর্তী জীবনে বিবেকানন্দের বাণী যেমন গোটা ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজের এগিয়ে চলার সঞ্জীবনী মন্ত্র তেমনই তাঁর বাল্যকালের আচরণ, জীবনচর্চা ও চর্যাও বর্তমান ছাত্র সমাজের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু যুব সমাজ তথা ছাত্রদের সখা নয়। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বমানবের চিরন্তন সখা। যে রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে এক প্রকৃত সখার ন্যায় সঠিক পথে সত্যের পথে চালনা করেছিলেন, সেরূপ বর্তমান পৃথিবীর অন্ধকার মাঝে স্বামীজীর সেই অগ্নিগর্ভ মন্দ্র 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্, নিবোধত' হয়ে উঠুক আমাদের পথ চলার দিশা। আর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যিনি হিন্দুধর্মকে এক গৌরবময় আসন প্রদান করেছিলেন সেই গৈরিক উষ্ণীষধারী স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠুক আমাদের সারথি, হয়ে উঠুক প্রকৃত সখা।

> When you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as worship, as the hightest worship, and devote your life to it for the time being.
>
> — Swami Vivekananda

শ্রী সারদা আশ্রম

এপ্রিল ২০১২ থেকে ২০১৩ মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণী

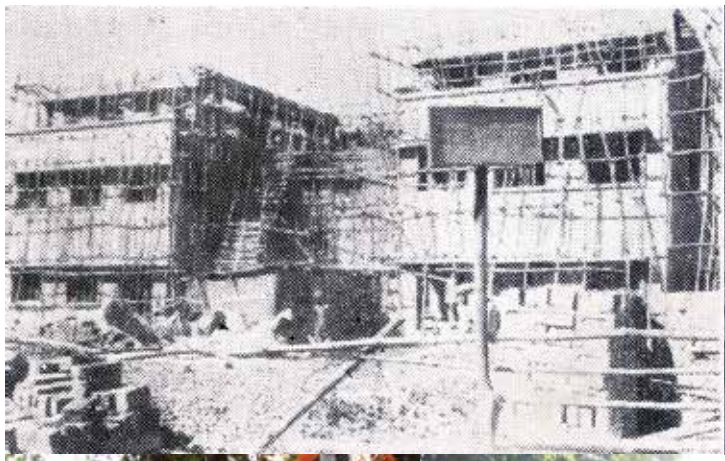

''আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ''— এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে শ্রী সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। শ্রী সারদা আশ্রম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার মহৎ উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত একটি মহিলা শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সোসাইটির ১৮৬০ সালের ২১ নং আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত (পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১ সালের ২৬নং আইন অনুসারে সংশোধিত) এবং কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃক সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত Charitable institution বলে স্বীকৃত।

প্রতিষ্ঠার শুভ-লগ্ন থেকেই স্বামীজীর কর্মপ্রেরণায় ব্রতী হয়ে কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতা ত্যাগী মহিলা শিক্ষাবিস্তার, নারীদের সার্বভৌমিক উন্নতি ও জনসেবা মূলক মহাযজ্ঞ নিরলসভাবে করে চলেছে। স্বামীজী জানতেন, নতুন যুগ নারীদের হাত ধরেই আসবে। বলেছিলেন, 'The past has been to the strong physical men, the future to metaphysical women'। তাই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজীর ভাবাদর্শে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সমন্বয়ে আদর্শ নারী চরিত্র গঠন করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

স্বামীজীর বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে রূপ দেবার দুটি বিশেষ দিক— মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর পূজা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরী— আমাদের অনুপ্রেরণা। মানুষই

আমাদের ভগবান। আজ প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে মাতৃভাবনার পরিধি উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে।

বর্তমানে শ্রী সারদা আশ্রমের দুটি শাখা কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে নদীয়া জেলার কল্যাণী সীমান্ত ও রঘুনাথপুর এলাকায়।

আশ্রমের উদ্দেশ্য রূপায়িত করবার জন্য কয়েকটি বিভাগে এর কর্মধারা বিন্যস্ত— অধ্যাত্ম চর্চার প্রাণকেন্দ্র শ্রীমায়ের মন্দির, বিদ্যালয় (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ), ছাত্রীভবন, সাংস্কৃতিক বিভাগ, অবৈতনিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্র, সমাজের দুঃস্থ কতিপয় নারীকে স্বনির্ভর করে তোলার নানারকম শিল্পকর্ম শিক্ষাদান ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সূচনা থেকেই শ্রীশ্রীমা-এর স্বহস্তে পূজিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি আজও যথাযথ নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে নিত্য পূজিত হচ্ছেন। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পটে আত্মবৎ সেবা পূজার মাধ্যমে জীবনসাধনার লক্ষ্য ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন কয়েকজন সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী। ১৯৭৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আশ্রমবাসিনী ও ভক্তমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এখানে সংসার তাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে নতুন মন্দির স্থাপন হয়েছে। বেলুড় মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নিজ হাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নবনির্মিত মন্দিরে গর্ভগৃহে সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপর অর্ঘ্য প্রদান ও কর্পূর আরতি করে আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলকে মহিমামন্ডিত করেছেন। সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন উৎসব, সেবা-পূজার মাধ্যমে আজও পূর্ব প্রচলিত ভাবধারা অনুযায়ী নিয়মিত ভাবে ধ্যান জপ, আরাত্রিক ভজন, গীতা পাঠ, বিভিন্ন রামকৃষ্ণ পুস্তকাবলী পাঠ, রামনাম সংকীর্তন, পার্ষদ মহারাজাগণের জীবনী আলোচনা, শাস্ত্র-আলোচনা ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়ে থাকে। বর্তমান বছরে অন্যান্য উৎসবের সঙ্গে জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজায় শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে বিশেষ পূজা, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর তিথিপূজায় বিশেষ পূজা, চণ্ডী পাঠ, ভাগবত পাঠ, হোম, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। অগণিত ভক্তমন্ডলী পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পান ও যথাসাধ্য সেবারও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষাবিস্তার

শ্রীশ্রীমা যেমন নারীর সংযমের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি সমর্থন করেছেন মেয়েদের শিক্ষা এবং তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো অর্থকরী বিদ্যালাভকে। শ্রীশ্রীমা-এর এই আদর্শকে পাথেয় করে আশ্রম একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ''মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে— বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।''— স্বামীজির এই বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে, এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র শিষ্যা আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী সন্ন্যাসিনী মীরা দেবী ও প্রথমা সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী বাণী দেবীর মাতৃপূজা ও শিক্ষাদান অভিন্ন— এই আদর্শেই বিদ্যালয়ের সব কার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়

'শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়' ১৯৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং বিগত ১৮ বছর যাবৎ মাধ্যমিক বিভাগের সব ছাত্রীরাই কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের সাফল্যের সার্থক নিদর্শন বহন করে চলেছে।

প্রাথমিক বিভাগ

প্রাথমিক বিভাগে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ২০০৯ সাল থেকে ইংরাজী মাধ্যমেও পাঠ দান চালু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ সালের মার্চ পর্য্যন্ত মোট ছাত্রীসংখ্যা ৪৫০ জন। এই বিভাগে মোট ১৮ জন শিক্ষিকা শিক্ষাদান কার্য করছেন। এক জন মহিলা শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত আছেন। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা ১১৭৯।

বর্তমান বছরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (পঃবঙ্গ) পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় ৬৬ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। ৬২ জন প্রথম বিভাগে এবং ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

২০১২-১৩ সালে মেধা অন্বেষণ ও আত্মবিকাশ অভীক্ষা

বঙ্গীয় বিবেকানন্দ যুব জাগরণ শিবির (পশ্চিমবঙ্গ) দ্বারা পরিচালিত মেধা অন্বেষণ ও আত্মবিকাশ অভীক্ষা প্রতিযোগিতায় ৫জন কৃতী বিদ্যার্থী পুরস্কৃত হয়েছে। ১জন তৃতীয় স্থান, ১ জন চতুর্থ স্থান, ২ জন অষ্টম স্থান, ১ জন নবম স্থান ও ১ জন দশম স্থান অর্জন করেছে। মোট পরীক্ষার্থী ৬৩ জন, প্রথম বিভাগে ৫৮ জন, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও অনুপস্থিত ছিল ২ জন।

ইংরাজী মাধ্যম বিভাগ

বর্তমান বছর থেকে শ্রী সারদা আশ্রমের ইংরাজী মাধ্যম বিভাগে নতুন কার্যকারী শিক্ষিকা মন্ডলী নিয়ে পৃথক ভাবে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৪জন সহ শিক্ষিকা এই মহতী কর্মে নিযুক্ত। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো, গান, আঁকা, যোগব্যায়াম এবং সর্বোপরি moral-education-এর মাধ্যমে ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়ে থাকে। মহামানবদের আদর্শ অনুসরণে জীবন গঠন করার পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা হয়ে থাকে যাতে ছাত্রীরা ভবিষ্যৎ জীবনে একজন দায়িত্বশীল সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। প্রায় ১১৫জন ছাত্রী এই বিভাগে পাঠ গ্রহণ করছে। এই বিভাগটির উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজির স্বপ্নের আদর্শ নারী গঠনে সার্থক প্রয়াস হয়ে উঠুক— এই প্রার্থনা।

মাধ্যমিক বিভাগ

২০১২-১৩ সালে মোট ছাত্রীসংখ্যা

৭০১জন। দশম শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০৯জন। সকল ছাত্রীই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সর্বোচ্চ নম্বর ৬৫৪। ১০৫ জন ছাত্রী star marks পেয়েছে। এই বিভাগে মোট ২৯জন শিক্ষিকা শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেছেন। ২জন শিক্ষাকর্মী আছেন। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা ৪৯০০। পাঠের জন্য প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ৩২২৫।

বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাদান ছাড়াও ছাত্রীদের উন্নত আদর্শ বোধযুক্ত ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন করে তোলার জন্য সারা বছর ব্যাপী বিশেষ কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সমোরোহে ও মহাধূমধামের সঙ্গে বাগ্‌দেবী স্কুলের হলঘরে পূজিতা হন। আশ্রম শুরুর পুণ্য লগ্ন থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা মীরাদেবী এবং বাণী দেবীর নির্দেশিত ধারা অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে মা সরস্বতীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। আশ্রমের সমস্ত সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তমন্ডলী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষিকা, কর্মীবৃন্দ ও ছাত্রীরা সকলের মিলিত আরাধনায় আশ্রমের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। ছোটো ছোটো ছাত্রীরা সকাল ১০টায় পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে জ্ঞানদাত্রীর কাছে বিদ্যা, জ্ঞান, বিবেক প্রার্থনা করে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং মানুষ হবার অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত হয় সেই দিন। তার পর প্রসাদ পাওয়ার পালা। পরদিন সকালে দধিকর্মা তারপর ছাত্রীভবনের ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মা সরস্বতীর মনোরঞ্জন ও বিদায়বরণ অনুষ্ঠানের পর প্রতিমা নিরঞ্জন।

যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ই জানুয়ারী পালিত হয় সাড়ম্বরে। ঐ দিন আশ্রম পরিমন্ডলের চারপাশের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার জন্য ছাত্রীদের একটি সুসজ্জিত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। আশ্রমের পক্ষ থেকে স্বামীজির স্বপ্নের সুস্থ-সুন্দর সমাজ তৈরী করার লক্ষ্যে যুব সমাজকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য যুবদিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐদিন ছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজির ভাবধারায় চেতনা তৈরী করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

নিউ আলিপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে tri-angular park-এ পঃ বঙ্গ রাজ্য সরকারের মহামান্য যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা স্বামীজির মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে অভিবাদন জ্ঞাপন করে।

১৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনে ছাত্রীরা দেশনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী পালন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীরা। তাছাড়াও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ১৫ই আগষ্টে পতাকা উত্তোলন, নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মাধ্যমে পালন করা হয়।

মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের সার্দ্ধশততম বার্ষিকীর মিলনমেলায় তাৎপর্যপূর্ণ বর্তমান বছরে শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বামীজির প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বিষয় সূচীর মধ্যে রচনা, যোগাসন, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে। সব থেকে মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী হয় সঙ্গীত ও বাণীপাঠ প্রতিযোগিতা। ছোট ছোট শিশুরা স্বামীজিকে হৃদয়-কন্দরে এত বলিষ্ঠ আসন প্রদান করতে পেরেছে তা তাদের ভাবগ্রাহী সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনায় ও বাণীপাঠে ঝরে পড়ে শ্রদ্ধার আভাসেই বোধগম্য হয়।

উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজির আশীর্বাদে, বহু হিতাকাঙ্খীদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় উন্নীত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে। নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ স্বামীজির জন্ম সার্ধশতবর্ষে তাঁরই আশীর্বাদ-ধন্য হয়ে শ্রী সারদা আশ্রম শিক্ষার উন্নতি কল্পে ঊর্দ্ধমুখী হল আর এক সোপানে। কলা ও বাণিজ্য বিভাগে কতিপয় ছাত্রী নিয়ে শুরু পথ চলা। নবপ্রেরণায় বর্তমান বছরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। ছাত্রী সংখ্যা সন্তোষজনক ভাবে বর্দ্ধিত হচ্ছে।

ছাত্রীভবন

ভারতীয় মনীষীদের চিন্তনে মননে 'প্রকৃত শিক্ষা' হল আত্মোন্নয়ন আর চরিত্র গঠন, যা সকলের অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পেশাগত, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সংযম শিক্ষা, নীতি শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমেই আদর্শ সৎচরিত্র 'সত্যিকারের মানুষ' গড়ে ওঠা সম্ভব। গুরুকুল প্রথা অনুযায়ী ছাত্রীভবনের ছাত্রীরা আশ্রমবাসিনীগণের সবসময়ের সাহচর্য্যে ও যত্নে বিদ্যাভাস এবং সাথে সাথে নিয়মানুবর্তিতা, সহশিক্ষার্থীর সঙ্গে সহযোগীতা, গৃহস্থালীর কাজকর্ম, কল্পনাশক্তির বিকাশ, নানা আকর্ষণীয় উপায়ে তাদের ধী-শক্তির বিকাশের বিশেষ সুযোগ পায়।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা ও ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আজ বিশ্বের মানুষ নতুন করে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। প্রাচীন ঋষিদের নির্দেশিত এই ধ্যান-ধারণা জীবনের শুরু থেকেই অভ্যাসের ভারতীয় ঐতিহ্য শুধু নয়, পরোপকার, জীবনে শিক্ষনীয় বিষয়গুলোর মূলভাব মনে গেঁথে দিয়ে ধর্মবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, যাতে ছাত্রীরা চিরদিন সত্যনিষ্ঠ থাকে আর সনাতন ভারতের বিশ্বমানবতাবোধকে বুঝে নিয়ে সুনাগরিক ও আদর্শ নারী হয়ে উঠতে পারে। লোকমাতা নিবেদিতার মতে, 'রমণীই সর্ব দেশে নীতি ও সদাচারে আদর্শ রক্ষাকর্ত্রী'। শিশুকাল থেকেই ছাত্রীরা যাতে সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন আদর্শ নারী হয়ে ওঠে— এই ভাবনাদর্শে শিক্ষাদানই আশ্রমের ছাত্রীভবনের উদ্দেশ্য।

আগামী দিনে সৎ-দৃষ্টিশীল সুসমাজ গঠনে এই সব মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে— এই বিশ্বাস রাখি। বর্তমান বছরে ছাত্রীসংখ্যা গড়ে ৩৫জন। পারিবারিক আর্থিক অসুবিধার জন্য ৩জন ছাত্রীর পড়াশুনার সমস্ত ব্যয়ভার আশ্রমের পক্ষ থেকে বহন করা হচ্ছে। আনন্দের সঙ্গে নিবেদন করছি বর্তমান বছরে আশ্রমের ছাত্রীভবনে একাদশ শ্রেণীর তিনজন ছাত্রী নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের

আশ্রমবাসের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

মানুষ শ্রেষ্ঠ হবার সব গুণ নিয়েই জন্মায়। কিন্তু চাই অনুকূল পরিবেশ। সাধুসঙ্গই সেই অনুকূল পরিবেশ— যা আমাদের সৎ ভাবনা, সৎ চিন্তা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে, পরম প্রাপ্তির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে দেয়। শ্রী সারদা আশ্রমের পাশাপাশি কলকাতাবাসীদের মধ্যে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির ভাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতি বুধবার বিকাল ৫-৩০মি থেকে ৬-৩০মি পর্যন্ত, ১ ঘন্টার একটি মহতী সভার আয়োজন করা হয়, যা পরস্পরের পরিপূরক এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের সুযোগ ও সাহায্য পায়। আশ্রমবাসিনী ও ভক্তমন্ডলী সবাইকে আধ্যাত্মিক সম্পদে ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ২০১২-১৩ সালে উক্ত অধিবেশন সংখ্যা ছিল গড়ে ৪৩।

এই বিভাগে একটি গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মহিলাগণ এখানকার সভ্যা হতে পারেন। আশ্রমবাসিনী ও ছাত্রীভবনের ছাত্রীরাও গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়বার সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বই পড়ার উৎসাহ অনেকেরই কমে যাওয়ায় এই বিভাগটি নতুন করে সুসজ্জিত করার প্রয়াসে যথেষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি ভক্তমন্ডলীতে ঠাকুর-মা-স্বামীজির সাহিত্য-দর্শন চর্চার আকাঙ্খা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আশ্রমের Library বিভাগটি উন্নত থেকে উন্নত করা যাবে।

আশ্রমের বার্ষিক মুখপত্র 'পুষ্পাঞ্জলি' বাংলা ১৪১৯-সালেও একমাত্র মহিলাগণের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে মনোগ্রাহী, কার্যকারী এবং সময়োপযোগী রচনা প্রকাশিত হয়। অগণিত ভক্ত এই পত্রিকা পড়ে নানাভাবে ঋদ্ধ।

অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষাবিস্তারের প্রকল্প

আশ্রমের উদ্যোগে এলাকার আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্কুলের অনুন্নত ছেলেমেয়েদের ক্লাসের উপযুক্ত করে তোলার জন্য 'বিবেকায়ণ' নামে একটি অবৈতনিক শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র (tutorial class)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

B.Com 1sr Year-এর রাজু গুরে ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কাজল গুরে আশ্রমের সম্পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগীতায় প্রতিপালিত হচ্ছে। কমার্স বিভাগের পড়াশুনোর-সমস্ত খরচ সহ রাজু গুড়ের অঙ্কন শিক্ষারও যাবতীয় অর্থ ও সামগ্রী আশ্রম বহন করে চলেছে। এদের পড়াশুনার বিষয় প্রয়োজনীয় সবকিছুই যেমন, পাঠ্য পুস্তক, খাতা, পেন পেনসিল, ইউনিফর্ম, স্কুলব্যাগ ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য সকলকেই অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ পথ্য ও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। দুর্গাপূজায় নূতন জামাকাপড় ও প্রয়োজনীয় পোষাক এবং শীতের সময় শীতের পোষাক সকলকেই দেওয়া হয়। এদের সর্বাঙ্গীন-মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ছাত্রীদের সাহায্য দান ছাড়াও অভাবী দুঃস্থ মানুষকেও বিশেষ প্রয়োজননে সাহায্য দান করা হয় এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

বিবেকায়ণ সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসা বিভাগ

শ্রী সারদা আশ্রমের এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ১জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মাসে ২দিন এসে দুঃস্থ ও আশ্রমিকাদের চিকিৎসা করেন। সকলকেই বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে।

নিউ আলিপুর শ্রী সারদা আশ্রমের শাখা কেন্দ্র কল্যাণী ও রঘুনাথপুরের বার্ষিক সংবাদ

কল্যাণী শাখা কেন্দ্র

শ্রী সারদা আশ্রম পরিচালিত নদীয়া জেলায় অবস্থিত কল্যাণী শাখা কেন্দ্রটির ২০০১ সালে শুভ উদ্বোধন হয়। প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ। এই উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার জন্য আশ্রমে নিয়মিত পূজা, আরাত্রিক ভজন, রামনাম সংকীর্তন, কথামৃত পাঠ, মাসে ১ দিন গীতা ব্যাখ্যা এবং পূজনীয় মহারাজদের জীবনী পাঠ ও বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হয়ে থাকে। এ বছরেও ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজির জন্মতিথিতে ১৫১ তম জন্মোৎসব ২ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি প্রতি বছরের মতো সুসম্পন্ন করা হয়েছে। ভক্তমন্ডলী ও গ্রামবাসীসহ প্রায় ১৫০০ জন ভক্ত এই দিন বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কল্যাণী অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের ছাত্রীদের শান্তিমন্ত্র পাঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। শ্যামনগর রামকৃষ্ণ শরণতীর্থ সারদা মাতৃ সমিতির উদ্যোগে গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। ডঃ নমিতা দত্ত 'ঠাকুর-মা-স্বামীজির জীবন কেন আমাদের পাথেয়'— এই বিষয়ে নানা পর্যালোচনা করেন। কার্য্যবিবরণী পাঠের পর শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীজয়ী দে-র অনুপম কণ্ঠে মাতৃবন্দনায় আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। অপর ছাত্রী স্নিগ্ধা দাস ছোটো নরেনের দুষ্টুমিভরা কিছু ঘটনার কথা প্রাঞ্জলভাবে বলে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শ্রীমতি মধুমিতা ঘোষের স্বামীজি সম্পর্কিত সুচিন্তিত ও উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ভক্তদের বিশেষভাবে আপ্লুত করে। স্থানীয় শিল্পীরা সেতার, কবিতা, সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে। D.D.S. Academy আকর্ষণীয় নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজিকে স্মরণ-মনন করে। সবশেষে শ্রীযুক্ত অভিষেক অধিকারীর বিশ্লেষণী ও আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রোতৃমন্ডলীর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। প্রতি বছরের মত এবারও সূচীশিল্পে দক্ষ ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য পুরষ্কৃত করা হয়েছে।

বিভিন্ন স্কুলে পাঠরতা দরিদ্র ছাত্রীরা

শ্রী সারদা আশ্রম অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে বিনা বেতনে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া সুস্থ ও সুন্দর মানসিক বিকাশের জন্য দুজন শিক্ষিকা অঙ্কন ও গান শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কোচিং সেন্টারে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীর সংখ্যা ২৮ জন। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী এবারও ছাত্রীদের সারা বছরই খাতা, পেন, পেনসিল, রবার এবং বছরের শুরুতেই পরীক্ষার ফী, স্কুলের মাহিনা ও বইপত্র দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য হল— ছাত্রীদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ও স্বালবম্বী হবার বিষয়ে আশ্রম দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলে সমাজের একটি শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু আশ্রমের অর্থনৈতিক দিকটি এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ২০১২ সালে ৫ জুন মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ ও কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরেও দুর্গাপুজোয় প্রতিটি ছাত্রীকে ও আশ্রমের প্রতিটি কর্মীকে নতুন জামা কাপড় দেওয়া হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শীতের জামা কাপড়ও দেওয়া হয়েছে। সারা বছরই প্রয়োজনীয় স্থানে পুরানো জামা কাপড় বিতরণ করা হয়ে থাকে।

শ্রী সারদা আশ্রম পরিচালিত 'দাতব্য নিরাময় প্রকল্পে' সপ্তাহে ২দিন ২জন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, ১ দিন ১জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ১ দিন ১ জন জেনারেল ফিজিশিয়ান অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পীড়িত দরিদ্র মানুষের সেবা করে থাকেন। সামান্য মূল্যে ও প্রয়োজনে বিনামূল্যে রোগীদরে সাধ্যমত ওষুধ দেওয়া হয়। এবছর বিনামূল্যে ৯০০ জন রোগীকে এ্যালোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

অস্বচ্ছল পরিবারের মহিলাদের জন্য সফ্‌ট-টয়েস, এমব্রয়ডারি, ক্রিষ্টালের ব্যাগ, ঘর সাজানোর নানা জিনিস ও সুক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ ইত্যাদি শিখিয়ে তাদের আর্থিক স্বাবলম্বনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের ছাত্রীরা ধূপ তৈরী করে থাকে।

রঘুনাথপুর শাখা কেন্দ্র

শ্রী সারদা আশ্রম পরিচালিত নদীয়ার রঘুনাথপুরে একটি শাখা কেন্দ্র আছে। কল্যাণী সীমান্ত থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে গয়েশপুর চেকপোষ্টের কাছে অবস্থিত। এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিয়মিত আরাত্রিক ভজন, গীতাপাঠ, কথামৃতপাঠ, শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজির কথা আলোচনা হয়ে থাকে। একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন করা হয়।

২০১৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ধর্মসভা ও নর-নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল ১০টায় বেদ পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, বক্তৃতা ও পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমে মহা-সমারোহে ঐ দিন উৎসব পালিত হয়। স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে Bharat Scout and guide group (kanchrapara)-এর ছেলেরা Scout-drill-এর মাধ্যমে। আদিবাসী সাঁওতাল প্রজাতির ভক্তদের ধামসা মাদোলের তালে তালে নৃত্য উপস্থিত পরিমন্ডলকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। তাছাড়াও ৭৫জন পুরুষ ও মহিলাকে কম্বল বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৩ হাজার ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

এখানে অবৈতনিক কোচিং সেন্টারে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। এছাড়াও একটি দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী দুঃস্থ ছেলের পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। এ বছরও ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, স্কুলের মাহিনা, স্কুল ইউনিফর্ম, পরীক্ষার ফি দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপূজায় প্রতিটি ছাত্রী ও কর্মীকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়েছে। এবছর একজন ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৫৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। গত বছর একজন ছাত্রীকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে নার্সিং বিভাগে ভর্ত্তি করানো হয়েছে ও তার পড়াশোনার সমস্ত ব্যায়ভার আশ্রম থেকে বহন করা হচ্ছে।

''সারদালোকে মহিলা হস্ত শিক্ষা কেন্দ্র''-র মাধ্যমে গ্রামের মেয়েদের সেলাই ও হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখানে এমব্রয়ডারী, অ্যাপ্লিক্, কর্ড, জুটের নানা ধরনের জিনিস যেমন লেডিশ ব্যাগ, বিভিন্ন রকমের ফাইল কভার, টেবিল ম্যাট, ব্লাউজের পিস্, শাড়ীতে নানা ধরনের হাতের কাজ করা হয়। এছাড়া এখানে সস্, আচাড়, আলুর পাঁপড়, বড়ি, স্কোয়াস তৈরী করা হয়।

রঘুনাথপুর গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে। তাই এই ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরিকল্পনা করা হচ্চে। 'জীবনদায়ী প্রকল্পে' এ পর্যন্ত যতটুকু ব্যবস্থা করা গেছে, তা হলো— প্রতি সোমবার ১জন দন্ত চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। এখানে খুবই যত্নের সঙ্গে দাঁত তোলা, ফিলিং, স্কেলিং, রুট ক্যানেল ও দাঁত বাঁধানো হয়। প্রতি শুক্রবার ১জন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, রবিবার ১জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ খুবই যত্নের সঙ্গে চক্ষু পরীক্ষা করেন। কম মূল্যে প্রয়োজনে বিনামূল্যেও চশমা দেওয়া হয়ে থাকে।

এবার সারা বছরে ১৫৪২ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। প্রতিমাসে নামমাত্র মূল্যে সেন্ট জন্ অ্যাম্বুলেন্স হসপিটালে (রাণাঘাট) ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এ বছর মোট ২১৭ জনকে সাফল্যের সঙ্গে ছানি অপারেশন ও আশ্রম থেকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে সোম ও শুক্রবার স্বল্প মূল্যে ই সি জি ও ব্লাড টেস্ট করা হয়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

শিমুরালী পঞ্চায়েতের অধীনে আটুলি গ্রামে ২৪শে মার্চ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, জেনারেল ফিজিশিয়ান মোট ৪১৭ জন গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয়। E.C.G blood group ইত্যাদিও পরীক্ষা করা হয়। প্রায় ৫০০ জন গ্রামবাসীদের বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তাছাড়াও ৭৫টি নতুন শাড়ি ও পুরানো জামাকাপড় দুঃস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

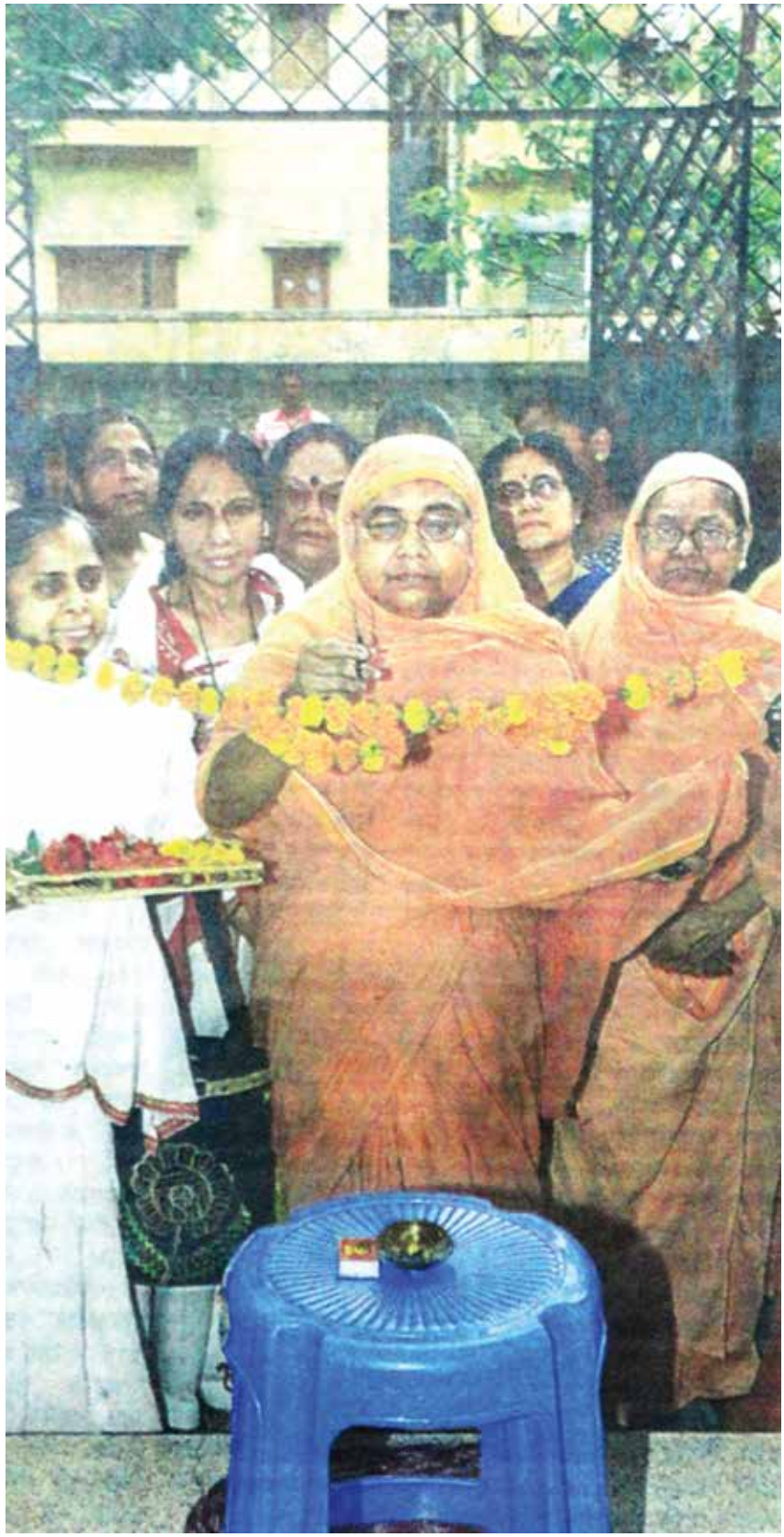

শ্রীশ্রীসারদা আশ্রমের এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনে প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা

২০১২-১৩ সালে শ্রী সারদা আশ্রমের তিনটি কেন্দ্র:

Relief & Charity—
খাতে মোট ব্যয় হয়েছে—
3,82,187/- টাকা
Medical & Medicine—
খাতে ব্যয় হয়েছে— 10,397/- টাকা
Stipend & Scholarship—
খাতে ব্যয় হয়েছে— 43,000/- টাকা।

"New Alipore Sree Asrada Ashrama Social Welfare Association"
West Bengal Act XXVI of 1961
A Vocational Training Centre

শ্রীসারদা আশ্রমের একটি ভোকেশান্যাল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা মাতাজি, উদ্দেশ্য— সমাজে পিছিয়ে পড়া সকল স্তরের মেয়েদের অর্থনৈতিক উন্নতির আন্তরিক প্রচেষ্টা। এখানে প্রায় ১৮টি বিষয়ের উপর (সেলাই এবং কাটিং, নিটিং, ডল মেকিং, সফ্‌ট টয়েস, কুকিং ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

একটি প্রোডাকশন ইউনিট (Production Unit) চালু করা, যেখানে প্রশিক্ষিত মেয়েরা ওর্ডারের (Order) ভিত্তিতে জিনিসপত্র তৈরি করবে।

আমাদের এই ট্রেনিং সেন্টারের উদ্দেশ্য, সর্বস্তরের মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে 'কর্মসংস্থান পত্রিকা' প্রায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে থাকে, তাঁদেরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, এই বিজ্ঞাপনের ফলে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েরা এসে এখানে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।

With Best Compliments:

DHAR BOOK AGENCY

Publisher & Book Seller

Samar Dhar

121B, Sitaram Ghosh street, Kolkata - 700 009
Ph 033 2219 0140 / 033 2219 8753 / 6516 9645

With Best Compliments:

SAHITYA BHARATI PUBLICATIONS PVT LTD

51/1A Janapur Lane, Kolkata - 700 009
2360 5062

সমাজ পিছিয়ে পড়ে তার নৈতিক শক্তি চুপসে গেলে। যে পতনে কোনও শব্দ হয় না, সেটাই অধঃপতন।

— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

With Best Compliments:

Ruby Publishers

42/1, Beniatola Lane, Kolkata - 700 009
(M) 98300 54794 (off) 033 2241 1710

With Best Compliments:

Indian Bag Center

All kinds of Shopping Bag suppliers

Belghoria, Kolkata - 56, Ph. 9051111274, 9830421824

Bichinta Bhaban

37/3, Beniatola Lane, Kolkata - 700 009
Ph. 2241 2106

শিক্ষার প্রসারই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

পাঠ্য পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

অফিস: ১৮ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, (চতুর্থ তল), কলকাতা - ৯
বিক্রয়কেন্দ্র: ১১৪/১এ, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা - ৯

Out of Purity and Silence
Comes the word of Power

- Swami Vivekananda

When you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as worship, as the hightest worship, and devote your life to it for the time being.

— Swami Vivekananda

Nemai Ghosh

Well Wishers

Sree Kali Books

Kolkata - 700 009

With Best Compliments from

Calcutta Book House

1/1, Bankim Chatterjee Stree,
Kolkata - 700 073

With Best Compliments from

M/S B. B. Kundu Grandsons
Publishers & Booksellers

10/2B, Ramanath Majumder Street,
Kolkata - 700 009, 2241 6582

The downfall of a religious sect begins from the day that the worship of the rich enter into it.

— Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.

- Swami Vivekananda

With Best Compliment from

Anish Kanti Ghosh